সখা

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

পঞ্চম ভাগ।

১৮৮৭।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN."

কলিকাতা

২ নং বেণেটোলা লেন, "সখা"-যন্ত্রে, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ৭০০/৫

সূচীপত্র।

বিষয়।		পত্রাঙ্ক।
অতি লোভের শাস্তি	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ ...	৬৩, ৭১
অনাথা বালিকা (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ ...	১২২
অসন্তুষ্ট কাঠবিড়াল	শ্রীরামব্রহ্ম সান্ন্যাল	১৮০
আলেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায় ...	১৭
আলেয়া	ঐ ...	১৫৯
আশ্চর্য্য বিনয় (প্রাপ্ত)	শ্রীমতী সরলাসুন্দরী লাহিড়া ...	৪৪
আসিবে না (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ ...	১৪২
এলিফাণ্টা গিরি-মন্দির	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ ...	৭৫
কলিকাতায় মহোৎসব	শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী ...	২
কাশ্মীরে দেখিবার জিনিষ	শ্রীভুবনমোহন রায় ...	৯৩
কুমারী তরুদত্ত (সচিত্র)	ঐ ...	৪৯
কুসঙ্গের দোষ (পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)	শ্রীললিতকুমার বসু ...	৫৬
কৃপণ কুক্কুর	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ ...	৭
কেগো ঐ বৃদ্ধা নারী (সচিত্র পদ্য)	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ...	২৯
কোহিনুর	শ্রীভুবনমোহন রায় ...	১২৭
গণ্ডার (সচিত্র)	শ্রীবিহারীলাল গুহ ...	১১৯
গরিব দুঃখীদিগের প্রতি ব্যবহার (পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস ...	৩২
গ্রানভিল্ সার্প (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায় ...	১৬১
চীনের কথা (সচিত্র)	শ্রীবিহারীলাল গুহ ...	৫৯
জন পাউণ্ডস্ (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায় ...	১৩৭
জোনাকীর বক্তৃতা (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ ...	১৫৮
টাকা কড়ি ...	ঐ ...	৮৯
ঠগী (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায় ...	১৬৮, ১৭৭
দ্বীপ-শিখা ...	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ ...	৮
দুঃখিনীর দুঃখের কথা	শ্রীবিহারীলাল গুহ ...	১৭০
ধাঁধা	৪৮, ৯৬, ১২৮, ১৪৪, ১৬০, ১৭০, ১৮৬	

নব বর্ষের সঙ্গীত (পদ্য)	শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা	...	৬৪
নানা প্রসঙ্গ	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ	....	৯৫
পঞ্চম বর্ষ	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	...	১
পণ্ডিতের ভ্রান্তি	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	...	৭৭
পম্পীয়াই	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১১০
পরদেশ-পাখী (সচিত্র)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৫৫
পরোপকার (পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী	...	৩০
পলাতক পাখী (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৭৪
পেটুক পুষি (সচিত্র পদ্য)	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ	...	৬
প্রজাপতি (সচিত্র পদ্য)	শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৯২
প্রতিশোধ	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৩২
প্রভুর কাজ	কুমারী কামিনী সেন বি, এ	...	৩৯
পাখীদের দেশ ভ্রমণ	শ্রীরামব্রহ্ম সান্ন্যাল	...	৬৫, ৮১
পার্লিয়ামেণ্ট সভা (সচিত্র)	শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	...	২২
পিপীলিকার উপদেশ (সচিত্র)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু		৩৫, ৫২, ৬৮, ৮৬
ফরাসী বালিকার স্বদেশানুরাগ	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	৪১
ফুলের সাজি	শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়		১৪, ১২৯, ১৪৫
বর্ষ-শেষ (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৮৬
বাঘ-মানুষ (সচিত্র)	ঐ	...	৭৮
বায়ু মণ্ডল	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	...	৮৩
বালক কলবার্ট	শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ	...	১০২
বালক বালিকার হাসি মুখ (প্রাপ্ত)	ঢাকার জনৈক ছাত্র	...	১৬৭
বালকের সৎ শিক্ষা	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন	...	৯৬
বাল্য জীবনের অস্থির গতি (পদ্য)	শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা	...	১
বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন	...	১৫৪
ভরত-বিলাপ (পদ্য)	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম,এ	...	৭৩
ভারতের অসভ্য জাতি (সচিত্র)	শ্রীরামব্রহ্ম সান্ন্যাল		... ৯৭, ১২৩, ১৪৭
ভিখারিনীর প্রার্থনা (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১০৫
মজার পড়া (পদ্য)	শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	...	৩৭
মদ্য পানের অপকারিতা (পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)	শ্রীঅমৃতলাল নাথ	...	৩৭
মহাভারতের গল্প (পরোপকার)	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	৩৩
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সচিত্র)	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম,এ	...	৯, ২৫
মেডাময়সল্ লি ব্লাঙ্ক্ (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	৪৫
মেরী কার্পেণ্টার (সচিত্র)	ঐ	...	১০৬,১১৩
মুক্তি-স্নান (সচিত্র)	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন	...	১৫০
যেমন রোগ তেমনি ব্যবস্থা (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১২৫
রমণীর দয়া	ঐ	...	৫৪
রাখি-বন্ধন	ঐ	...	১৫২
শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত (প্রাপ্ত)	শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	১৮৩
সংগ্রহ	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১৭২
সাজি	ঐ	...	১৭৫
সাধুতার পুরস্কার (বালকের রচনা)	শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস	...	৭২
সুরা রাক্ষস কোম্পানি অন্ লিমিটেড	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১৪২

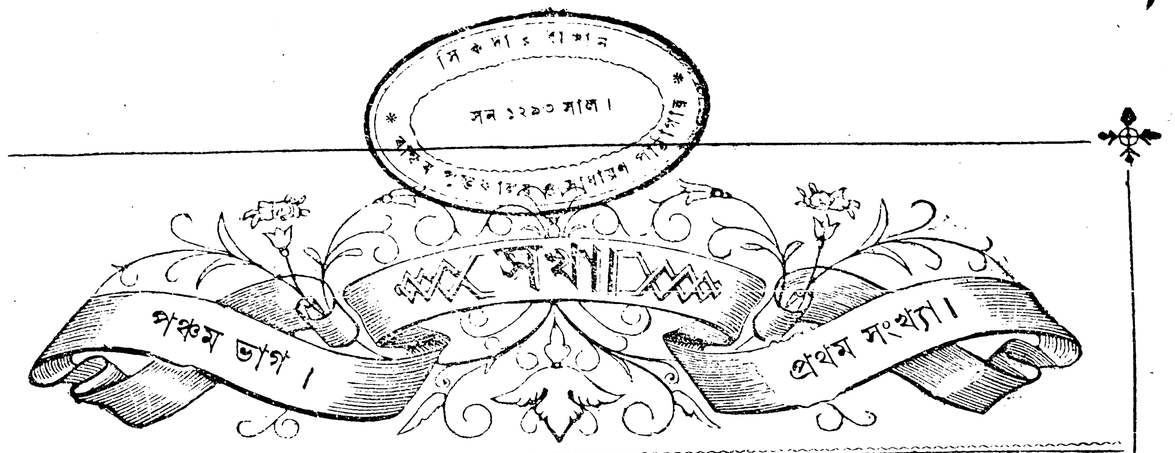

সিকদার বাগান
সন ১২৯৩ সাল।

সখা

পঞ্চম ভাগ। প্রথম সংখ্যা।

জানুয়ারি, ১৮৮৭।

পঞ্চম বর্ষ।

সখার পাঠক পাঠিকা! তোমাদের "সখা" ঈশ্বর কৃপায় পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। এক একটী ছেলে এমনি থাকে যে, তাহাকে যে দেখে সেই ভালবাসে; লোকে এইরূপ ছেলেকে "আয়িত্তিস্থ" বলে। আমাদের "সখা"ও বুঝি সেইরূপ "আয়িত্তিস্থ" ছেলে। অনেক ছেলের এরূপ দেখা যায় যে, ছেলেবেলা সকলে তাহাদিগকে ভালবাসে, কিন্তু বড় হইলে তাহাদের সে কোমলতা থাকে না। ছেলেগুলি কদাকার হইয়া পড়ে, লোকে বলিতে থাকে এ বড় না হইলেই ছিল ভাল, কেন তেমনিটী থাকিল না। আমাদের প্রিয় "সখা"র বেলা সেরূপ দেখিতেছি না। বয়স বড় হইয়াও "সখা" দিন দিন কত আদর পাইতেছে। "সখা" এই সকল হিতৈষী বন্ধুর ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে করিয়া পঞ্চম-বর্ষে পা বাড়াইতেছে।

জন্মতিথির দিন পিতা মাতা পরমান্ন করিয়া শিশুকে খাওয়াইয়া থাকেন। আজ "সখা"কে কে পরমান্ন খাওয়াইবে? প্রমদাচরণ যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে ভাল করিয়া পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া বুঝি বা "সখা"কে উপহার দিতেন। আমাদের দ্বারা সে কাজ হইল না। আমাদের যাহা কিছু আছে তাহা দিয়া "সখা"কে সাজাইয়া পাঠাইলাম। পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা একবার "সখা"কে জন্মদিনে আদর কর।

সংসারে তোমরা অনেক মানুষ দেখিতে পাও, যাহারা কেবল নিজের জন্য প্রাণ ধারণ করে। অর্থাৎ কোন রকমে অর্থোপার্জ্জন করা ও নিজের উন্নতি করাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, সেই জন্যই তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন। আমাদের প্রিয় "সখা" সেরূপ নয়। বঙ্গদেশের শিশুদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের উপকার করাই ইহার জীবনের লক্ষ্য; তোমরা সকলে "সখা"র জন্মদিনে একবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, "সখা" যেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়।

বাল্যজীবনের অস্থির গতি।

কুসুম কলিকা বালক বালিকা
পরিবার উপবনে;
হাসিয়া খেলিয়া উঠিছে ফুটিয়া
স্বভাবের সুনিয়মে।

দেহের গঠন নূতন নূতন
ভাবে হয় পরিণত ;
মনের আকার তেমনি তাহার
তরল জলের মত।
কার কি নিয়তি, কোন্ দিকে গতি
দেখিব দুদিন পরে ;
যখন যৌবন লয়ে সেনাগণ
প্রবেশিবে দেহ ঘরে।
কুশিক্ষার ফলে আমোদের ছলে
মাদক-গরল-পানে ;
কত সুকুমার করি পাপাচার
অকালে মরিবে প্রাণে।
কুসঙ্গে মিশিয়া কুকথা শিখিয়া
হবে কুঅভ্যাসে রত ;
আপনি মরিবে অপরে মারিবে
থাকিবে পশুর মত।
যৌবন গরবে অন্ধ হয়ে রবে
না জানিবে গুরুজনে ;
কবে মিথ্যা কথা, যাবে যথা তথা
নীচ অধমের সনে।
কিন্তু পরিশেষে পাবে বহু ক্লেশ
পড়িয়া কণ্টক বনে ;
মরিবে কাঁদিয়া কুকর্ম্ম স্মরিয়া
নাহি পাবে সুখ মনে।
বালক সুজন হইবে যেজন
রহিবে সে সাবধানে ;
তার পরিমল ছুটিবে কেবল
চিরদিন স্বর্গপানে।
মানব-সমাজে দেবলোক-মাঝে
বসিবে সে উচ্চাসনে ;
থাকিবে অঙ্কিত তাহার চরিত
ইতিহাস-দরপণে।

কলিকাতায় মহোৎসব।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! বড় বেশী দিনের কথা নয়, হয়ত তোমাদের মনে পড়িবে, গত ১৮৮৩ সনের মে মাসে যখন সুবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুমাসের জেল হয় তখন তোমাদিগকে আমাদের দেশের অনেক কথা বলা হইয়াছে। আমাদের দেশ যে পরাধীন, আমাদের দেশের লোক যে ইংরেজের অধীন এ বিষয় তোমরা শুনিয়া থাকিবে। এ দেশ স্বাধীন ও দেশ পরাধীন এ সকল কথার মানে বুঝিতে পারিলেও ভাব ভাল করিয়া বুঝা তোমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। তাই তোমাদিগকে এ সম্বন্ধে দুইএকটী কথা বলিতেছি। তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে ইংলণ্ডের মহারাণীই আমাদের দেশের রাণী এবং আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা প্রজা সকলেই সেই ইংরেজ রাণীর প্রজা। বাস্তবিক এ কথা সত্য। সেই মহারাণী শুধু ভারতবর্ষের কর্ত্রী নন, ইংলণ্ডের ছোটবড় সকল লোকই তাঁহার প্রজা। তবে ইংলণ্ডের লোক আমাদের ন্যায় পরাধীন নয়। আমাদের দেশের জমিদার তালুকদারগণ যেরূপ তাঁহাদের অধীনের প্রজাগণের দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পারেন, যে দিক ইচ্ছা সেইদিকেই তাহাদিগকে পাঠাইতে পারেন, ইংলণ্ডের লোক মহারাণীর প্রজা হইলেও তিনি তাহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। বিলাতে একজন রাণী আছেন বটে, কিন্তু ইংরাজেরা জানে যে একজন লোকের ইচ্ছায় কোন কাজ হয় না, দেশ শাসনে ইহাদের সকলেরই কিছু কিছু

অংশ আছে। দেশটা যে দেশের লোকদেরই, তাহা চাষারা পর্য্যন্ত জানে। রাজা বা রাণীর নামে অনেক কাজ হয় বটে, কিন্তু ইংরেজেরা নিজেরাই সব কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেশের লোকেরা সৈন্য হইতে পারে, যুদ্ধ বিদ্যা শিখিতে পারে, যাহাতে দেশের ও নিজেদের কল্যাণ হয় এমন কাজ নির্ভয়ে করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের লোক সেই এক রাণীর অধিকারের প্রজা হইয়াও স্বাধীন-ভাবে কিছু করিতে পারে না। যে সকল ইংরেজ আমাদের দেশ শাসন করিতেছেন, তাহাদের অনেকেই আমাদিগকে অসভ্য মনে করেন, পশুর মত ব্যবহার করেন, আমাদের প্রতি কত সময়ে কত অত্যাচার করেন, কত অবিচার করেন তাহা তোমরা হয়ত অনেকেই জান না। বিলাতের প্রজাগণের ন্যায় আমাদের কোন অধিকার নাই। আমরা মহারাণীর প্রজা হইলেও আমাদের ভারতবর্ষের নানা স্থানে যেমন মহারাণীর পরিবর্ত্তে এক একজন শাসন কর্ত্তা রহিয়াছেন, যেমন বোম্বাইতে একজন গবর্ণর, মান্দ্রাজে একজন গবর্ণর, পাঞ্জাবে একজন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এবং আমাদের বাঙ্গালা দেশে একজন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অর্থাৎ যাঁহাকে লোকে ছোটলাট বলে, তিনি, এবং সকলের উপরে গবর্ণর জেনারেল অর্থাৎ বড় লাট বাহাদুর রহিয়াছেন, ইংলণ্ডের প্রজাদের শাসনের জন্য এরূপ লোক নাই। আমাদের দেশে যেমন এই সকল বড়লাট ছোটলাটগণ আমাদের প্রতি যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, যখন ইচ্ছা তখনই আমাদের নিকট হইতে ট্যাক্স (কর) আদায় করিতে পারেন, আমাদিগকে শাসন করিবার জন্য ও আমাদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আইন প্রস্তুত করিতে পারেন, ইংলণ্ডের লোকের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবার নিয়ম নাই। অতি পূর্ব্বকালে আমাদের হিন্দু রাজারা যেমন দেশের পণ্ডিতগণকে লইয়া একটী রাজসভা করিতেন এবং সেই জ্ঞানীলোকেরা সভায় বসিয়া যেরূপ রাজাকে ভাল মন্দ উপদেশ দিতেন, ইংলণ্ডেও অতি পূর্ব্বকাল হইতে তেমনি একটী রাজসভা চলিয়া আসিয়া আধুনিক পার্লিয়ামেণ্ট নামক সভায় পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বকালের হিন্দু রাজারা যেরূপ দেশীয় পণ্ডিতগণের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন বলিয়াই যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন না, ইংলণ্ডের রাণী সেইরূপ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণের বিনা সম্মতিতে কোন কাজ করিতে পারেন না বলিয়াই দেশের লোক সুখে আছে, স্বাধীন আছে। ইংলণ্ডের রাজা বা কোন রাজপ্রতিনিধি অপেক্ষা সাধারণ লোকেরই ক্ষমতা বেশী। রাণীর ক্ষমতা কেবল নামমাত্র, পার্লিয়ামেণ্টই দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা। এই পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহাসভার সভ্যগণই দেশের প্রকৃত শাসন কর্ত্তা এবং এই সকল সভ্যই আবার দেশের লোকের দ্বারা মনোনীত হইয়া থাকেন। এই মহাসভা দুইটী ভাগে বিভক্ত। একটিকে "হাউস অফ লর্ডস্" অর্থাৎ সম্ভ্রান্তদের সমাজ এবং অপরটিকে "হাউস অফ্ কমন্স" অর্থাৎ সাধারণদের সমাজ কহে। খুব উঁচু বংশের লোকেরা ও বড় বড় পাদ্রিরা মিলিত হইয়া লর্ডস্ সভার কাজ করেন। দুইজন প্রধান যাজক এবং চব্বিশজন যাজক, ও ডিউক, মার্কুইস্, অয়রল, ভাইকাউণ্ট, ব্যারণ ইত্যাদি উপাধিধারী লর্ড পরিবারের কয়েকজন লোক লইয়া লর্ডসভা গঠন হইয়া থাকে। রাজার ন্যায় এই সম্ভ্রান্তলোকদের শাসন ক্ষমতা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে; দেশের কোন রাজকার্য্য লইয়া কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে এই সভাতেই সর্ব্বশেষে

নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। আবার নগর, গ্রাম, পল্লি-গ্রাম, জেলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা বাছিয়া বাছিয়া বিচক্ষণ লোকদিগকে কমন্স সভার সভ্য করিয়া পাঠান। এই সভ্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাধারণ লোকদের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাধারণদের সমাজের বিশেষ ক্ষমতা এই যে, সমস্ত রাজ্যের আয়ব্যয়ের ভার ইহাঁদের হাতে এবং এই জন্যই ইহাঁরা রাজাকে দমনে রাখিতে পারেন। পার্লিয়ামেণ্টের দুই ভাগের সভ্যদের মধ্য হইতে রাজমন্ত্রীরা মনোনীত হইয়া থাকেন এবং বস্তুতঃ এই মন্ত্রীরাই রাজা বা রাণীর নামে রাজ্য শাসন করেন। দেশের কোন নূতন আইনকানুন করিতে হইলে মন্ত্রীরাই অনেক সময়ে সকল আইনের কথা সাধারণদের সভায় উপস্থিত করেন এবং সাধারণদের সভার অধিকাংশ সভ্যের মত হইলে লর্ড সভায় যায় এবং তথা হইতে রাণীর নিকটে সেই আইন সই করাইতে পাঠান হয়, রাণীর সই হইলেই আইন হইয়া যায়। যদি সাধারণদের সভার অনেকে কোন আইনের বিরুদ্ধে থাকেন এবং মন্ত্রীরা সেই আইনের প্রস্তাব করিয়া থাকেন, তবে অনেক সময় মন্ত্রীবর্গ তাঁহাদের পদ পরিত্যাগ করেন; পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভাঙ্গিয়া যায়; আবার দেশের লোকে নূতন সভ্য মনোনীত করিয়া নূতন পার্লিয়ামেণ্ট সভা গঠন করিয়া লয়। পাঠক পাঠিকাগণ! এখন শুনিলেত ইংলণ্ডের প্রজাগণের সহিত ভারতবর্ষের প্রজাগণের কত তফাৎ। আমাদের দেশের লোক সেই একই রাণীর অধীনে থাকিয়া, একই রাজ্যের প্রজা হইয়া এত পরাধীন কেন বলিতে পার কি? তোমরা মনে করিও না যে, মহারাণী বা তাঁহার প্রতিনিধি বড় লাট সাহেব আমাদের দেশীয় লোক নন বা এক জাতীয় লোক নন বলিয়াই আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করেন না। তোমরা বিশ্বাস করিও না যে, ইংরাজেরা ভারতবর্ষ জয় করিয়া এদেশের লোকের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবেন বলিয়াই এ দেশের রাজ্যভার তাঁহাদের হাতে লইয়াছেন।

যদি আমাদিগকে পেষণ করাই ইংরেজদের উদ্দেশ্য হইত, যদি আমাদের টাকাকড়ি কাড়িয়া লওয়াই ইংরেজদের ইচ্ছা হইত, তবে তাঁহারা আমাদের সুখ সুবিধার জন্য এত কখনই করিতেন না। তাঁহারা আমাদের অবস্থা ভাল হইবে বলিয়া রেলের গাড়ি করিয়াছেন। আগে এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে সংবাদ দিতে হইলে এক জন লোক পাঠাইতে হইত, এবং তাহাতে কত খরচ হইত ও কত সময়ে লোকও মিলিত না, এখন দুই পয়সার টিকিট দিয়া একখানা চিঠি লিখিলেই ডাকে চিঠি যাইতে পারে। অতএব তোমাদের মনে রাখা উচিত যে ইংলণ্ডের বড় বড় লোকের মত এই যে, আমাদের ভারতবর্ষের লোকেরা যতদিন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত না হইবেন ততদিন ইংরেজেরা আমাদের কল্যাণের জন্যই আমাদিগের রাজকার্য্য করিবেন। ইংলণ্ডের লোকদের মত আমাদের যখন শরীরের বল, মনের তেজ, কার্য্যক্ষমতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান হইবে, আমরা যখন খুব সাহসী হইয়া দেশের হিতের জন্য প্রাণ দিতেও ডরাইব না, আমরা যখন সত্যকাজ করিতে কাহারো ভয় করিব না, আমরা যখন ইংলণ্ডের লোকের ন্যায় ভারতের সমস্ত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলকে এক দেশের এক জাতির ও এক ঘরের লোক বলিয়া দেখিতে শিখিব, একজনের ভাল দেখিয়া আর একজনে

হিংসা করিব না তখন আমাদের দেশ আমাদিগকে ফিরাইয়া দিয়া ইংরেজেরা ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবেন। পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষায় খুব উঁচু হয়, পরমেশ্বর সেই জাতির লোক দ্বারায় নীচু জাতির লোকের ভাল করান।

তোমাদিগকে যে সকল কথা বলা হইল আমাদের ভারতবর্ষের সকল স্থানের বড় বড় লোকেরাই এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাই তাঁহারা সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে ইংলণ্ডের প্রজাদের ন্যায় আমরা হইতে পারি। গত ২৮শে ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় এবার মহা উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকার "টাউন হল" ঘরে তিন দিন সভা হইয়াছিল। এই সভায় মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যভারত, পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা হইতে দুই এক জন করিয়া দেশের মধ্যে যাঁহারা গণ্য, মান্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এমন সব লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দেশের লোকেরা তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যাহাতে ভারতবর্ষের লোক ইংলণ্ডের লোকের ন্যায় যুদ্ধ বিদ্যা শিখিতে পারে, বড় বড় চাকুরী পাইতে পারে, দেশের আইন কানুন করিবার সময়ে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতে পারে, এই সকল কথা লইয়া ভারতবর্ষের সকল স্থানের বড় বড় লোকেরা কলিকাতায় বসিয়া অনেক পরামর্শ করিয়াছেন। এবার কলিকাতায় যাহা দেখিয়াছি এমন আর কখনও দেখি নাই। ইতিহাসে পড়িয়াছি যে, এমন একদিন ছিল যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অর্থাৎ আদিম হিন্দুজাতি একত্রে বাস করিতেন, তার পর তাঁহারা ভারতবর্ষেরও অনেক দূরদেশের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, রুচি ও ব্যবসায় অনুসারে নানা জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। আগে আমরা ভাবিতাম কেবল বাঙ্গালাদেশের লোকেরাই বুঝি আমাদের দেশীয় লোক। এবার স্বচক্ষে দেখিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। এবার দেখিলাম, ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, নানা দিক হইতে ভারতসন্তানগণ উপস্থিত হইয়া একের দুঃখের কথা অন্যকে বলিতেছেন, বাঙ্গালী পঞ্জাবীর গলা ধরিয়া ভাই ভাই যেমন প্রাণ খুলিয়া কথা কয় তেমনি কত মনের কথা কহিতেছেন; হিন্দু মুসলমানকে "ভাই" বলিয়া কত কথা কহিতেছেন, খ্রীষ্টান হিন্দুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কেমন সুন্দর ছবি দেখাইতেছেন। বোম্বাই মান্দ্রাজ হইতে যাঁহারা সুশীল, সুবোধ, ধার্ম্মিক লোক আসিয়াছেন আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত তাঁহাদের কত আদর ও সম্মান করিয়াছেন। বোম্বাই মান্দ্রাজের সেই সকল ভাল লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক বাঙ্গালী পুরুষ ও স্ত্রীলোক বাড়ীতে খাওয়াইয়াছেন ও ভালবাসা দিয়াছেন। এমন দৃশ্য যে দেখিল না সে বড়ই দুর্ভাগ্য।

পেটুক পুষি।

খাবার পেয়ে খোকা বাবুর মুখটী যেন আলো।
ধামী হাতে, নির্জ্জনেতে বস্‌লেন গিয়া ভালো।
ভাব্‌ছেন মনে, ভাই বোনে টের না পেলেই হয়,
এক্‌লা বসে, খাবেন কসে, খাবার সমুদয়!
নিষ্কণ্টকে, দিচ্ছেন্ মুখে যেই হাসি হাসি,
হেন কালে, দেখতে পেলে, পুষি সর্ব্বনাশি!
শত্রুর জ্বালায়, খাওয়া যে দায়, এত শত্রুও আছে,
পেটুক পুষী বড়ই খুসী ঘনিয়ে আসে কাছে।
খোকা ভাবে নেমে যাবে একটু পেলেই পরে
নতুবা ডেকে আন্‌বে কাকে নাজানি এ ঘরে;
ডাক শুনে ভাই বোনে যদি ছুটে আসে,
কেড়ে খাবে সব ফুরাবে কাঁদ্‌ব একা বসে?
ভাবি মনে, তার বদনে প্রথম খানি তুলে,
দিয়ে তারে তুষ্ট করে, নিয়ে যাক চলে।
একটী পেয়ে খুসী হয়ে যায় না হতভাগা,
লেজটী তুলে কাঁধে ঠেলে আর একখানির লাগি।
এমনি করি, হয় যে দেরী, ভাই বোনেরা আসে;
একলা খাবার, চেষ্টা খোকার, দেখে সবাই হাসে।

কৃপণ কুকুর।

স্কটলণ্ড দেশের একজন ভদ্রলোকের একটী কুকুর ছিল, তাহাকে তিনি ডাণ্ডি ডাণ্ডি বলিয়া ডাকিতেন। ঐ কুকুরের বুদ্ধির কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রভু যখন যে জিনিস আনিতে বলিতেন ডাণ্ডি তাহা দশটা জিনিসের মধ্য হইতে খুঁজিয়া আনিতে পারিত। প্রভু বলিলেন কাপড়ের ভিতর হইতে চামড়ার ব্যাগটা আন, ডাণ্ডি গিয়া কাপড় তাড়ি বিতাড়ি করিয়া ব্যাগটা বাহির করিয়া মুখে করিয়া আনিয়া দিল। এইরূপে প্রভু যখন যাহা আদেশ করিতেন ডাণ্ডি তখনই তাহা পালন করিত।

একদিন সেই বাড়িতে কতকগুলি লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের পকেট হইতে একটা আধুলি পড়িয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে আধুলিটির খোঁজ হইল। সকলেই এদিকে ওদিকে খুঁজিতে লাগিলেন। ডাণ্ডি তখন ভাল মানুষটির মত ঘরের এক কোণে বসিয়া আছে। তাহার প্রভু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ডাণ্ডি আধুলিটা খুজে দে, তোকে একখানা বিস্‌কুট দিব। ডাণ্ডি আধুলিটী আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। ভিতরের কথা, ডাণ্ডি নিজে ঐ আধুলিটী কুড়াইয়া রাখিয়াছিল।

তাহার প্রভুর বান্ধবগণ প্রায় তাহাকে দুই একটা পয়সা দিতেন। ডাণ্ডি জানিত যে পয়সা দিলে রুটী-ওয়ালার দোকান হইতে রুটী পাওয়া যায়। এই জন্য সে পয়সা পাইলেই ছুটিয়া রুটির দোকানে যাইত এবং রুটি কিনিয়া খাইত। এইরূপে ডাণ্ডি একটা আসল পথ-ভিকারী হইয়া উঠিল। পরিচিত লোক পথে দেখিলেই আকার ইঙ্গিতে পয়সা চাহিত এবং পয়সা পাইলেই রুটীর দোকানে যাইত। একদিন ডাণ্ডি একজন ভদ্রলোকের নিকট পয়সা চাহিল। ভদ্রলোক বলিলেন "হায়! হায়! ডাণ্ডি আমার সঙ্গে পয়সা নাই, বাড়ীতে আছে," এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন; স্বপ্নেও মনে করিতে পারিলেন না যে, ডাণ্ডি তাহাঁর কথা বুঝিয়াছে। কিন্তু তিনি বেড়াইয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ কে আসিয়া দ্বার ঠেলিতেছে। চাকরাণী খুলিয়া দেখে যে ডাণ্ডি। গৃহস্বামী বুঝিলেন ডাণ্ডি পয়সা আদায় করিতে আসিয়াছে। তাহাকে একটা পয়সা দিলেন। কিন্তু সেটা মেকি পয়সা। ডাণ্ডির অনেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল বটে কিন্তু মেকি পয়সা ধরিতে পারে এতদূর বুদ্ধি ছিল না। সে মেকি পয়সাটি লইয়া একছুটে রুটীর দোকানে গেল এবং পয়সাটী রুটীওয়ালার হাতে দিল। রুটিওয়ালা মেকি পয়সা দেখিয়া রুটী দিল না বরং বলিল "চোর কুকুর! তুই আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস্।" ডাণ্ডি বড় অপমানিত হইয়া সেই মেকি পয়সাটী লইয়া বরাবরসেই পয়সাদাতা ভদ্রলোকটীর বাড়ীতে গেল। দ্বার ঠেলিতে লাগিল; দাসী দ্বার খুলিলে তাহার পায়ের নিকট পয়সাটী রাখিয়া তাহার প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তিসূচক দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেল।

ডাণ্ডির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কীর্ত্তি এখনও বলা হয় নাই। সে লোকের নিকট নিত্য যে পয়সা পাইত, তাহাতে তাহার পেট ভরিয়া রুটী খাইয়াও পয়সা বাড়িত। ডাণ্ডি ভাবিল এসব পয়সা সময়ে কাজে লাগিবে। এই ভাবিয়া সেই সকল

পয়সা আপনার শয্যার নিম্নে সঞ্চয় করিতে লাগিল। তাহার শয্যা ত আর কেহ তুলিয়া দেখিত না, সুতরাং সে তাহার উপর পরম সুখে শুইয়া থাকিত। কৃপণ যেমন নড়ে চড়ে আর নিজের ধন দেখে, ডাণ্ডি সেইরূপ নড়িত চড়িত আর নিজের শয্যাটীর উপরে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিত। একদিন রবিবার অতি প্রাতঃকালে ডাণ্ডি রুটী কিনিয়া আনিতেছে, তাহার প্রভু দেখিয়া ভাবিলেন "এত সকালে ডাণ্ডি পয়সা কোথায় পাইল? তবে বোধ হয় পয়সা জমাইয়া রাখে" এই ভাবিয়া চাক্‌রাণীকে তাহার ঘর অন্বেষণ করিতে বলিলেন। স্ত্রীলোকটী যতক্ষণ এ দিক ওদিক খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, ততক্ষণ ডাণ্ডি কিছু বলে নাই; সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যক্তির ন্যায় আধখানি চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল। যেই চাক্‌রাণী আসিয়া তাহার শয্যাতে হাত দিল অমনি উঠিয়া সেই চাকরাণীর কাপড় ধরিয়া টানিয়া অন্য দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বারণ না শুনিয়া চাকরাণীটী যখন শয্যা তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন ভয়ানক ক্রোধ করিয়া তাহাকে কামড়াইতে গেল। অবশেষে তাহার প্রভু আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন। চাকরাণী শয্যা নাড়িয়া দেখে যে, ডাণ্ডি প্রায় চারি আনা পয়সা শয্যার তলে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। ডাণ্ডি দেখিল বড় মুস্কিল, শয্যার তলে পয়সা রাখিলে নিস্তার নাই। সেই অবধি পয়সা সে পাইলে মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিত। এমন কুকুরের কথা কি কেহ কখনও শুনিয়াছ?

দীপশিখা।

তেলের বাষ্প বাতাসের অম্লজনের সহিত মিসিবার সময় যে একটা কাণ্ড কারখানা হয় তাহাকেই আমরা সাধারণ ভাষায় "প্রদীপ" বলিয়া থাকি। একটা জিনিস অম্লজনের সহিত মিশিয়া এই ব্যাপারের সৃষ্টি করিল। মিসিবার সময় একটা জিনিস তাতিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আর আমরা বলিলাম "ঐ আগুনের শিখা।" গতবারে আমরা মোটামুটি এই কথাগুলি শিখিয়াছি।

কিছুকাল হইল, আমাদের একজন পাঠক আমাদিগকে একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমরা তাহার উত্তর দিতে গিয়া এতদিন দেরি করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাই নাই। বিষয়টী খুব কঠিন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তা ছাড়া উত্তর না দিতে পারার আর একটা কারণ আছে। দুঃখের বিষয়, আমরা যতবার কেরোসিন্ ল্যাম্পের পলিতা বাড়াইয়া দিয়াছি, একবারও তাঁহার পত্রোল্লিখিত আশ্চর্য্য ঘটনাটী দেখিতে পাই নাই। পলিতা কমাইয়া দিলে কতকটা ঐরূপ হয় বটে। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে কেহ যদি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে করিয়া দেখিতে পারেন। বিষয়টা এইঃ—

"আমি একদিন কেরোসিন্ ল্যাম্পের নিকট বসিয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ একবার ঘর অন্ধকার হইল, ল্যাম্পের দিকে তাকাইয়া দেখি যে, "পলিতার মুখে একটী ফুল (কালীতে যে একরূপ ফুলের ন্যায় ল্যাম্পের মুখে হয়) হইয়া আছে ও নীলরঙ্গের শিখা উঠিতেছে, প্রকৃত আলো নাই। এইরূপে ৫।৬ সেকেণ্ড পর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পুনরায় ঐরূপ হয় কিনা দেখিবার জন্য তাকাইয়া রহিলাম। অধিকক্ষণ গত হইতে না হইতেই ঐরূপ হইল। কিন্তু সে বার অন্যরূপ—প্রকৃত আলোই ল্যাম্পের মুখ হইতে ৩।৪ অঙ্গুলি উপরে জ্বলিতে লাগিল, ব্যবধান স্থানের মধ্যে কিছুই দেখা গেল না। এরূপ ৩।৪ বার হওয়ার পর আলো একেবারে অদৃশ্য হইল, ½ মিনিট পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যাই দেশালাই জ্বালিলাম তৎক্ষণাৎ ল্যাম্প ও আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিল। কিছুকাল পর যথার্থই প্রদীপ নিভিল। সেবার আমাকে পুনরায় উচিত মত ধরাইতে হইল।"

আমরা যতবার পলিতা বাড়াইয়া দিয়াছি, ততবারই আলোটা লম্বা জিব্ বাহির করিয়া কেবল ধূম উদ্গীরণ করিয়াছে। শেষে চিম্‌নী ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কায় আবার পলিতা কমাইয়া দিতে হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

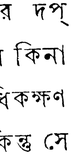

খার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমাদিগকে অনেক মহাজনের জীবনচরিত বলিয়াছি আজ এমন একজন মহাত্মার জীবনচরিত বলিব, যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের বাঙ্গালির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় ঈশ্বর-পরায়ণ, ধার্ম্মিক লোক এখন বাঙ্গালাতে জীবিত নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি এখনও জীবিত আছেন কিন্তু আর অধিকদিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না। বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতাবশতঃ ইহাঁর শরীরের অবস্থা দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে; এবং দেখিয়া ভয় হইতেছে যে, এশরীর অধিকদিন রহিবে না। যেদিন ইনি এ সংসার পরিত্যাগ করিবেন সেদিন ভারতবর্ষের একটী উজ্জ্বল তারা খসিয়া পড়িবে।

তবে ইহাঁর বিষয় কিছু শুন। ইহাঁর নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহাঁর যে প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছ ইহা তাঁহার অত্যন্ত প্রাচীন অবস্থার প্রতিমূর্ত্তি; বিশেষতঃ আমাদের দেশে এখনও চিত্রবিদ্যার ততদূর উন্নতি না হওয়াতে আমরা মনের মত করিয়া কোন লোকের ছবি করিতে পারি না। সুতরাং এ ছবিতে সেই মহাপুরুষের আসল চেহারা কিছুই প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতাতে একজন বিখ্যাত বড় মানুষ ছিলেন। ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রভুত্বশক্তিতে তাঁহার সমকক্ষ লোক সে সময়ে কলিকাতায় ছিল না। গবর্ণর জেনেরাল হইতে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সমুদায় ইংরাজ তাঁহার হাতধরা ছিল। দেশের লোকের ত কথাই নাই। তিনি ধনে,

মানে, পদে, সর্ব্বাগ্র গণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁর নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর। ইহাঁর নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এই দুইজনের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ভার পড়ে। ১৮৩৩ সালে রামমোহন রায় ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর রাধাপ্রসাদ রায় দিল্লীতে গমন করেন; তখন ব্রাহ্মসমাজের ভার দ্বারকানাথ ঠাকুরের উপর পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়ক্রম তখন ১৭ কি ১৮ বৎসর। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার বাল্যকালে রামমোহন রায় একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন; তাঁহার পিতা,

রামমোহন রায়ের সহিত বন্ধুতা থাকাতে, প্রথমে তাঁহাকে সেই স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পর তিনি হিন্দু কালেজে পড়িয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর যে কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী ছিলেন, তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেরূপ ধনীর ছেলে হইলে মানুষ কত বাবুগিরিতে থাকে তাহা তোমরা বুঝিতেই পার। সেরূপ বিলাস ও বাবুগিরির মধ্যে বাস করিয়া লোকের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি মলিন হইয়া যায়। নানা কুসঙ্গী জুটিয়া সর্ব্বদা কুপথে যাইবার জন্য পরামর্শ দিতে থাকে; স্বার্থপর লোকে আপনাদের কাজ সারিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদা তোষামোদ করে; তাহাতে মস্তক ঘুরিয়া যায়; এই কারণে এদেশের বড় মানুষের ছেলেরা প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। বড় মানুষের ছেলেদিগকে মানুষ করিবার জন্য যত টাকা ব্যয় হয়, যত পরিশ্রম হয়, যত চেষ্টা হয়, কোন গরিবের ছেলের জন্য তেমন হয় না। অথচ অতি অল্প বড় মানুষের ছেলেকেই মানুষ হইতে দেখা যায়। ছেলেবেলা হইতেই তাহাদের নানা পাপে মতি হয়, ও ধনের অহঙ্কারে মন পূর্ণ হয়। এখন বিবেচনা কর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে তাঁহার বয়স যখন ১৭ কি ১৮ বৎসর তখন হইতেই তাঁহার ধর্ম্মে মতি হইল। যে দুই কারণে তাঁহার মনে ধর্ম্ম চিন্তার উদয় হইল, তাহা শুনিলেও তোমরা আশ্চর্য্য বোধ করিবে; কারণ তেমন ঘটনা প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের জীবনে ঘটিতেছে—কিন্তু সেরূপ চিন্তা অন্য কাহারও মনে উদয় হয় না। প্রথম, তিনি একদিন রাত্রিকালে ছাদের উপরে শয়ন করিয়া আকাশের শোভা দেখিতেছিলেন। নির্ম্মল আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে, দেখিয়া তাঁহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল! মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাদের উপরে কি কেহ কর্ত্তা নাই? অন্য লোকের মনে এরূপ চিন্তা যদিও কখনও উঠে, দুই দণ্ডের মধ্যেই আবার মিলাইয়া যায়। কিন্তু এই মহাত্মা স্বতন্ত্র ধাতুতে নির্ম্মিত, সুতরাং তাঁহার প্রাণে এই প্রশ্ন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তত বিষয় সুখের মধ্যে থাকিয়াও এই চিন্তা তাঁহার প্রাণে জাগিতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার একজন আত্মীয়া বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। সেই শব দাহের সময়ে তিনি শ্মশানে গিয়াছিলেন। শ্মশান হইতে সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিল এবং আপন আপন কাজে নিযুক্ত হইল, কিন্তু তাঁহার প্রাণে এক যুগান্তর ঘটিয়া গেল। তিনি দিব্যচক্ষে বিষয় সুখকে অনিত্যও অসার বলিয়া দেখিতে পাইলেন। যেন কি এক অপূর্ব্ব আলোক তাঁহার প্রাণে আসিয়া পড়িল! তিনি যেন কি এক অমূল্য বস্তু লাভ করিলেন! এখন হইতে তাঁহার মনে ধর্ম্ম-চিন্তা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের চর্চ্চা ভিন্ন আর কোন চর্চ্চা তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া নিরন্তর ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বাড়ীর নিকটে ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী, তাঁহার পিতা তাহার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন, এবং তাহার রক্ষার জন্য মাসে মাসে প্রায় ৮০।৮৫ টাকা অর্থ সাহায্য করিতেন, তথাপি তিনি ইহার পূর্ব্বে সেখানে বড় একটা যাইতেন না। যেদিন হইতে প্রাণে ধর্ম্ম-চিন্তা প্রবল হইল, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করিলেন। গিয়া দেখেন, সমাজের অতি হীন অবস্থা। রামমোহন রায় যে আচার্য্যকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই কোন প্রকারে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন;

পুরাতন সভ্যদের প্রায় কেহই আর আসেন না। কেবল সমাজের দিন দুইচারিজন পথিক লোক আসিয়া বসে। ওদিকে সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রচার হইতেছে। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজকে সংস্কার করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। তখন তাঁহার বয়স অনুমান ২০ বিশ বৎসর হইবে।

তিনি উৎসাহের সহিত ধর্ম্মালোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩৯ সালে "তত্ত্ববোধিনী সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করা, ধর্ম্ম-বিষয়ে বিচার করা, ঐ সভার প্রধান কার্য্য হইল। এই সময়ে একটী ঘটনা হয় তাহাতেও ঐ মহাত্মার আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাবের ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে। একদিন তিনি গভীর ধর্ম্ম-চিন্তাতে মগ্ন হইয়া বেড়াইতেছেন এমন সময়ে একটী পুথীর পাতা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে লাগিল; তিনি কুড়াইয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন, ভাল বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাহার অর্থ করিয়া দিলেন। সেটী "ঈশোপনিষদ্" নামক বেদের এক গ্রন্থের প্রথম পাতা। দেবেন্দ্র নাথ দেখিলেন যে সেই একটী পাতাতে অতি আশ্চর্য্য গভীর সত্য সকল নিহিত রহিয়াছে! দেখিয়া তাঁহার বেদ ও উপনিষদের প্রতি ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি উপনিষদ্ সকল পাঠ করিতে পারিবেন বলিয়া মনোযোগ সহকারে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পাঠ ও আত্মচিন্তা দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মভাব দিন দিন গাঢ় হইতে লাগিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইল। এই পত্রিকা এখনও আছে এবং তাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে অতি গভীর সত্য সকল প্রকাশ হইয়া থাকে। তোমরা সকলেই অক্ষয় কুমার দত্তের নাম জান; তাঁহার প্রণীত চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ তোমরা সকলেই পড়িয়াছ। সেই অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির গুণে তত্ত্ববোধিনী অল্প দিনের মধ্যে দেশের বাঙ্গলা সংবাদ পত্র সকলের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা দেশমধ্যে ধর্ম্মচিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল; আমাদের দেশের যে সকল প্রাচীন শাস্ত্র এতদিন লোকে জানিতনা তাহা উদ্ধার হইতে লাগিল; সেই সকলের অনুবাদ দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া যাইতে লাগিল; আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররূপ খনিতে যে এত রত্ন আছে তাহা জানিয়া সকলের মনে স্বদেশানুরাগ প্রবল হইতে লাগিল; যে ব্রাহ্মসমাজ মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আবার তেজের সহিত বাড়িয়া উঠিল।

এদিকে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় ধর্ম্ম-চিন্তার অতি গভীর স্থানে প্রবেশ করিতেছেন। তখন তাঁহার মনে একটী প্রশ্ন বিশেষভাবে প্রবল হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাতে লোকের মতি না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম চর্চ্চাতে ফল কি? যদি লোকে ঈশ্বরের পূজা না করে, তবে তাহাদিগকে সাকার দেব দেবীর পূজা ছাড়াইয়া ফল কি? এই ভাবিয়া ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এবং আরও কয়েক জন বন্ধু একত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহারা রোগাদিরদ্বারা অশক্ত না হইলে

প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিবেন। তাঁহার সহিত যত লোকে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কে কোথায় গিয়াছে, হয়ত তাহাদের মধ্যে অনেকেই সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘণ করিয়াছে কিন্তু তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একটী দিনের জন্য তাহা ভঙ্গ করেন নাই। এখন তাঁহার শরীর জরাজীর্ণ এখনও তিনি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন। বুঝিয়া লও ইনি কি ধাতুর লোক। সমাজমধ্যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা যখন আরম্ভ হইল তখন লোকের ধর্ম্ম-জীবন ফিরিতে লাগিল। তাঁহার সহবাসে থাকিয়া অনেক দুরাচার লোকের চরিত্র শুধরাইয়া যাইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সে সময়ে যে কেহ ইংরাজী শিক্ষা করিত, সেই ইংরাজী সভ্যতা ভাল বাসিত, সুরাপানে রত হইত; ধর্ম্মের প্রতি একবারে উদাসীন হইয়া পড়িত। এই মহাত্মার জীবনে ইহার ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিল। তাঁহার স্বদেশানুরাগ শতগুণ বাড়িয়া গেল; এদেশীয় শাস্ত্র, এদেশীয় ভাব, এদেশীয় রীতি নীতি, তাঁহার ভাল লাগিত; তিনি ঋষিদের প্রকৃত শিষ্য হইয়া তাঁহাদের পদতলে বসিলেন; মনোযোগ পূর্ব্বক পাপাশক্তি ও দুর্গতি হইতে যুবকদিগকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং ধর্ম্মচিন্তাতে গম্ভীররূপে নিমগ্ন হইলেন। এই জন্যই বলিয়াছি ইহাঁর প্রকৃতি সাধারণ প্রকৃতি নয়।

"সত্যস্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা করিব না" এই প্রতিজ্ঞা করার পর তাঁহাকে অনেক ক্লেশ পাইতে হইত। তখনও তাঁহার অতুল প্রভাব-শালী পিতা বর্ত্তমান। তখনও বাড়ীতে মহা ধুমধাম করিয়া দুর্গোৎসব হইত। সে সময়ে বাড়ীর ছেলেদিগকে অঞ্জলি দিতে হইত, তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তাহা দিতেন না। সেই কয়েক দিন বাড়ী ছাড়িয়া পথে পথে বাগানে বাগানে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া কাটাইতেন।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পিতা ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর দুইটী ঘটনা হয় তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম-বীরত্বের আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম, তাঁহার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধের দিন যতই নিকটে আসিতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রাণে এই চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল, আমি যখন সত্যস্বরূপের উপাসক তখন আমি কিরূপে সাকার দেবদেবীর পূজা করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করিব? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সাকার দেবদেবীর পূজা করিবেন না। তাঁহার বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তিনি বাড়ীর বড়ছেলে তিনি শ্রাদ্ধে যোগ দিবেন না, পরিবার পরিজন সকলে কাঁদিতে লাগিল। তিনি কোনক্রমেই নিজের ব্রত লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রাদ্ধের অপরাপর কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তিনি কেবল দান উৎসর্গ করিয়া, সমস্ত দিন বেদপাঠও উপাসনাদিতে কাটালেন। এই সময় হইতে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে আর একটী ঘটনা ঘটিল। তাঁহার পিতা মরিবার সময় অনেক লক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই ঋণের দায়ে তাঁহার কারঠাকুর কোম্পানী নামে যে সওদাগরী ছিল তাহার পতন হইল। সওদাগরী ছাড়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের যে বৃহৎ জমিদারী ছিল তাহার অধিকাংশ তাঁহার নিজের উপার্জ্জিত এবং অল্পাংশ তাঁহার পৈতৃক ছিল। এই পৈতৃক জমিদারী তিনি পুত্রদের জন্য নিজ

সম্পত্তি হইতে পৃথক করিয়া কয়েক জন বিশ্বস্ত ব্যক্তির জিম্বায় তাহা রাখিয়া দেন। এই সম্পত্তির উপরে তাঁহার পাওনাদারদের হাত দিবার অধিকার ছিল না কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন দেখিলেন যে তাঁহার পিতার উপার্জ্জিত সমুদায় বিষয় বিক্রয় করিয়াও সমস্ত ঋণ শোধ হয় না, তখন তিনি নিজেদের খাওয়া পরার একমাত্র উপায় যে জমিদারী বিশ্বস্তদের জিম্বায় আছে তাহাও বিক্রয় করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি যখন সত্য-স্বরূপের উপাসক হইয়াছি তখন নিজের বিষয় থাকিতে পিতার পাওনাদারদিগকে তাহা না দিয়া অধর্ম্মে পতিত হইতে পারিব না?" কোন ক্রমেই মনকে তাহার জন্য প্রস্তুত করিতে পারিলেন না। ওদিকে তাঁহার পিতার এত ঋণ রহিয়াছে যে সমুদায় বিষয় বিক্রয় হইয়া তাঁহাদের ফকির হইয়া যাইবার কথা। তিনি সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না; বাড়ীর লোকদিগকে বলিলেন যে, "ফকির হই আর মরিয়াই যাই, আমি প্রবঞ্চনা করিতে পারিব না" বাড়ীতে কান্নাহাটি পড়িয়া গেল। তিনি পাওনাদারদিগকে ডাকাইয়া সমুদায় বিষয়ের একটী তালিকা করিয়া তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার এই সাহস ও সাধুতা দেখিয়া পাওনাদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলিলেন। ইহার ফল এই হইল তাঁহারা বিষয় বিক্রয় করিয়া লইলেন না। দেবেন্দ্র বাবুর পরিবারের জন্য মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া আপনাদের হাতে বিষয় রাখিয়া চালাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আবার তাঁহারা নিজেই সেই বিষয় দেবেন্দ্র বাবুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে দেবেন্দ্র বাবু বহুকাল ধরিয়া সেই সমুদায় ঋণ শোধ করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার পিতা কলিকাতার চ্যারিটেবল সোসাইটীতে একলক্ষ টাকা দিবার যে লেখা পড়া করিয়াছিলেন কিছু দিন হইল তিনি সেই একলক্ষ টাকাও দিয়াছেন। এমন সুযোগ্য পুত্র কয়জন দেখা যায়। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন, ইহার প্রমাণ যদি কোথাও দেখিতে চাও, তবে এই মহাত্মার জীবনে দেখ। আজ এই পর্য্যন্ত। এখনও অনেক বলিতে অবশিষ্ট রহিল পরে বলিব।

ক্রমশঃ।—

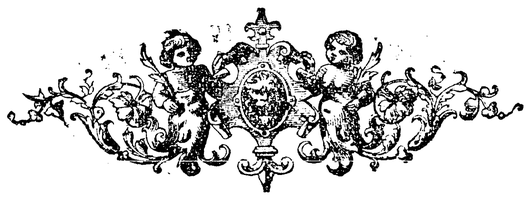

ফুলের সাজি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পিতা ও কন্যার সাক্ষাৎ।

মনোরমার দুঃখের কাহিনী শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। পরমেশ্বর কোমল হৃদয়া বালিকাকে কি পরীক্ষাতেই ফেলিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে আর একটী দিন চলিয়া গেল। কারাগারই এখন মনোরমার আবাসস্থান, দ্বারে ভীষণাকার প্রহরী, হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র নাই, আকার দেখিলে সাক্ষাৎ যম বলিয়া বোধ হয়। হায়! বালিকা তুমি অকারণে

কত ক্লেশই পাইতেছ; ঈশ্বরই দেখিতেছেন তুমি কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ।

মনোরমার কারাগৃহ ত্যাগ করিয়া আমরা একবার বিচারকের গৃহে গিয়া দেখি তিনি কি করিতেছেন। ঐ দেখ তাঁহার মুখে চিন্তার কালিমা পড়িয়াছে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। বিষম সমস্যা—কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। ভাবিলেন—তাই ত এই বালিকার বিচার করিতে তিন দিন অতীত হইল, তথাপি সত্য নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বালিকার নির্ভীক চিত্ত, সতেজ কথা শুনিলে তাহাকে নির্দ্দোষী ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু যদি সে প্রকৃত অপরাধী হয় তাহা হইলে এরূপ কপট ও দুষ্ট প্রকৃতি বালিকা আমি এই প্রথম দেখিলাম।

তিনি এখনও কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না বলিয়া আপনি রাজভবনে উপস্থিত হইলেন—এবং কোন বিশ্বস্ত রাজ-ভৃত্যকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া তাহাদ্বারা রাজমহিষী কথিত সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিলেন।

বিচারক মায়াকে আবার ডাকিয়া বিবিধ প্রকারে তাহাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিষম বিভ্রাট, অথচ একদিকে রাজ অন্তঃপুরে চুরী, অন্যদিকে বিশেষ প্রমাণাভাবে একটী বালিকার প্রাণদণ্ড! কারণ তখন চুরী অপরাধে প্রাণদণ্ডের নিয়ম ছিল। সমস্তদিন অনেক ভাবিয়া তিনি পরিশেষে মনোরমার পিতাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "দীননাথ! তুমি একবার তোমার কন্যাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি তোমায় সে কি বলে। দেখ, সকলে আমায় বলে আমি বড় কড়ালোক কিন্তু আমি কখনও কোন অবিচার করি নাই। তুমি কি এমন ইচ্ছা কর যে তোমার মেয়েটীর প্রাণদণ্ড হয়—যেরূপ ঘটনা তাহাতে সে নিশ্চয় দোষী—এবং আমাদের দেশের আইন অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু যদি সে এখনও তাহার দোষ স্বীকার করে ও আংটীটি ফিরাইয়া দেয় তাহা হইলে আমরা তাহাকে বালিকা বলিয়া অল্প শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি। নচেৎ তাহার প্রাণের আশা নাই, যাও যাহাতে সে আংটী ফিরাইয়া দেয় তাহা কর। তুমি পিতা, তুমি স্বীকার করাইয়া আংটি আদায় করিতে পারিবে। যদি তুমি না পার তোমাকেও আমরা দোষী জ্ঞান করিব এবং তোমাকে ও দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে।"

দীননাথ উত্তর করিল "আপনি যেমন বলিলেন সেইরূপই হইবে কিন্তু তাহাকে অনেক বার ভালরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি; সে নির্দ্দোষী সুতরাং তাহার দোষ স্বীকারের কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাহউক আমি যে তাহাকে দেখিতে পাইবার অনুমতি পাইলাম ইহাই যথেষ্ট।"

এক জন প্রহরী বৃদ্ধ দীননাথকে কারাগারে মনোরমার নিকট লইয়া গেল; দীন নাথ তথায় প্রবেশ করিলে পর, প্রহরী দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে গেল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, বৃদ্ধ ক্ষীণ দীপালোকে দেখিল, মনোরমা তৃণ শয্যায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। আহা! তাহার সে লাবণ্য নাই! মুখের সে হাসি হাসি ভাব নাই, শুষ্ক কমলের ন্যায় তাহার মুখখানি শ্রীহীন হইয়াছে! বৃদ্ধ দেখিল পার্শ্বে একখানি থালায় কতকগুলি অন্ন ও ব্যঞ্জন এবং একটি ঘটিতে এক ঘটি

জল। অনুমানে তাহার বোধ হইল, মনোরমা তাহা স্পর্শও করে নাই। এই সকল দেখিয়া বৃদ্ধ চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। হায় রে? ইহার এত কষ্টও ছিল, না জানি আরও বা কি ঘটে! সে এই চিন্তা করিতেছে এমন সময় মনোরমা স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল—বৃদ্ধ কন্যার গাত্রে হস্ত দিয়া বলিল "ভয় কি মা!" মনোরমা চক্ষু খুলিয়া দেখে, কাছে পিতা বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন "ভয় কি মা"। আশাতিরিক্ত এই মিলনে তাহাদের হৃদয় যে কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য, প্রথমে কাহারও মুখে কথা বাহির হইল না, দুজনেই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিল। তৎপরে বালিকা পিতার পা দুটী ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, নয়নজলে বৃদ্ধেরও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে দীননাথ কন্যাকে তাহার আগমনের কারণ সমস্ত খুলিয়া বলিল। মনোরমা বলিল, বাবা তুমি ত ঠিক জান আমি নিরপরাধিনী, হায়! শেষে কি তুমিও আমায় চোর বলিয়া স্থির করিলে? পিতা বলিল, মনোরমে! স্থির হও আমি তোমায় নির্দ্দোষী বলিয়া জানি কেবল বিচারপতির আজ্ঞায় তোমায় আবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তোমার এই দশা দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, না জানি তোমার আরও কি হয়।

মনোরমা বলিল বাবা, আমি নিজের জীবনের জন্য একতিলও চিন্তিত নহি, তোমার যদি কোন অনিষ্ট না হয় তাহা হইলে আমার প্রাণদণ্ড আজ্ঞা হইলেও আমি আনন্দে প্রাণত্যাগ করিতে পারিব।

পিতা বলিল "আমার জন্য ভয় নাই, আমাকে উহারা কোন দণ্ড দিবে না, কিন্তু তোমার কথা ভাবিয়া আমি বড় কাতর হইতেছি।" মনোরমা প্রফুল্লমনে কহিল যদি তোমার কোন ভয় না থাকে—তাহা হইলে আমার মৃত্যুও সুখের হইবে। কারণ আমি এ সংসার ত্যাগ করিয়া আমার পরম পিতা হরির কাছে যাইব—স্বর্গে আমার মার সঙ্গে আবার আমার মিলন হইবে। কথাগুলি শুনিয়া বিষাদের মধ্যেও দীননাথের প্রফুল্লতা আসিল—তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তিনি যে তোমায় এরূপ নির্ভয়ের ভাব আসিয়াছে; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র কন্যারত্ন হারাণ আমার পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও যন্ত্রণা-দায়ক। ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমি মনোরমাকে তোমার হাতে দিলাম—তুমি তাহাকে রাখিতে হয় রাখ না রাখিতে হয় মার।" কিয়ৎক্ষণ পরে বাষ্পবেগ সংবরণ করিয়া আবার কহিলেন—"মনোরমে—তুমি জান মায়ার সাক্ষ্যদানেই তোমার এই বিপদ—কিন্তু তুমি কি মনে মনে তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারিয়াছ! তাহার উপর তোমার কোন মন্দ ভাব নাই ত? মনোরমে! তাহাকে দয়া করিয়া ক্ষমা কর।" মনোরমা বলিল "আমি তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি; যাহা আমার ক্লেশ, সমুদায়ই হরির ইচ্ছায় হইয়াছে। অন্য কাহার দোষ দিব?" মনোরমার কথা শেষ না হইতেই প্রহরী দোর খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। প্রহরী দীননাথের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "চল"! মনোরমা পিতার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রহরীর উত্তেজনায় অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে পা সরাইয়া লইলেন, মনোরমা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া তৃণের উপর পড়িয়া রহিল।

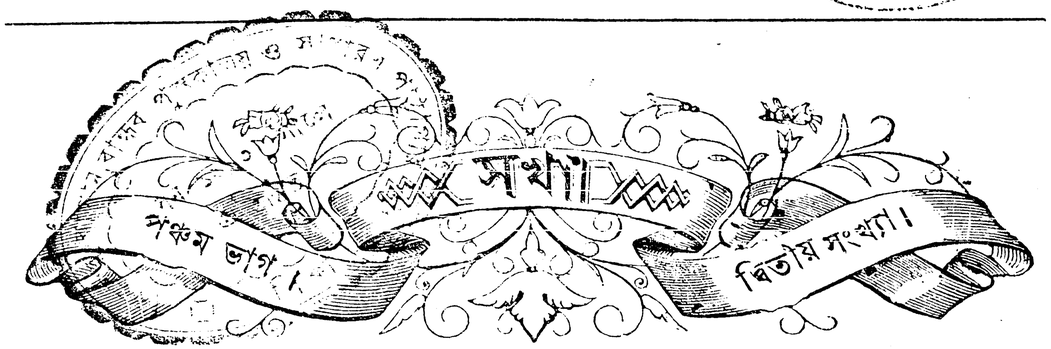

ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭।

আলেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া।

আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে সকলেই হয়ত জান না, যে আমাদিগের মহারাণীর সম্পূর্ণ নাম কি; কুইন ভিক্টোরিয়াই আমরা সকলে জানি; কিন্তু ইহাঁর প্রকৃত নাম আলেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া। সাধারণতঃ রাজারাণীদিগের ভাগ্যে যাহা প্রায় ঘটে না, ইহাঁর ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে; পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করা প্রায় কোন রাজার ভাগ্যেই ঘটে না, কিন্তু আগামী ২০শে জুন আমাদিগের মহারাণীর রাজত্ব পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষে পৃথিবীর যে যে স্থানে মহারাণীর রাজত্ব আছে সকল স্থানেই মহা উৎসব হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সকল স্থানে গত ১৬ এবং ১৭ই এই উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। এই জুবিলি উপলক্ষে কলিকাতায় এবং অন্য অন্য স্থানে মহা ধূমধাম হইয়া গিয়াছে; অনেক ভাল কাজও হইয়াছে এবং অনেক ভাল কাজের অনুষ্ঠানও হইয়াছে। এই জুবিলি উপলক্ষে এ দেশের জেল হইতে ২৩০০৭ জন কয়েদীকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে যাঁহার জন্য মহা উৎসব হইল তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল জানিবার জন্য অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে, তাই আজ আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী উপহার দিতেছি।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে বিলাতে কেন্‌সিংটন রাজপ্রাসাদে মহারাণীর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা এডওয়ার্ড ডিউক বা কেণ্ট, ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র ছিলেন। মহারাণীর মাতার নামও ভিক্টোরিয়া, ইনি জর্ম্মাণ দেশের কোন রাজবংশের কন্যা ছিলেন। তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্থ জর্জ্জ রাজা হইলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল, পুত্র সন্তান হয় নাই; কিছু দিন পরে সে কন্যারও মৃত্যু হয়; জর্জ্জের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা উইলিয়ম রাজা হইলেন। ইহাঁর দুই কন্যা জন্মে, কিন্তু জন্মের অল্প দিন পরেই দুই কন্যারই মৃত্যু হয়। তৃতীয় জর্জ্জের তিন পুত্র নিঃসন্তান হইয়া মরিলেন; চতুর্থ পুত্র এডওয়ার্ডের, ভিক্টোরিয়ার বয়স এক বৎসর হইতে না হইতেই, মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং পিতৃহীনা বালিকা ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে

২০শে জুন বৃটিশ রাজ্যের রাণী হইলেন; এই সময়ে তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র।

মহারাণী এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন, তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর। ইনি খুব সুন্দরী ছিলেন; বাল্যকালে ইহাঁকে বড়ই সুন্দর দেখাইত, তাই ইহাঁর পিতা মাতা ইহাঁকে আদর করিয়া "বাসন্তী কুসুম" বলিয়া ডাকিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভিক্টোরিয়ার বয়স এক বৎসর হইতে না হইতেই, তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা কন্যাকে সুশিক্ষিত করাই জীবনের ব্রত করিলেন, যাহাতে কন্যাকে সর্ব্বগুণভূষিতা করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ভিক্টোরিয়া মার কাছে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহারই গুণে তিনি আজ এত বড়। তাঁহার মার শিক্ষা যত্ন ও চেষ্টার গুণেই তিনি আজ পৃথিবীর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেছেন। ছেলে বেলায় বাড়ীতে বিশেষতঃ পিতা মাতার কাছে যে শিক্ষা হয় সেই শিক্ষাই মানুষকে গড়িয়া তোলে; ভিক্টোরিয়া বাল্যকালে মার কাছে সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন, জীবনে তাহার সুফলও ফলিয়াছে।

আমাদের দেশে বড় লোকের ছেলেদেরই লেখাপড়া হয় না, মেয়েদের ত দূরের কথা। ছেলে বেলা হইতে এত অধিক আদর দেওয়া হয় যে অল্প বয়সেই ছেলেরা নিতান্ত খারাপ হইয়া যায়। ভিক্টোরিয়া রাজবংশে জন্মিলেও তাঁহার মাতা বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহার শিক্ষা দিতে লাগিলেন। খাওয়া দাওয়া, লেখা পড়া, খেলা, বেড়ান এ সকল কাজেরই একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল। প্রথম প্রথম লেখা পড়ায় বিশেষ মনোযোগ দিতেন না; বলিতেন "এটা শিখে কি হবে?" "ওটা শিখ্‌লে কোন লাভ নাই।" কিন্তু ক্রমে লেখা পড়ায় তাঁহার মনোযোগ হইতে লাগিল, এবং যখন তাঁহার এগার বৎসর বয়স, তখনই লাটিন্, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় সহজে কথা বলিতে পারিতেন, অঙ্কশাস্ত্রে অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন, এবং উৎকৃষ্টরূপ শিল্পবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কয়জনের এ প্রকার বিদ্যা উপার্জ্জনের প্রতি অনুরাগ আছে? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এগার বৎসরের মেয়ের পক্ষে তিন চারিটা ভাষা শেখা কত আশ্চর্য্য! একখানা বাঙ্গালা বইএর দুই পাতা উল্টাইতে পারিলেই আমাদের দেশের মেয়েরা মনে করেন ঢের হইল; অধিক লেখা পড়া শিখিবার একটা যে ইচ্ছা তা যেন এদেশে নাই। তার পর একটু লেখা পড়া শিখিলেও শিল্প শিক্ষার দিকে আমাদের মেয়েদের মনোযোগ বড় কম। মহারাণী চিত্রবিদ্যা অত্যন্ত সুন্দর জানিতেন, আমাদের দেশে অতি অল্প মেয়েই চিত্রবিদ্যা বা অন্য কোন শিল্প জানেন।

ছেলেবেলা হইতেই মার কাছে ভিক্টোরিয়া মিতব্যয়ী হইতে শিখিয়াছেন। বিলাসিতা বা বাবুগিরির দিকে তাঁহার মন ছিল না; রাজবংশে জন্মিয়াও তিনি সামান্য ভাবে থাকিতেন। এক দিন ভিক্টোরিয়া শিক্ষয়িত্রীর সহিত কিছু জিনিষ কিনিবার জন্য বাজারে গিয়াছিলেন; কতকগুলি জিনিষ কিনিতেই, তাঁহার হাতে যে টাকা ছিল তাহা ফুরাইয়া গেল। একটা সুন্দর বাক্স দেখিয়া সেইটা লইবার জন্য তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল, কিন্তু টাকা নাই কি করেন; দোকানদার অন্য অন্য জিনিষের সঙ্গে বাক্সটাও বাঁধিয়া দিল। শিক্ষয়িত্রী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারীর হাতে টাকা নাই, তিনি এ বাক্স

আজ কিনিতে পারিবেন না।” দোকানদার অগত্যা বাক্সটা রাখিয়া দিল, মহারাণীও আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন, এবং পরে যখন হাতে টাকা হইল তখন কিনিয়া আনিলেন। আমাদের পাঠক পাঠিকারা কয়-জন এরূপ করিয়া থাকেন? কোন জিনিস কিনিতে ইচ্ছা হইলে হাতে টাকা থাক্ আর নাই থাক্, তাহা কিনিতে হইবেই হইবে; পিতা মাতার উপর সে জন্য কত আবদার কত অত্যা-চার করেন।

ভিক্টোরিয়ার যখন বার বৎসর বয়স তখন তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হইল যে, তিনিই রাণী হইবেন; এক জন বার বছরের মেয়ে এত বড় একটা রাজ্যের রাণী হইবেন একথা শুনিলে হয়ত অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখেন, কিন্তু ভিক্টোরিয়া একটুও গর্ব্বিত হন নাই; তিনি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “আমি তবে ভাল হব।” কয়জনের মনে এ কথাটি আসে? যাহার ছেলেবেলা হইতে এই সৎ ইচ্ছাটি থাকে, সেই কালে বড় হইতে পারে। ১৮৩৭ সালের ২০ এ জুন রাজা উইলিয়মের মৃত্যু হয়, তখন ভিক্টো-রিয়ার বয়স ১৮ বৎসর। প্রধান পুরোহিত তৎ-ক্ষণাৎ এই সংবাদ লইয়া ভিক্টোরিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন; ভিক্টোরিয়া এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত শোক পাইলেন, এবং পুরোহিতকে বলিলেন, “আপনি আমার জন্য প্রার্থনা করুন।” তখন তাঁহারা হাঁটু গাড়িয়া এই দুঃখের সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। সেই দিনই ১৮৩৭ সালের ২০ এ জুন ভিক্টোরিয়া ১৮ বৎসর বয়সে প্রকাণ্ড বৃটিশ রাজ্যের রাণী হইলেন। ইহার আট দিন পরে অভিষেক হইল এবং এই উপলক্ষে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের মণি মুক্তায় জড়িত এক মুকুট তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইল।

বাল্যকাল হইতেই ভিক্টোরিয়া অতিশয় বুদ্ধি-মতি ছিলেন। এই বালিকা বয়সে এতবড় একটা রাজ্যের রাণী হইয়া যে প্রকার ধীর ও গম্ভীর ভাবে এবং বিবেচনার সহিত কার্য্য করি-তেন, তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল। ১৮৪০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ২১ বৎসর বয়সে জর্ম্মন রাজকুমার ফ্রান্সিস্ এলবার্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং মহা সুখে স্বামীর সহিত জীবন যাপন করেন। কিন্তু ১৮৬১ সনে মহারাণী বিধবা হন, স্বামীর মৃত্যুর পর বহুকাল কোন আমোদ আহ্লাদে যোগ দেন নাই। মহারাণীর চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা; তার মধ্যে এক পুত্র এবং এক কন্যার মৃত্যু হইয়াছে।

মহারাণীর যে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব উপলক্ষে এত উৎসব হইল, এই পঞ্চাশ বৎসর অনেক বড় বড় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ আমা-দের দেশে এই পঞ্চাশ বৎসরে রাজনীতি সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে যে কত পরি-বর্ত্তন, কত উন্নতি হইয়াছে তাহা তোমরা বড় হইলে বুঝিতে পারিবে।

আমাদিগের মহারাণী রাজবংশে জন্মিয়া, এত বড় বৃটিশ রাজ্যের অধিশ্বরী হইয়াও বাল্যকাল হইতেই দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণে বিভুষিতা ছিলেন। গর্ব্ব বা অহঙ্কার তাঁহার একেবারেই নাই, তিনি বড় বিনয়ী। তিনি তাঁহার অসংখ্য প্রজাদিগকে বড়ই স্নেহ করেন; তাঁহার এই সকল সদ্‌গুণে মোহিত হইয়াই ইংরেজ ও তাঁহার আর আর প্রজারা তাঁহাকে এত ভক্তি করে এবং ভালবাসে; প্রজার এত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা অতি কম রাজার ভাগ্যেই ঘটিয়া

থাকে। মহারাণী বড় ধার্ম্মিকা; তাঁহার অভিষেকের পর বাড়ী ফিরিয়া যাইয়া মার কাছে বলিলেন, “মা আমি যে ইংলণ্ডের রাণী তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু যাহা হউক, মা রাণী হইয়া তোমার কাছে আমার প্রথম অনুরোধ এই যে, আমাকে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল একলা থাকিতে দাও।” মাতা তাহাতে সম্মতি দিলেন, তখন ভিক্টোরিয়া একাকী সেই দুই ঘণ্টা কাল, এই বালিকা বয়সে তাঁহার উপর যে গুরুতর কাজের ভার পড়িল, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মহারাণীর দয়া অত্যন্ত অধিক; তিনি রাণী হইবার অল্পদিন পরেই ডিউক অব ওয়েলিংটন তাঁহার কাছে একখানি মৃত্যুর আজ্ঞা সহি করাইতে আসিলেন। একজন সৈনিক দল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কোর্টমার্সেলে তাহার মৃত্যু দণ্ড হইয়াছে, মহারাণীর তাহাতে সহি দিতে হইবে। মহারাণীর প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল, কেমন করিয়া একজনের প্রাণ বধের আজ্ঞা দিবেন। তাঁহার এত কষ্ট হইল যে চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তখন ডিউককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এব্যক্তির স্বপক্ষে কি কিছুই বলিবার নাই?” ডিউক বলিলেন, “এ লোকটা অতি অকর্ম্মণ্য, কোন কাজই করে না, তবে জানিনা, শুনিয়াছি ইহার চরিত্র ভাল।” মহারাণী আহ্লাদে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ডিউক আপনাকে শত শত ধন্যবাদ; এ ব্যক্তি সৎলোক, এইজন্য ইহাকে আমি ক্ষমা করিলাম।” কি উপায়ে এ হতভাগ্যের জীবন রক্ষা করিবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন, যখন শুনিলেন সে ব্যক্তির চরিত্র ভাল, তখন সেই জন্যই তাহার প্রাণ দণ্ড রহিত করিলেন।

ভিক্টোরিয়া অত্যন্ত সাধু চরিত্রা এবং ন্যায়-পরায়ণা। এক সময়ে প্রধান মন্ত্রি তাঁহাকে কোন একটা দলিল সহি করিবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং বলেন যে কাজের সুবিধার জন্য সেটা করা বড় দরকার; কাজটা বোধ হয় ন্যায়সঙ্গত ছিল না। সাধুশীলা ভিক্টোরিয়া উত্তর করিলেন, “ন্যায় যাহা তাহা কর্ত্তব্য, অন্যায় যাহা তাহা কখনই করা উচিত নহে, ইহা আমি বাল্যকালই শিখিয়াছি, কাজের সুবিধা আমি বুঝি না, যাহা ন্যায় তাহা করিব, যাহা অন্যায় তাহা করিব না।” এই সকল সদ্‌গুণ না থাকিলে মহারাণী আজ এত বড় হইতে পারিতেন না।

মহারাণী অন্যায় দেখিতে পারেন না। এক দিন বাড়ীতে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রেলিং এ বার্ণিশ লাগাইতেছিল; তাঁর দুটি মেয়ে, তাহারা তখন খুব ছোট ছিল, গিয়া সেই বৃদ্ধার কাছে আবদার করিতে লাগিল যে, তাহারা বার্ণিশ করিবে। বৃদ্ধা ত কিছুতেই দিতে সম্মত হয় না, কিন্তু শেষে অগত্যা বার্ণিশ করিবার তুলি তাহাদিগের হাতে দিল। তুলি পাইয়া রেলিং বার্ণিস করা দূরে থাক্, তাহারা সেই বৃদ্ধার মুখ রং করিয়া দিয়া দৌড়িয়া পলাইল। মহারাণী এই কথা শুনিবামাত্র দুইজনকে ধরিয়া সেই বৃদ্ধার কাছে লইয়া গেলেন, এবং তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতে বলিলেন, তারপর বাজার হইতে সেই বৃদ্ধার জন্য তাহাদিগের দ্বারা কাপড় ক্রয় করাইয়া আনাইলেন; কারণ তাহারা বৃদ্ধার কাপড়ও নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই কাপড়ের দাম মেয়েদের নিজের টাকা হইতে দিতে হইল। দুঃখী দরিদ্র সকলের প্রতিই মহারাণীর সমান ব্যবহার। যখনই কোন অগ্নিদাহ প্রভৃতি কোন প্রকার দুর্ঘটনা হয়, মহারাণী তৎক্ষণাৎ যথা

সাধ্য গরিব দুঃখীদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে নিজে সান্ত্বনা দিয়া পত্র লেখেন।

একবার লণ্ডন হাঁস্‌পাতালের একটী ছোট বালিকা তাঁহাকে দেখিতে চায়; সে বলে যে, "যদি আমি একবার মহারাণীকে দেখিতে পাই তাহা হইলে আমার সকল ব্যারামের কষ্ট দূর হইবে।" হাঁস্‌পাতালের অধ্যক্ষ এই কথা মহারাণীকে জানাইবামাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ হাঁস্‌পাতালে উপস্থিত হন, এবং সেই বালিকাটীর কাছে যাইয়া তাহাকে কত স্নেহের কথায় সান্ত্বনা দেন। এই সকল ঘটনায় বেশ বুঝা যায় যে, মহারাণীর প্রকৃতি কত সদ্‌গুণে ভূষিত। তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রকার আরও অনেক গল্প আছে; সময় হইলে পরে বলা যাইতে পারে। আমরা আশা করি মাহারাণী রাজবংশে জন্মিয়া, এত বড় রাজ্যের রাণী হইয়া দয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়, সততা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণে তাঁহার প্রজাগণের এত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেছেন, আমাদিগের পাঠিকারাও সেই সকল গুণে ভূষিতা হইতে যত্নবতী হইবেন।

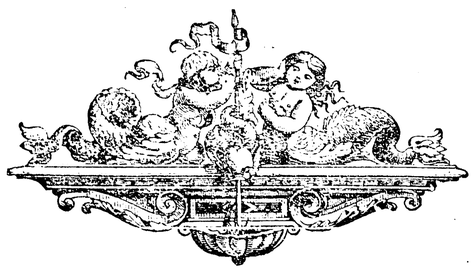

পার্লিয়ামেণ্ট সভা।

ঠিক পাঠিকাগণ! গতবারে তোমাদিগকে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত পার্লিয়ামেণ্ট সভার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে।

এই যে প্রকাণ্ড ছবিটী দেখিতেছ, এইটী পার্লিয়ামেণ্ট গৃহের ছবি। দেখ দেখি ইহার ছাদের উপরে কেমন বড় বড় চূড়া! মহারাণীর রাজবাড়ী হইতে এই পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ অতি অল্প দূর টেমস্ নদীর তীরে অবস্থিত। এই পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ এত বড় যে প্রায় চব্বিশ বিঘা জমি ব্যাপিয়া ইহা দাঁড়াইয়া আছে। এই বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিতে সাড়ে তিন কোটী টাকা খরচ হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টের ঘরের বিষয়ে যাহা হউক দুই এক কথা তোমরা শুনিলে, এখন এই ঘরে বসিয়া কি কাণ্ড কারখানাটা হয়, তাহাই তোমাদিগকে বলিবার ইচ্ছা আছে।

বৎসরের মধ্যে প্রায় ৭ মাস কাল পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিবেশন হয়। অধুনা ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি শেষ হইয়া থাকে। কোন কার্য্যের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনের প্রয়োজন হইলে রাজা বা রাণীকে ১৪ দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। তোমাদের হয়ত স্মরণ আছে যে, এই সভা দুই ভাগে বিভক্ত এবং তাহার এক ভাগের নাম সম্ভ্রান্তদের সভা, অপর ভাগের নাম সাধারণদের সভা। সম্ভ্রান্তদের সভার সভ্যগণ খুব উঁচু বংশের লোক। প্রাচীন কালে প্রায় রাজার ইচ্ছায়ই সম্পূর্ণরূপে সভার

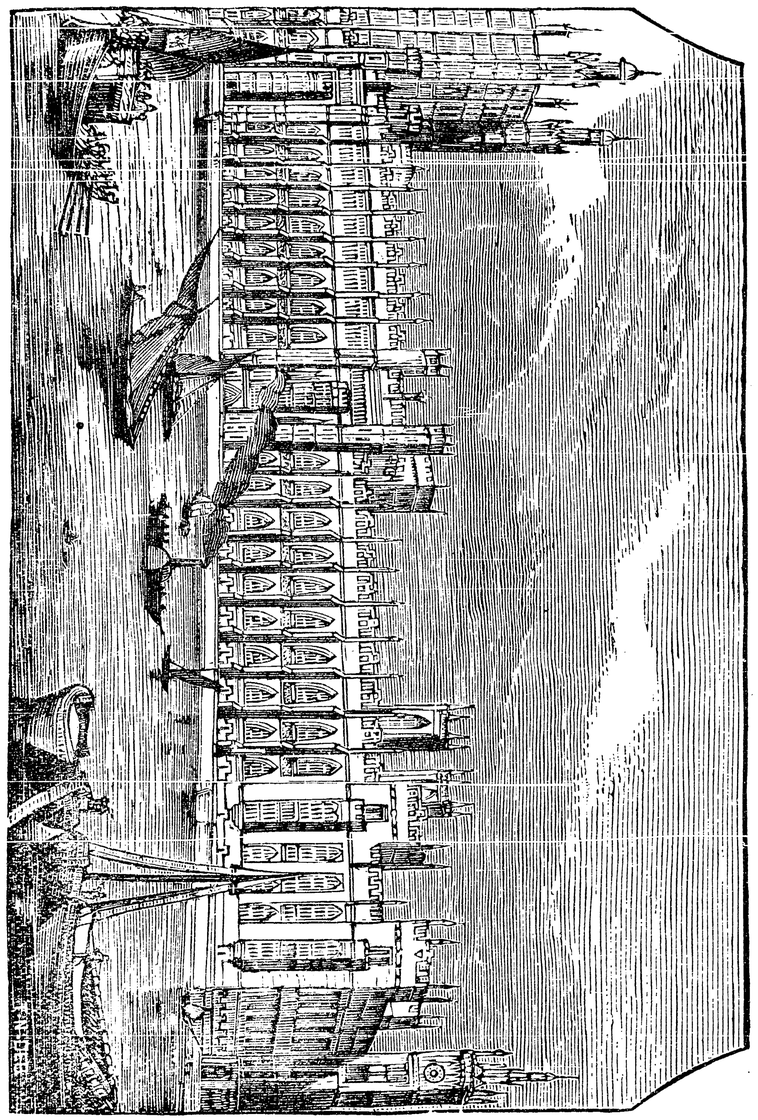

সভ্যগণ নিযুক্ত হইত। রাজা সম্ভ্রান্ত পরিবারের যাহাকে ইচ্ছা লর্ড সভায় গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু এখন আর সেরূপ হইবার নিয়ম নাই। যাঁহার পিতা লর্ড সভার সভ্য থাকেন তিনি পিতার মৃত্যুর পরে উপযুক্ত হইলে লর্ড সভার সভ্য হইবার অধিকার পাইতে পারেন। রাজার আজ্ঞানুসারে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদিগের মধ্য হইতেও দুই এক জনকে কখন কখন লর্ডসভার সভ্যের পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। লর্ডসভার সভ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই, রাজার

ইচ্ছানুসারে নূতন পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ড দেশ হইতে ইংলণ্ডের এই মহাসভায় প্রতিনিধি আসিয়া থাকে, এই সকল প্রতিনিধিগণ ও লর্ডসভার সভ্যগণের সমস্ত অধিকার পাইয়া থাকেন।

সাধারণের সভা এক কথায় বলিতে গেলে ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণ লোকের সভা। কিন্তু কি প্রণালীতে এই সভার সভ্যগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং কি উদ্দেশ্যে এবং কাহারাই বা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন তাহাই এখন তোমাদিগকে বলিতেছি। ইংলণ্ডে যে কোন ব্যক্তি অন্ততঃ বার্ষিক দশ পাউণ্ড আয় হয় এমন এক খণ্ড জমি ভোগ দখল করিয়া থাকেন, তিনি সাধারণ সভার সভ্য মনোনীত করিবার পক্ষে সম্মতি দিতে পারেন। আবার যিনি কোন ব্যক্তির চাকুরী বা কোন রাজকার্য্যোপলক্ষে কোন একটা বাস স্থানের সম্পূর্ণ কর্ত্তা হইয়া বাস করিতে থাকেন, তিনিও সভ্য নির্ব্বাচন উপলক্ষে আপনার মত দিতে পারেন। এই সকল লোকেরাই গ্রাম, নগর, ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি দেশীয় নানা স্থান হইতে দুই এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান এবং এই প্রতিনিধিগণই সাধারণদের সভা গঠন করিয়া লন। প্রাচীন কালে এই সকল প্রতিনিধিগণ যে গ্রাম বা নগর হইতে প্রেরিত হইতেন সেই গ্রাম বা নগরের লোকদিগের নিকট হইতে বেতন স্বরূপ টাকা লইতেন এবং সেই জন্য অনেক ভাল ভাল গ্রাম ও নগরের লোকেরা দারিদ্র্য বশতঃ প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত না। এখন আর প্রতিনিধিগণ টাকা লইতে পারেন না, সুতরাং সকল গ্রাম ও নগরের লোকেরাই লোক সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাইবার সুবিধা পাইয়াছেন।

মহারাণীই পার্লিয়ামেণ্ট সভার প্রধান অধ্যক্ষ; রাজ কার্য্যও তাঁহার নামে চলে, এবং তাঁহার উপরেই রাজ্যের সমস্ত ভার ন্যস্ত। কিন্তু কাজে তাহা নয়। সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একটী মন্ত্রী-সভা আছে, তাহাকে ক্যাবিনেট বলে। এই ক্যাবিনেটের সভ্যগণ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণের দ্বারা বিশেষতঃ কমন্স্, অর্থাৎ সাধারণদের সভার লোকদিগের দ্বারাই নিয়োজিত হইয়া থাকেন। "ধনাগারের প্রথম লর্ড" এই সর্ব্বোচ্চ পদ মন্ত্রী-সভার প্রধান মন্ত্রীকেই দেওয়া হইয়া থাকে। তোমরা হয়ত সুবিখ্যাত গ্লাডষ্টোন সাহেবের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি এক সময়ে এই প্রধান পদে নিযুক্ত থাকিয়া মহারাণীকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছেন ও সাহায্য করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর নীচে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ টী পদ আছে। এই ১৪ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন অধ্যক্ষ আছেন; তাঁহাকে ভারতের ষ্টেট-সেক্রেটরী বলে, তিনি বড় লাট বাহাদুরেরও উপরের কর্ম্মচারী।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশনের সময়ে সভ্য ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্ট গৃহে প্রবেশ করা বড় সহজ নহে, কোন সভ্যের অনুমতি না লইয়া ত যাওয়াই যায় না, তার পর আবার অনুমতি পাইলেও বসিবার স্থান পাওয়া যায় না। লর্ড-সভার সভ্যগণের জন্য পৃথক স্থান, কমন্স্-সভার সভ্যগণের জন্য পৃথক স্থান, মন্ত্রী-সভার সভ্যগণের জন্য স্বতন্ত্র স্থান, দর্শকগণের জন্যও একটী বসিবার স্থান আছে বটে কিন্তু সে স্থানটী এত অপ্রশস্ত যে অনেকের ভাগ্যেই সেস্থানে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। পার্লিয়ামেণ্টে অনেক কাণ্ড কারখানা হয়; সে সকল কথা

তোমরা এখন বুঝিবে না এই পর্য্যন্ত শুনিয়া রাখ যে, আমাদের দেশে যখন পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় দেশীয় লোকের একটী রাজ-সভা হইবে তখন আমাদের দেশের অনেক কল্যাণ সাধন হইবে; পাঠক পাঠিকাগণ তোমরা যদি এই বাল্য কাল হইতেই ভাল হইবার চেষ্টা কর তবে দেশের অবস্থা ফিরিবে এরূপ আশা করিতে পারা যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সখার পাঠক পাঠিকা! এই মহাত্মার জীবনের অনেক কথা তোমরা গতবারে শুনিয়াছ, কিন্তু অনেক কথা এখনও বলিতে বাকি আছে, সে সমুদায় আজ বলিয়া উঠিতে পারা যাইবে না। তাহার অনেক বিষয় আবার একবার অনুসন্ধান দ্বারা জানা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কিছুদিন হইতে ভক্তিভাজন মহর্ষি মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত রহিয়াছেন। তাঁহার শরীর দিন দিন রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমরা যে গিয়া তাঁহার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিব তাহারও যো নাই। তোমরা সকলে প্রার্থনা কর যে, তিনি ত্বরায় আরোগ্য লাভ করুন। তিনি যতদিন এ দেহে থাকেন, ততদিনই দেশের লাভ।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধের সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যেরূপ ধর্ম্ম-বীরের কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সমধিক উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তোমরা সকলেই বোধ হয় বেদের নাম শুনিয়াছ। হিন্দুমাত্রেই বেদ-গ্রন্থের আদর করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে এই বিশ্বাস ছিল, এবং এখনও অনেকে সেরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, বেদ—মনুষ্যের রচিত নয়, তাহা সাক্ষাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। এই বেদের বিষয় তোমাদিগকে কিছু বলা আবশ্যক। অতি প্রাচীন কালে যখন বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই, এবং লিখিবার রীতি প্রচলিত হয় নাই, তখন বড় বড় ঋষিরা মুখে মুখে অনেক স্তুতি ও বন্দনা রচনা করিতেন। এই সকল স্তুতি ও বন্দনা অপর লোকে মুখে মুখে শিক্ষা করিত, ও মুখে মুখে শিখাইত। এইরূপ অনেক শত বৎসর মুখে মুখে চলিয়া আসার পর যখন বর্ণমালার সৃষ্টি হইল, তখন মধ্যে মধ্যে এক একজন পণ্ডিত সেই সমুদায় মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের আকারে বদ্ধ করেন। এইরূপে বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়;—ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ব। এই সকল বেদের মধ্যে অনেক ধর্ম্মোপদেশ আছে। প্রাচীন কালের হিন্দুরা বলিতেন যে, বেদ অভ্রান্ত, অর্থাৎ তাহা ঈশ্বর-প্রণীত এবং তাহাতে ভ্রম নাই। ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথমে স্থাপিত হয়, তখন প্রথম প্রথম বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ সমাজের বেদী হইতে বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের ভারগ্রহণ করার কয়েক বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল যে, বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থ বলা যায় কি না? শুনিতে পাওয়া যায় তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক সুবিখ্যাত অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদা তর্ক বিতর্ক হইত। অন্য লোক হইলে তাঁহার মনের তর্ক দুই দিন পরে মনে মিলাইয়া যাইত; আবার তিনি সংসারের অপর কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। কিন্তু এই মহাত্মা স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত; সুতরাং তিনি এ বিষয়ের সবিশেষ অনু-সন্ধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি চারিজন বুদ্ধিমান যুবক বাছিয়া চারি বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীতে পাঠাইলেন। তাঁহারা মনোযোগ সহকারে সেখানে থাকিয়া বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন, কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং কাশীতে গমন করিলেন। তখন কাশীতে যাওয়া সহজ ছিল না; এখনকার মত রেলওয়ে ছিল না; যাইতে হইলে হয় নৌকা-যোগে, না হয় পদব্রজে, না হয় পাল্কী করিয়া বহুদিনে পৌঁছিতে হইত। আবার পথে চোর ডাকাতের ভয় ছিল। লোক সুখে যাইতে পারিত না। দেবেন্দ্রনাথ ইহার কিছুতেই ভয় পাইলেন না। তিনি অনেক পথশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া কাশীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া পরমা-নন্দে তাঁহাদিগের সহিত শাস্ত্রালাপে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বহু অন্বেষণ ও পাঠের পর তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, বেদ মনুষ্যের রচিত, সুতরাং অভ্রান্ত নহে; তাহাকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেই মাত্র তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া মানা যাইতে পারে না, অমনি তিনি সে মত পরিত্যাগ করিলেন। ইহা কত বড় সত্য-প্রিয়তার ও বীরত্বের কথা তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। যে বেদ এতদিন ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিস্বরূপ ছিল, এবং যাহার প্রতি দেশ শুদ্ধ লোকের এত আদর, তাহাকে পরিত্যাগ করা কত বড় সাহসের কর্ম্ম। সত্যের প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ না থাকিলে তিনি কখনই সে সাহস পাইতেন না। আরও আশ্চর্য্য দেখ, বেদ অভ্রান্ত এই মত তিনি পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু বেদের সদুপদেশ সকলের প্রতি ও আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র সকলের প্রতি তাঁহার যে গভীর শ্রদ্ধাছিল তাহার বিন্দুমাত্র ও হ্রাস হইল না। তিনি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল হইতে ভাল ভাল উপদেশ সংগ্রহ করিয়া "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করি-লেন। এই গ্রন্থখানি তোমরা অনেকে দেখ নাই। এমন অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে আর নাই বলিলে হয়। এখানি ঐ মহাত্মার এক প্রধান কীর্ত্তি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মলিন হইয়া রহিয়াছে, এই জন্য এই গ্রন্থের মূল্য এখনও লোকে বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু কালে ইহার মূল্য লোকে জানিতে পারিবে।

মহর্ষি মহাশয় এক দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের লোকের ধর্ম্মোন্নতির প্রধান একটী উপায় করিলেন, অন্যদিকে উৎসাহের সহিত দেশমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগি-লেন। নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল, তিনি স্বয়ং নানা স্থানে গিয়া তাহা-দিগকে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। কেবল

মুখের উৎসাহ নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রতি বৎসর হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। এখন তিনি বার্দ্ধক্য ও শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আর নিজে কোন স্থানে যাইতে পারেন না, কিন্তু এখনও তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির যখন নির্ম্মাণ হয় তখন তিনি ঐ কার্য্যের সাহায্যের জন্য ৭০০০৲ সাত হাজার টাকা দিয়াছিলেন, এইরূপ কত সমাজে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য একটী সামান্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইহার নাম এখন আদি ব্রাহ্মসমাজ। মহর্ষি মহাশয় নিজ ব্যয়ে ঐ বাড়ীর উপর ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চালাইবার জন্য মাসে মাসে ৪।৫ শত টাকার ও অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের যোগ দেওয়া অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে ব্যয় করিয়াছেন তাহা একত্র করিলে অনেক লক্ষ টাকা হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ যে, ইহার জন্য তিনি কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া গণ্য করেন নাই। তাঁহার পিতা কলিকাতায় বড়লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, রাজাদিগের নিকট সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি যদি মনে করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পিতার ন্যায় রাজ-সম্ভ্রম লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু সে দিকে তাহার মন ছিল না। যে পথে গেলে রাজাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তিনি সে পথে চলিতেন না। বড় বড় পদস্থ ইংরাজেরা সাধ্য সাধনা করিয়াও তাঁহাকে পাইত না, কিন্তু একটী সামান্য লোকও ঈশ্বরোপাসনা করিবার জন্য ধরিলে তাহার ভবনে গিয়া উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন।

এইরূপে কায় মন প্রাণে বহু বৎসর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করার পর, ১৮৫৬ কি ১৮৫৭ সালে তিনি কিছুকাল তপস্যায় যাপন করিবার জন্য হিমালয় শৃঙ্গে গমন করিলেন। এই সময়ে তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করেন। সেখানে দুই একটী ভৃত্য মাত্র সঙ্গে করিয়া একাকী কেবল ভজন সাধন ও আত্ম-চিন্তাতে যাপন করিতেন। এই সময়ের মধ্যে একদিকে যেমন জ্ঞানের উন্নতি অন্য দিকে তেমনি ধর্ম্মভাবের গভীরতা বৃদ্ধি হইল। তিনি যে ধ্যানপরায়ণতার জন্য চির-দিন প্রসিদ্ধ সেই ধ্যানপরায়ণতা এই সময়ে বিশেষরূপে বিকসিত হয়। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, এক একদিন ধ্যানে বসিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়াছেন; আহার নিদ্রা মনেই থাকিত না, ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকি-তেন। তাহার পরেও তাঁহার ধ্যানপরায়ণতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। অনেকবার এরূপ দেখা গিয়াছে যে, ঈশ্বর-চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে তিনি বাহ্য জ্ঞানশূন্য। নয়ন মুদ্রিত করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি এমন উজ্জ্বল বিশ্বাস ও প্রেম আমরা আর কখনও দেখি নাই। উপনিষদের যে সকল বচনে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশিত আছে তাহার কোন বচন কেহ উচ্চারণ করিলে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে।

দুই বৎসর হিমালয়ে বাস করিবার পর তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পথেই বা কত কষ্ট। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বেই

সিপাইগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। ইংরাজগণ অনেক কষ্টে সেই বিদ্রোহ শান্ত করিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় কোন কোন স্থানে তাহার বন্দি দশায় পড়িবার আশঙ্কা হইয়াছিল। যাহা হউক অনেক কষ্টে ও অনেক ব্যয়ে তিনি দেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়া আবার উৎসাহের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। দুই বৎসর কঠিন ভজন সাধন দ্বারা যে সকল অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন তাহা ব্রাহ্মদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার যে কিরূপ জলন্ত জীবন্ত ভাব ছিল তাহার বর্ণনা হয় না। তাহা এক দিন শুনিলে দশদিন মন এক নূতন ভাবে থাকিত। তিনি যেমন বলিয়া যাইতেন অমনি সেই সকল উপদেশ লিখিয়া লওয়া হইত। সেই সকল উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখান নামে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। এই গ্রন্থ যে কি গভীর জ্ঞানে পূর্ণ তাহার বর্ণনা হয় না। তোমরা বড় হইলে তাহা পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে। ইহাও তাঁহার এক প্রধান কীর্ত্তি। এই সময় হইতে সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। কেশব বাবুকে দক্ষিণ হস্তের ন্যায় পাইয়া তাঁহার উৎসাহ দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। কেশব বাবুর সাহায্যে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় নামে যুবকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য একটী সাপ্তাহিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে কেশব বাবু ইংরাজীতে এবং তিনি বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করিতেন। দেখিতে দেখিতে দলে দলে শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল, অনেকে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইল। কেশব বাবু কলিকাতা কলেজ নামে একটী স্কুল স্থাপন করিলেন, তাহাতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন এবং ব্রাহ্মদিগের নিমিত্ত একখানি অনুষ্ঠান পদ্ধতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। তাহা তাহার আর একটী কীর্ত্তি। চারিদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল।

ইহার কিছুদিন পরে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হওয়াথ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যদল সমভিব্যাহারে আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ইহার সবিশেষ বিবরণ বলিবার প্রয়োজন নাই। এই বিবাদের অল্পকাল পরেই মহর্ষি মহাশয় স্বীয় উপযুক্ত পুত্রদিগের উপরে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার অর্পণ করিয়া চিরদিনের মত অবসর গ্রহণ করিলেন। তদবধি তিনি নির্জ্জনে বাস করিয়া আসিতেছেন। ধ্যান্ ধারণা পাঠ ও আত্মচিন্তা ভিন্ন অন্য কার্য্য নাই। ইহাতেই তাঁহার আনন্দ। এবিষয়েও তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের শিষ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে এই আদেশ আছে যে, পঞ্চাশ বৎসরের পরে বনে যাইবে, তিনি তাহাই করিয়াছেন।

কেগো ওই বৃদ্ধা নারী!

কেগো ওই বৃদ্ধা নারী পথ দিয়া যায়!
ছিন্নবস্ত্র, পক্ককেশ, করে যষ্টি ধরি,
লোল চর্ম্ম, দৃষ্টি ক্ষীণ, কাঁপে দেহ, হায়!
প্রতি পদ যেতে তাঁর, থর থর করি।

পেছল হয়েছে পথ ঘন বৃষ্টিপাতে
এ ঘোর সময়ে বৃদ্ধা কেন পথ মাঝে?
জলেতে ভিজিছে দেহ ছাতা নাই হাতে,—
প্রাচীন বয়সে, হায়! এ কষ্ট কি সাজে?

দেখিয়া নারীর দশা সুমতি বালক
ছাতা লয়ে দ্রুতগতি ছুটি কাছে গেল,
ছাতা দিয়ে, হয়ে তার পথ-প্রদর্শক,
বৃদ্ধারে গৃহের দিকে লইয়া চলিল।

নিজের লাগিছে বৃষ্টি, তাতে দৃষ্টি নাই—
"এ হেন বৃদ্ধার যেন ক্লেশ নাহি হয়!"
এই মনে সে বালক ভাবিছে সদাই;
জলে ভিজে তাই ওই প্রফুল্লতাময়।

সহায় করিল নারী বালকের কাঁধ,
বালকে সহায় করি স্বগৃহেতে গেল;
বৃদ্ধার আত্মীয়গণ হাতে পে'ল চাঁদ
অপার সুখেতে সবে ভাসিতে লাগিল।

কাজ শেষ করি সেই বালক সুজন
আপনার বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আইল;
আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তখন,
অতঃপর সমপাঠী সকলে কহিল;—

"না জানি কাহার মাতা—এ ঘোর সময়
"প্রাণের তনয় আহা! কাছে নাই তাঁর,—
"এমন সময়ে এই বিপত্তি উদয়—
"থাকিত সন্তান যদি হ'ত উপকার।

"মা আমার যদি হেন বিপদ মাঝারে
"পড়েন, সন্তান তাঁর যবে দূর দেশে,
"সে সময় যদি কেহ না দেখে তাঁহারে
"বল, বন্ধুগণ! মন দহে কিনা ক্লেশে?

"আমার প্রাচীনা মার দুঃখ যদি হেন
"দূর দেশে থেকে মোর প্রাণাকুল করে,
"অভাগিনী মাতা ওই—বল তবে কেন
"সন্তানের মত নহি সেবিব উহারে।"

বলিতে বলিতে চক্ষু জলেতে পূরিল—
দূরদেশে মাতা তাঁর তাই খেদ মনে;
সন্তানের কার্য্য শিশু অপরে করিল,
'কাহারো জননী বৃদ্ধা' এই মনে জেনে।

বৃদ্ধা নারী গৃহে গেল, বাঁচিল পরাণে—
নতজানু, দয়াময়ে ডাকে প্রাণ খুলে—
"এমন সন্তান যাঁর তাঁকে, এই জনে,
"দয়াময় দীনবন্ধু রেখো পদতলে।"

স্বর্গীয় প্রমদা চরণ সেন।

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

পরোপকার।

অন্য ব্যক্তিকে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া যে সাহায্য বা উপকার করা হয় তাহাকেই পরোপকার বলিয়া থাকি। বাস্তবিক মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরোপকারের ন্যায় ধর্ম্ম জগতে অতি বিরল। জীবমাত্রেরই সুখ দুঃখ সমান। সকলেই সুখাবস্থায় সুখী এবং দুঃখাবস্থায় কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। এই দুঃখাবস্থায় তাহাদের দুঃখমোচন করিলে তাহারা নিশ্চয়ই বেশ সুখী হয় এবং উদ্ধার বা মোচনকারীকে অন্তরের সহিত ভালবাসে।

যেমন আমি কোন কষ্টে পড়িলে দশ দিক অন্ধকার দেখি। মনে করুন আমি মাতৃ পিতৃ হীন, আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই। আমি দুটী খেতে পাই না। অন্নের চিন্তায় শরীর শুষ্ক হইতেছে. দুই চারি দিন আদপেই খেতে পাই নাই, এইরূপ অবস্থায় যদি কেহ আমাকে দুটী ভাত আনিয়া দেয়, তখন কি আমি সাতিশয় আনন্দিত হইয়াও সবিশেষ উপকৃত হইয়া আমার উপকারককে ধন্যবাদ দিব না? তখন কি আমার মনে তাহার আশীর্ব্বাদসূচক বাক্য আসিবে না?

এইরূপ সকলেরই আছে। আমি যেমন এইরূপ আনন্দিত হই, অন্যের কষ্টের অবস্থাতে সাহায্য করিলেও সেও নিশ্চয়ই এইরূপ আনন্দিত হইবে, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে ভালবাসিবে।

এটী নিঃসন্দেহেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, আমার মত সকলেরই সুখ দুঃখ বোধ আছে। সুতরাং আমি যেমন দুঃখে পড়িলে কষ্ট অনুভব

করি, এবং অপরের সাহায্য প্রাপ্তির জন্য উৎসুক হই অন্যান্য সকলেরও ঐরূপ অবস্থায় ঠিক ঐরূপ হইয়া থাকে। এবং আমি যেমন ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত হইলে বড়ই সুখীও আনন্দিত হইয়া থাকি এবং মুক্তকারীকে খুব ভালবাসি, অপরেও ঠিক সেইরূপই মনে করিবে। বিশেষতঃ পরের উপকার করিলে নিজের মনেও একটী আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়। এবং মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। সকলেরই পরের উপকার করিতে সাধ্য মত চেষ্টা পাওয়া উচিত। কাহাকেও কোনও বিষয়ে মনোকষ্ট না দিয়া সকলকেই সুখী করার চেষ্টা পাওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কোনও একটী বালক বন্ধুবান্ধব হীন এবং অতি দরিদ্র। তাহার মনে করুন পুস্তকাদি বিহনে পাঠ চলিতেছে না, এরূপ অবস্থায় আমার সাধ্যমত তাহাকে সাহায্য করা উচিত। যাহাতে তাহার পাঠ চলিতে পারে তাহা করা উচিত। তাহা হইলে সে অবশ্যই মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। এবং যদি আমি কোন বিপদে পড়ি তাহা হইলে সেও কৃতজ্ঞ অন্তরে আমাকে সাহায্য করিতে পারে।

এইরূপ বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, অন্নহীনকে অন্ন দান প্রভৃতি রূপে যাহার যে অভাব তাহা যে কেহ মনোযোগ সহকারে মোচন করে সকলেই তাহাকে ভাল বাসে; এবং ঈশ্বর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

এটী সর্ব্বক্ষণই মনে রাখা উচিত যে, পরম পিতা পরমেশ্বর সৎকর্ম্ম জন্য অর্থ দিয়াছেন। সুতরাং তাহার সদ্ব্যয় করিতে পারিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করা হয়। এবং তাহা হইলে ঈশ্বর তাহাকে ভাল বাসেন।

যে সকল লোক দরিদ্র দুঃখী, খাইতে পায় না, পরিতে পায় না, তাহাদিগকে দেওয়ার চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই। আমরা যে অর্থ মিঠাই খাইয়া বা অন্যান্য অসৎ উপায়ে ব্যয় করি, যদি তাহা না করিয়া দীন দুঃখীদিগের উপকারের জন্য রাখিয়া দিই তাহা হইলে কত দুঃখী ব্যক্তি সাহায্য পায়!

যাহা হউক যিনি যেরূপেই পারেন সাধ্যমত পরের উপকার করা উচিত। দীন দুঃখী দেখিলেই সাহায্য করা উচিত। আহা! তাহা হইলে কত দুঃখীজনই যেন উপকার পায়। কতজনই যেন সুখী হয়!

পৃথিবীতে এইরূপ কত দুঃখীজন যে সাহায্য অভাবে দুঃখে জীবনযাপন করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? আহা! যদি সকলে এইরূপে যথাসাধ্য সাহায্য করে, তাহা হইলে না জানি কতজনই যেন দুঃখযন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পায়! সকলেরই এবিষয়ে মনোযোগ দিয়া সাহায্য করা উচিত।

দেখুন, যত লোকে পরের উপকারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, উপকার করিয়াছেন তাঁহাদের যশ দেশ বিদেশে ঘোষিত হইতেছে। মহাত্মা সক্রেটীস কত কাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন তবুও তাঁহার নাম ঘোষিত হইতেছে। আর মহাত্মা পোলণ্ডবীরবর কসিয়স্কো এমন পরোপকারক ছিলেন যে, এমন কি ভ্রমণে বহির্গত হইবার সময়ও তিনি এক থলি টাকা লইয়া বহির্গত হইতেন এবং দরিদ্র দেখিবামাত্রই দান করিতেন। এমন দাতা কে?

আর ভগিনি ডোরা পরোপকারীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ইহার মত পরোপকারী প্রায়ই দেখা যায় না। যে রোগী রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, ভগিনী ডোরা তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছেন; ঔষধ দিতেছেন। যে ব্যক্তি

মদ, গাজা খাইয়া উচ্ছন্ন যাইতেছে ভগিনী ডোরা তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া সৎপথে আনিতেছেন। এইরূপ শত শত কার্য্য তাঁহার জীবনে বিদ্যমান। ইহাঁর সমস্ত জীবন এইকার্য্যে ব্যয় হইয়াছে। সকলেরই ইহাঁর পরোপকারীতা শিক্ষা করা উচিত।

আর অধিক কি, আমাদের মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ইনি দয়ার সাগর। ইহার মত পরোপকারক আর দেখা যায় না। দুঃখীকে বস্ত্র, অন্ন, টাকাকড়ি প্রভৃতি ইনি অকাতরে দান করিয়া থাকেন। ইহাঁর অনুগ্রহে আজ কত লোক দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা বলা যায় না। বাস্তবিক ইনিই ঈশ্বর দত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ইঁহার অমায়িকতা প্রভৃতির গল্প শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যদি ইনি শুনিলেন একজন দুঃখী অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, তখন তিনি যে অবস্থায়েই থাকুন না কেন,তাহাকে সাহায্য করিবেনই করিবেন। ইনি দুঃখীকে উপকার করিতে অণুমাত্রও কাতর নহেন। ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা তিনি ইঁহাকে দীর্ঘ জীবি করুন এবং সকল ব্যক্তির অন্তরে ইঁহার মত পরোপকারের বীজ নিহিত করেন।

যাহা হউক পরোপকার করা যে সর্ব্বতোভাবে উচিত, তাহাতে আর সংশয় নাই। এবং সকলেরই পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুকরণ পূর্ব্বক সাধ্যমত পরের উপকার করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপ।
বয়স ১৩ বৎসর।

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

গরিব দুঃখীদিগের প্রতি ব্যবহার।

যাহাদের বিদ্যা ও ধন কিছুই নাই তাহাদিগকে গরিব বলে। কোনও গরিব বাড়ীতে আসিলে তাহাকে তাহার যে বস্তুর অভাব থাকে তাহা তাহাকে প্রথমে দিবে এবং যাহাতে সে চিরজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

* * * * * * * *

তাহাকে যদি সকল ধন না দিয়াও বিদ্যাধন দেওয়া যায়, তাহা হইলেই উচিত কাজ করা হয়। কারণ তাহার যদি সকল ধন না থাকিয়াও বিদ্যা ধন থাকে তাহা হইলেই সে চিরকাল চলিতে পারে। যদি তুমি তাহাকে টাকা পয়সা দাও, কি ১ খানা কাপড় দাও তাহা হইলেও সে সন্তুষ্ট হইবে কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় হইবে না; কারণ তাহার ধন কয়েক মাসেই ফুরাইয়া যাইবে এবং কাপড়ও ২।৩ মাসের মধ্যেই ছিঁড়িয়া যাইবে। এই জন্য সে পূর্ব্বের ন্যায় ধন হারা হইয়া পড়িবে; তখন আবার পূর্ব্বের ন্যায় গরিব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। এই কারণেই তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ভাল। কোন এক জন গরিব আমার বাটীতে আসিল, আমি যদি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করি তবে সে সন্তুষ্ট হইবে; আর আমি যদি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার না করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিই, তাহা হইলে সে দুঃখিত অন্তরে চলিয়া যাইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, লোনসিংহ।
বয়স ৭ বৎসর।

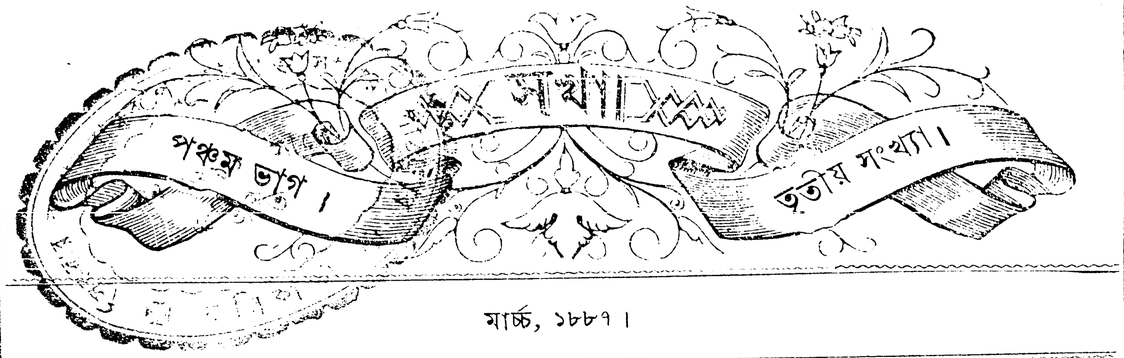

মার্চ্চ, ১৮৮৭।

মহাভারতের গল্প।

(পরোপকার।)

দেবলোকে মহা বিপদ উপস্থিত। বৃত্রাসুরের উৎপাতে দেবগণ মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মহা তেজস্বী দুর্জ্জয় বৃত্রাসুর অগণ্য দৈত্য সেনা লইয়া দেবলোকে নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। দেবতাগণের ধর্ম্ম কর্ম্মে নানাপ্রকার বিঘ্ন জন্মাইতেছে; দেবলোকের শান্তি নষ্ট করিতেছে। দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। দেবতাগণও দেবলোক ছাড়িয়া তাঁহার সহিত পলায়ন করিয়াছেন। কি উপায়ে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন সেই চিন্তা করিতে করিতে দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন "মানুষের হাতে বৃত্রাসুরের মৃত্যু নাই; অতএব তোমরা নারায়ণের নিকট যাও, তিনি ইহার উপায় করিবেন।" দেবগণ নারায়ণের নিকট যাইয়া বৃত্রাসুরের উৎপাতের কথা বলিলেন। নারায়ণ বলিলেন "বৃত্রাসুর আমার পরম ভক্ত, আমি তাহাকে বধ করিতে পারিব না। তোমরা দধীচি মুনির নিকট যাও। তিনি পরম দয়ালু এবং পরোপকারই তাঁহার জীবনের ব্রত। তাঁহার নিকট এই মহা বিপদের কথা বলিয়া, তাঁহার অস্থি ভিক্ষা চাও। তিনি কৃপা করিয়া অস্থি দিলে, সেই অস্থি বিশ্বকর্ম্মার নিকট লইয়া যাও। বিশ্বকর্ম্মা তাহাদ্বারা বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন; সেই বজ্রে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হইবে।" তখন দেবগণ ইন্দ্রের সহিত দধীচি মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বৃত্রাসুরের অত্যাচারের কথা বলিলেন। এবং সেই অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরোপকারব্রত দধীচি সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন;—"দেবরাজ আমার কি সৌভাগ্য! আজ আমার জীবন সার্থক হইল। আমার এই জীর্ণ অস্থি—দুই দিন পরে ধূলায় মিশাইত, আজ তাহা দেবতাগণের উপকারে লাগিবে, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য আছে! পরোপকারের জন্য যাহার জীবন যায় তাহারই সার্থক জীবন; আমার একটি জীবন দিলে যদি এতগুলি জীবন রক্ষা হয়, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি তাহার জন্য প্রস্তুত আছি।" শিষ্যগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন তিনি শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা কেন অশ্রুপাত করিতেছ! এ আমার পরম সৌভাগ্য; পরের হিতের জন্য এ সংসারে কয় জনে প্রাণ দিতে

পারে? আজ আমি পরোপকারের জন্য প্রাণ দিতে পারিতেছি, ইহাতে তোমরা আনন্দ কর। পরহিত করিতে প্রাণে কেন কষ্ট হইবে! ধূলার শরীর দুদিন পরে ধূলাতে মিশাইবে, পরহিতে যদি ইহা না লাগিল, তবে এই শরীর লইয়া কি করিব? মানুষ হইয়া যদি মানুষের উপকারে না আসিলাম, তবে এ জীবন লইয়া কি করিব? মানুষ মানুষের উপকার করিবে, মানুষের দুঃখ কষ্ট মানুষ দূর করিবে, এই জন্যই মানুষের জন্ম। যে তাহা পারিল না;—যে দুঃখীর দুঃখ দূর করিল না, বিপন্নকে আশ্রয় দিল না;—দরিদ্রকে সহায়তা করিল না,—ক্ষুধিতের মুখে একগ্রাস অন্ন তুলিয়া দিল না—বস্ত্রহীনকে একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্রও দিল না, তাহার মনুষ্য জন্মই বৃথা। অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য, অন্যের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য, সমস্তই দিতে হইবে; পরের হিতের জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইবে। ইহা যিনি পারেন, তাঁহারই মনুষ্য জন্ম সার্থক।"

এই বলিয়া মুনি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং উত্তরীয় ধারণ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। শিষ্যগণ বেদগান করিতে লাগিল এবং মধুর হরিসংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। দধীচির নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল, নাসিকা নিশ্বাস শূন্য হইল, শরীর নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইল; অকস্মাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল। দধীচি মুনি পরোপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন,—স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তখন ইন্দ্র দধীচির অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাহাদ্বারা এক অপূর্ব্ব বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন। সেই মহা বলশালী বজ্রে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হইল, ইন্দ্র পুনরায় রাজত্ব পাইলেন। দেবলোক নিরাপদ হইল। আবার দেবলোকে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। মহাভারতের এই গল্পটীর উপদেশ আমাদিগের হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখা উচিত। পরের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করা অপেক্ষা মানুষের জীবনের আর অধিক সুখ—অধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে? মৃত্যুর পর যে শরীর আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে, যদি তাহা পরের উপকারে লাগে, যদি একটি জীবন দিলে দশটী জীবন রক্ষা হয়, তবে কেন তাহা দিবে না? পরের দুঃখ দূর করা, পরের চক্ষের জল মুছাইয়া দেওয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেঁওয়া, ক্ষুধিতকে অন্ন দেওয়া—ইহারই জন্য মানুষের জন্ম। অন্যের উপকার করা, অন্যকে সুখী করাই মানুষের এক প্রধান কর্ত্তব্য। যদি তুমি তাহা না পারিলে, যদি অন্যের দুঃখ দূর করিতে না পারিলে, অন্যকে সুখী করিতে না পারিলে তবে তোমার জন্মই বৃথা। মহাভারতের এই গল্পটীতে আমরা শিখিতেছি যে, অন্য সকল দূরে থাক্, পরোপকারের জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইবে; আর শিখিতেছি যে, যাহার কোন শক্তি নাই, কোন সামর্থ্য নাই, সেও যদি পরের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তবে সে বজ্রের বল পায়। যাহার কোন শক্তি ছিল না, কোন সহায় ছিল না, পরোপকার করিতে গিয়া সে দেখিতে পায় যে, সে বজ্রের বল পাইয়াছে, পরের হিত সাধনের জন্য তাহার হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় বল, বজ্রের ন্যায় শক্তি উপস্থিত হইয়াছে। একটি কথা আছে—সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়। কথাটি বড় খাটি। তুমি সৎকার্য্য করিতে যাও, ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। তোমার যদি কোন সম্বল না থাকে, তথাপি দেখিতে পাইবে যে, তুমি যে সাধু কার্য্যে হাত দিয়াছ, শত সহস্র বিঘ্ন বাধা সত্বেও, তাহা হইয়া যাইতেছে। সাধু ইচ্ছা থাকা চাই। পরোপকার করিবার জন্য সংকল্প থাকা চাই। যদি আর কিছুও না পার, পরের দুঃখে একফোঁটা চক্ষের জল ফেলিও, সেই একফোঁটা চক্ষের জলের মূল্য লক্ষ টাকা।

পিপীলিকার উপদেশ।

আমি কাল ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখিলাম যে, একটা ফড়িং হইয়া গিয়াছি এবং এদিক ওদিক করিয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছি। বেড়াইতে বেড়াইতে এক পুকুরের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে খানে অল্প অল্প ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল, আর অমনি আমার সুমধুর ফড়িং কণ্ঠের গান ধরিয়া দিলাম। সে গানে মুগ্ধ হইয়া এক পিঁপড়ে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে অনেক ক্ষণ আলাপ করিয়া আমাদের দুজনার মধ্যে বেশ বন্ধুতা জন্মিয়া গেল। পিঁপড়ে তাহাদের বাড়ী যাইতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিল। তাহাদের বাড়ী পুকুরের ওপারে। পুকুর পার হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। দুজনার বুদ্ধি খাটাইয়া আমরা দুটা খড়ের ডাঁটার উপর একটা পাতা জড়াইয়া ভেলা তৈয়ার করিলাম। তার উপর দুজনা চড়িয়া একটা লম্বা খড় দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে চলিলাম। পুকুরে অনেক শেওলা, পানা, ঘাস জমিয়াছিল, তাহাতে আমাদের ভেলা বাধিয়া যাইতে লাগিল; অনেক কষ্টে সে গুলি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। পুকুরের মাঝখানে গিয়া দেখি জল হইতে বিড় বিড় করিয়া বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে। পিঁপড়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ও কি ভাই" সে বলিল "তাও জান না, ওখানে জলের ভিতর মাকড়সা ভুড় ভুড়ি তুল্‌ছে।" আমি আগে শুনিয়া ছিলাম যে "মাকড়সারা কেবল স্থলেই থাকে।" পিঁপড়ে বলিতে লাগিল "এরকমের মাকড়সারা জলের ভিতর থাকে আর জলের পোকা ধরিয়া খায়। সকলের রুচি ত আর সমান নয়, কেহ পাঁঠা খাইতে ভাল বাসে, কেহ আবার নিরামিষই খায়। ইহারা জলের পোকাই খাইতে ভাল বাসে তাই জলের ভিতর থাকে। জলের ভিতর থাকিয়াই নিশ্বাস টানে। জলের ভিতর গাছড়া থাকে, তাহাতে নিজের সুতা জড়ায় আর উল্টা ছোট ঘণ্টীর মত একটা বাসা সেই সুতা দিয়া তৈয়ার করে। বাসাটা প্রথমে জলে পূর্ণ থাকে, মাকড়সা জলের উপর উঠিয়া একগাল বাতাস টানিয়া লইয়া সেই বাসার তলে যাইয়া মুখের বাতাস ছাড়িয়া দেয়। বাতাস টুকু বাসার ভিতরে উপর দিকে থাকিয়া যায়। এইরূপ অনেকবার করিতে করিতে বাসাটা বায়ুতে পূর্ণ হইয়া যায় তখন মাকড়সা ইহার মধ্যে বাস করে ও স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস টানে। অনেক দিন পরে যখন ঘরের বাতাসটা খারাপ হইয়া যায় তখন মাকড়সা সেই বাসাটাকে কাত করিয়া ধরে আর ঘরের সব বাতাস বাহির হইয়া যায়। পুনরায় নূতন বায়ু আনিয়া বাসা পূর্ণ করে। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ রেসমের মত কোমল লোমে আবৃত, তাই জলে ইহাদের গাত্র ভিজিয়া যায় না।"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর আমাদের ভেলা পুকুরের ওধারে আসিয়া লাগিল। পিঁপড়ের হাত ধরিয়া তাহাকে ভেলা হইতে নামাইলাম। দুজনায় হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে লাগিলাম।

পথে কত নূতন নূতন জিনিস দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অনেক দূর গিয়া এক গর্ত্তের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গর্ত্তের ভিতরটী বেশ শীতল। পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাই অল্পক্ষণের জন্য দুজনায় ঘুমাইতে লাগিলাম। প্রথমে আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে এক বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় নাই তথাপি তিনি এমনি অশিষ্ট যে আমাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। একটী গাছে সূতা জড়ান জালের মত তাঁহার বাসা। দূর হইতে দেখিলাম কতকগুলি মাছির কঙ্কাল সেই বাসায় ঝুলিতেছে। আমি যাইতেছিলাম কিন্তু আমার পিপালিকা বন্ধু আমার কাণে কাণে বলিলেন "উহাকে বিশ্বাস করিওনা ও দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে, পক্ষীকে নিজের বাড়ীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহার প্রাণ বধ করে, উহার নাম মাকড়সা।" মাকড়সা আমায় জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাইতেছ?" আমি বলিলাম "পিঁপড়েদের বাড়ি" "তুমি কি পাগল হইয়াছ, প্রাণটা হারাবে না কি, যদি প্রাণের প্রতি কিছু মায়া থাকে তবে খবরদার পিঁপড়েদের বাড়ী যেও না। পিঁপড়েরা বড় দুষ্ট লোক, বড় রাগী, ওদের রাজ্যে সবাই সমান, রাজা টাজা নাই, মার্কিন দেশের মত সবাই রাজা।" আমি বলিলাম "আমার বন্ধু পিঁপড়া যে ওরকমের লোক তা আমার বিশ্বাস হয় না, তিনি বলিয়াছেন কোন ভয় নাই।" আমরা তথা হইতে চলিয়া গেলাম। পিঁপড়া মাকড়সার মুখে স্বজাতির নিন্দা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল "আপনি ওব্যাটাদের জানেন কি? আমি ওদের সব কুলের খবর জানি, আপনাকে সব বলিব।" আমরা পশ্চাতে তাকাইয়া দেখি মাকড়সা মুখটী চুন করিয়া নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া নিজের জালে গিয়া বসিয়া রহিল। মনে করিয়াছিল আমাদের ভুলাইয়া তাহার জালে লইয়া গিয়া আমাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত চুষিয়া উদর পূর্ণ করিবে। কিন্তু আমার বন্ধুর পরামর্শে আমি না গিয়া রক্ষা পাইয়াছি। মাকড়সার কুলের খবর আমার বন্ধুর নিকট যাহা শুনিলাম তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক, আমি আগামী বারে তাহা বলিব।

মজার পড়া।

ঘোড়ার মত দৌড়ে এত চল্‌বো না ক নেচে।
পা পিছ্‌লে প'ড়ে যাই ত নাক্‌টি যাবে ছেঁচে॥
আমার বড় মন্দ স্বভাব—কাঁটা খোঁচা দলি'।
যখন তখন, যেথা সেথা, বড়ই ছুটে চলি॥
সবাই করেন মানা, তবু শুনিনে ত কথা।
বুকে মুখে মাথায় ঠুকে তাই পাই সে ব্যথা॥
কষ্ট এত পেয়েও কি তাই মনে থাকে ছাই।
আড়াই পা না যেতে যেতে সকল ভুলে যাই॥
সিঁড়ির উপর হুড়্-হুড়্-হুড়্ সেই দণ্ডেই ছুটি।
পা পিছ্‌লে আবার পড়ি—আবার কেঁদে উঠি॥
মা ব'লেছেন তাই সে আমায়, কষ্ট পেয়ে বড়।
"মিছামিছি ছুট্‌তে গিয়ে এবার যদি পড়॥
'আহা' ব'লে তুল্‌ব না ত, নেবো না ত কোলে।
মুখ মুছিয়ে দেবো না ত মিষ্ট কথা ব'লে॥
খেলার সময় দৌড়ে খেল, বারণ তাতে নাই।
চল্‌তে গিয়ে পড়্‌বে ট'লে দেখ্‌তে নাহি চাই॥
বরং তুমি পড়্‌তে যদি ভাল বাস বড়।
বই নে এস, কাছে ব'স, 'দশ' 'রস' পড়॥
নূতন পড়া প'ড়্‌বে যদি,—মাসি মাকে ডেকে।
গড়্‌গড়িয়ে দেখাও প'ড়ে 'বড় গাছ'টা থেকে॥"

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

(মদ্য পানের অপকারিতা।)

সুরাপান যে সর্ব্বপ্রকারে দূষণীয়, তাহা সকল দেশে ও সকল উপদেশ-গ্রন্থে চিরকাল বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এমন কোন স্থান নাই যেখানে সম্মুখে বা পরোক্ষে, উক্ত সুরাসুর আধিপত্য না করিতেছে! সুরাপান করিলে মনুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পায়, তন্নিমিত্ত নানা প্রকার অসৎ কার্য্য করিতেও সুরাপায়ীরা কুণ্ঠিত হয় না। যে পর্য্যন্ত মদের নেশা বিদূরিত হইয়া না যায় ঐ পর্য্যন্ত, সুরাপায়ীগণ মনুষ্য লোক পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার পশুলোকে বিচরণ করে; এবং তজ্জন্যই তাহাদিগকে পাশব আচরণে লিপ্ত থাকিতে অধিকাংশ সময় দেখা যায়। আমরা স্মরণ শক্তির সাহায্যে এই সংসার মধ্যে নিয়ত নির্ব্বিঘ্ন ও অভ্রান্ত ভাবে কার্য্য করিয়া সংসার যাত্রা ও অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। মদ্যপান করিলে আমাদের সেই উপকারিণী স্মৃতি শক্তির অভাব ঘটে। সেই শক্তির হ্রাস প্রযুক্ত আমাদের অনেক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। মোহ, তন্দ্রা, প্রলাপ এই সকল সুরাপানের নিত্য সহচর, আমাদের কাম, ক্রোধ, রিপু সকলও সুরাপান করিলে বিশেষ প্রবল হইয়া, কুপথে মতি জন্মায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, তক, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণও সেই নেশার আবির্ভাবে স্ব স্ব কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া নানা প্রকার মারাত্মক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। আমাদের এমন কোন ইন্দ্রিয় ও

এমন কোন শক্তি নাই, সুরাপান করিলে যাহার বৈকল্য না ঘটে। ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ স্বচ্ছন্দে পৃথিবী মধ্যে অবস্থান করিবার নিমিত্ত যে সকল উপকরণ প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের বল, ও কার্য্য পটুতা জন্মে, তৎপ্রতি মনোযোগী থাকিয়া তাহা সম্পাদন করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কোন ক্রমে তাহার বিপরীতাচরণ করা উচিত নহে। করিলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার একান্ত সম্ভাবনা। কাজেই সুরাপান যে নিতান্ত দূষণীয় কাজ তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। যেহেতু সুরাপান করিলে সর্ব্বদা ঈশ্বরাজ্ঞা উল্লঙ্ঘিত হইয়া থাকে।

সুরাপানের আর একটী মহৎ দোষ এই যে, যে সকল দেশে ইহার আধিপত্য আছে শীঘ্রই ঐ সকল দেশ দরিদ্রতার চরম সীমায় উপনীত হয়। ঐ অসুর যাহাকে একবার স্বকীয় মোহ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, সে আর তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ঐ ব্যক্তি যাহা কিছু উপার্জ্জন করে সকলই সুরা দেবীর পূজার্থ ব্যয় হইয়া থাকে; তথাপি আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি না হওয়ায় প্রথমে ঋণ, ও তৎপরে চৌর্য্যাদি দুষ্ক্রিয়া দ্বারা, নরকের পথে অগ্রসর হয়।

সুরাপান করিয়া মোগল বংশের আদি সম্রাট বাবর যে প্রকার বিপদে পতিত হন, তাহা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। হিন্দুকুলগৌরব পৃথ্বিরাজের হস্ত হইতে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার সুরাপানই কি এক প্রধান কারণ নয়? যাহা হউক সে দূরের কথা, যে ক্রন্দনের রোল এখনও বঙ্গ হইতে বিদূরিত হয় নাই, সেই তিন কড়ির ফাঁসীর কারণ কি সুরাপান নয়? এই প্রকার কত কত বিপজ্জনক ও লোমহর্ষণ কাণ্ড যে সুরাপানের প্রসাদাৎ সম্পাদিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। অতএব দেখা যায় যে, সুরাপান নিসংশয়ে দূষণীয়। সুরাপান করিলে মনুষ্যের পরিপাক শক্তির হ্রাস ঘটে। তজ্জন্য শরীর অসুস্থ হইলে কাজেই অন্যান্য কার্য্যের অসুবিধা ঘটে। সুরাপান করিতে করিতে অনেককে ভবধাম পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব সুরাপানের অপকার যে হাতে হাতে ফলে তাহার সন্দেহ নাই।

যে সকল কারণে বিদ্যার্জ্জনের ব্যাঘাত জন্মে, সুরাপান তাহার অন্যতম। সুরাপানের এমনই অদ্ভুত শক্তি যে, সে উদ্যোগী পুরুষের উদ্যোগ, পরিশ্রমীর পরিশ্রম, সত্যভাষীর সত্য, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, ইহাদিগকে অনায়াসে বিনাশ করিয়া ফেলে। যে প্রকার রত্নাদি সংযোজিত বহুমূল্য বস্ত্রাদি অগ্নি সংযোগে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার সুরাপান দ্বারা উৎপাদিত নেশায়, মনের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, ইত্যাদি সমূলে বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নেশাতে ইন্দ্রিয়াদির বৈকল্য ঘটিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন বাগাদ্রিয় দ্বারা অভিমত বাক্য উচ্চারিত না হইয়া অস্পষ্ট পাশব ভাষার সৃষ্টি হয়। তাহার কোন প্রকার ভাবার্থ থাকে না। সেই প্রকারে হস্তাদি ও স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিচ্যুত হয়। নেশাকালে আত্ম বিস্মৃতি ঘটিয়া নেশাখোরের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তদ্বিষয় লেখা বাহুল্য।

শ্রীঅমৃতলাল নাথ, মূলপাড়া।

বয়স ১৯ বৎসর।

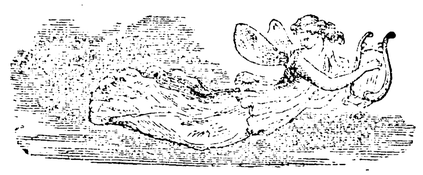

প্রভুর কাজ।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে কুকুর সেয়ানরামদাস বাগানে বেড়াইতেছে, এমন সময়ে বৃদ্ধ শৃগাল ধূর্ত্তকৃষ্ণ চতুরচূড়ামণি একটা আড়াল জায়গা হইতে বাহির হইয়া, অতি সাবধানে এ দিক ও দিক তাকাইতে লাগিল। তখন সেয়ানকে সম্মুখে দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি হে ভায়া, অনেক দিন পরে দেখা হইল, ভাল আছত?"

সেয়ান উত্তর করিল না; কারণ বৃদ্ধের সহিত তাহার কোন কালেও আলাপ বা সম্প্রীতি ছিল না। কোন কারণ বশতঃ সেয়ান অনেকবার ইহার খোঁজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা লৌকিকতা বা ভদ্রতার খাতিরে নহে। যেখানে হৃদয়ের সদ্ভাব নাই, সে খানে অসভ্য জানোয়ার কখনই মৌখিক বন্ধুত্ব প্রকাশ করে না।

শৃগাল উত্তর না পাইয়া বলিতে লাগিল; "তা তোমার বেশ চেহারা খুলিয়াছে, তা নাইবা হইবে কেন, কপাল গুণে অতি দয়ালু মনিব পাইয়াছ, সুখে স্বচ্ছন্দে আছ, ঈশ্বর করুন চিরকাল এমনই থাক। তা, বাটীর সর্ব্বত্র সর্ব্বথা কুশল ত?"

সেয়ান বিস্তৃত দন্তপাটী প্রকাশ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "বড় কুশল নহে; কি হইয়াছে তাহা বোধ হয় মহাশয়ের অবিদিত নাই।" এই বলিয়া কুকুর এক দৃষ্টে শৃগালের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন তাহার চক্ষু ধূর্ত্তের অন্তর পর্য্যন্ত দেখিয়া লইতেছিল। বৃদ্ধ নির্লজ্জ এবং মনোভাব গোপনে বিশেষ পটু হইলে ও তাহার মুখ ও কাণ দুটি লাল হইয়া উঠিল; তথাপি নিতান্ত ভদ্র লোকের ন্যায় বলিল, "আমিত কিছু জানি না। আমি বনচারী, গৃহস্থের ঘরের খবর আমার জানা কিরূপে সম্ভবে?"

সেয়ান দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি বলিতেছি। তিন দিন হইল ছোট দিদি মণির দুটা খরগোস হারাইয়াছে, আবার খোকা বাবুর সাদা হাঁস পাওয়া যাইতেছে না।"

"আ-হা-হা! আ-হা-হা! কি বলিলে? দুটা খর-গোস—খোকা বাবুর সা-দা হাঁ-স—হায়! হায়! হায়! আহা হা হা হা!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, দুই হাত তুলিয়া শুষ্ক চক্ষু মুছিতে মুছিতে চক্ষু দুটি একটু সজল ও আরক্ত হইয়া উঠিল। তখন বাম হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া, ডাইন হাত বুকের উপর রাখিয়া বলিতে লাগিল—"তুমি কিছু টের পাও নাই, কি করিয়াই বা পাইবে, তুমি কর্ত্তার ঘরে ঘুমাইয়া থাক। আর কি বলিব, বাছা, খরগোস ও হাঁস বড় নিমক হারাম জন্তু, পুষিতে নাই। জীব-বিজ্ঞান পড় নাই বুঝি? তাহাতে লেখা আছে খরগোস জাতির স্বভাবই এই যে রাত্রিকালে সুবিধা পাইলে উহারা বাহির হইয়া যায়, বড় একটা ঘরে ফেরে না। আর হাঁসের কথা কি বলিব? দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান উহাদের এক রোগ।"

সেয়ান বলিল, আমি জীব-বিজ্ঞান পড়ি নাই, কিন্তু এতটা বুঝিতে পারি যে, দেশ বিদেশে যাইতে হইলে, কেহ বাড়ীর কোনে ঠ্যাং ফেলিয়া যায় না। ঐত দুখানা হাঁসের ঠ্যাং পড়িয়া রহিয়াছে। মহাশয়ের অনেক বিদ্যা বুদ্ধি, ঠ্যাং

ফেলিয়া বেড়াইতে যাইবার কারণ অবশ্যই জানা আছে।”

সেয়ানের কণ্ঠস্বর, অধরের হাস্য এবং দন্তের আভা দেখিয়া, শৃগালের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, অতএব “আজ আসি, হাতে অনেক কাজ” এই বলিয়া তিনি মানে মানে বিদায় লইলেন। সেয়ান মনে মনে বলিল—“এই বুড়া-রই যত ডাকাতী। যাই, মা হারা হাঁসের ছানা গুলির কখন কি ঘটে জানি না। কুঁড়ে ঘর খানার বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাত্রে আর কর্ত্তার ঘরে শুইব না, ছানা গুলির কাছে বসিয়া থাকিব। কিন্তু কুঁড়ে ঘর খানা নিতান্তই স্যাঁত স্যেঁতে, চালে খড় নাই, ভিতরে ঠাণ্ডা বাতাস যায়, রাত্রে বড় শীত ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু কি করি, প্রভু আমাকে বাড়ীর প্রহরী করিয়াছেন, প্রভুর কাজ করিতেই হইবে, নহিলে অবিশ্বাসীর কাজ হয়। বিশ্বাসী ভৃত্য প্রভুর কাজ অবহেলা করে না। শারীরিক অসুবিধা ভোগ করিয়া যদি তাহার নিকট নিরপরাধী থাকিতে পারি তাহাই আমার লাভ, তাহাই আমার সুখ।”

এইরূপ ভাবিয়া সেয়ানরামদাস নিজের সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া যেখানে হাঁসের ছানাগুলি ছিল, সেই ক্ষুদ্র কুঁড়েতে আসিল। ছানাগুলি মার ডানার তলে নির্ভয়ে কেমন আরামে ঘুমাইয়া থাকিত, এখন তাহাদের দুঃখ ও ভাবনার সীমা নাই। সেয়ানকে দেখিয়া তাহারা আহ্লাদে চ্যাঁ চোঁ করিতে করিতে তাহার নিকটে আসিয়া তাহার গায়ে গা দিয়া ঘিরিয়া বসিল, কারণ জন্মিয়া অবধি তাহারা সেয়ানকে বন্ধু বলিয়া চিনিয়াছে। চতুষ্পদ রক্ষক সস্নেহে দ্বিপদ আশ্রিত দিগকে অভয় দিয়া, তাহাদের পার্শ্বে শুইয়া রহিল।

ক্রমে রাত্রি হইল, সেয়ানের চক্ষু ঘুমের ঘোরে ঢুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অসহায় ছানা-গুলির কথা ভাবিয়া তাহার ঘুমাইতে সাহস হইল না, কষ্টে চক্ষু খুলিয়া রহিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন, কে পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মত কুঁড়ের দিকে আসিতেছে। সেয়ান ধীরে আসিয়া বেড়ার ভাঙ্গা দিকে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন পায়ের শব্দ থামিয়া গেল। আবার একটু খট্ করিয়া শব্দ হইল। সেয়ানের চক্ষু নড়িতেছে না, নিশ্বাসটিও পড়িতেছে না। দুটা পা একটা লম্বা মাথা, ক্রমে সমস্তটা শরীর ঘরে প্রবেশ করিল। শৃগাল ভায়া পা বাড়াইয়া একটি হাঁসের ছানার দিকে যেই মাথা বাড়াইতেছেন অমনি খপ্ করিয়া কুকুর তাহার গলা কামড়াইয়া ধরিল। ধূর্ত্তকৃষ্ণের শরীর কুকুরের শরীরের প্রায় দেড়া, কিন্তু হইলে কি হইবে, শৃগাল-চন্দ্র যুদ্ধ সজ্জায় ছিলেন না, কুকুর তাহাকে বড় কায়দা করিয়া ধরিয়া ছিল; আর একটি কথা, ন্যায়ের পক্ষে যে যুদ্ধ করে সে দুর্ব্বল হইলে ও বলবান হয়, তাহার বল কিছুতেই টুটে না।

অনেক ক্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল। শব্দ শুনিয়া মালীর ঘুম ভাঙ্গিল, সে ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে অবাক্ হইয়া রহিল, পরে শৃগালের গলায় এক গাছা বড় দড়ি বাঁধিয়া কুকুরকে ছাড়াইয়া লইল। শৃগাল চন্দ্র সারারাত কয়েদ্ রহিলেন; সকাল বেলা বাড়ীর কর্ত্তার হুকুম মত তাহার যাহা হয় হইবে। সেয়ান তখন নিশ্চিন্ত মনে ছানা গুলির কাছে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার আর কোন ভাবনা নাই, সুতরাং ঘুমাইবার বাধা নাই। প্রভুর কাজ ভালরূপে সম্পন্ন করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রাণ ভরা আহ্লাদ। সমস্ত রাত কেবল সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছিল।

ফরাসী বালিকার স্বদেশানুরাগ।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী সম্রাট চতুর্থ চার্লসের মৃত্যু হয়। তখন তৃতীয় এড্ওয়ার্ড্ ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। এড্ওয়ার্ড্ পরলোকগত ফরাসীসম্রাটের ভগিনীপুত্র ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ফরাসী সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করেন। আমাদের দেশে যেমন পুত্র সন্তান না থাকিলে ভাগিনেয় বিষয়ের অধিকারী হয় ফরাসী দেশে সে নিয়ম ছিল না। সুতরাং এই বিষয় লইয়া ইংরাজরাজ এডওয়ার্ড এবং ফরাসীসম্রাট ফিলিপের সঙ্গে বিবাদের সূত্র পাত হয়। এই যুদ্ধ এক শত বৎসরের ও অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল। যাঁহারা প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করেন তাঁহাদের পৌত্র প্রপৌত্রেরা এই যুদ্ধের শেষ করিয়াছিলেন। এতদীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধের বিবরণ পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় নাই।

এই যুদ্ধে প্রথম প্রথম ইংরেজেরাই জয়লাভ করেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ফরাসী দেশের অনেক স্থান অধিকার করিয়া ফেলিলেন। ফরাসীরা দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিল; ইংরাজ সৈনিকেরা ফরাসীদিগকে বিড়াল কুকুরের ন্যায় মনে করিতেন; আজ কাল আমরা যেমন পদে পদে ইংরাজ কর্ত্তৃক অপমানিত হই সেই সময়ে ফরাসীদের ও এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। ফরাসীরমণী এবং বালক বালিকারা ইংরেজদিগকে সর্প কিংবা ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় করিত। বাস্তবিক তখন ফরাসীদিগের আশা যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল; আর যে ফরাসীরা স্বাধীন হইবে—আর যে তাঁহারা ইংরেজদিগের অত্যাচার ও অপমান হইতে মুক্তি লাভ করিবে এ আশা ছিল না। কিন্তু চিরদিনকি সমান যায়? পাপ ও অত্যাচারের কতদিন শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে? যাহারা অন্যায় পূর্ব্বক পরের রাজ্য অধিকার করিতে চাহে ন্যায়বান পরমেশ্বর কি তাহাদের ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়া থাকেন? তাহা নয়। যাহারা ক্ষণকালের জন্য প্রভুত্ব পাইয়া নির্দ্দোষীর প্রতি অত্যাচার করে—আপনাদিগের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ন্যায়ের পথ লঙ্ঘন করে—তাহাদের শীঘ্রই সে গর্ব্ব ও মূর্খতার জন্য অনুতাপ করিতে হয়। আর যাঁহারা ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া ন্যায় ও সত্যের পথে যাইবার জন্য চেষ্টা করেন—শত দুর্ব্বল হইলেও ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হন। একদিন না একদিন তাহাদের ঘোর দুঃখ-রজনীর অবসান হয়—অপমান ও নির্য্যাতনের শেষ হইয়া যায়।

একশত বৎসরের দুঃখ ও দাসত্ব সহ্য করিয়া ফরাসীদের ভাগ্যেও তাহাই হইল। এই একশত বৎসর তাহারা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না এবং অশিক্ষিত ও কাপুরুষ লোকের মত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না। আপনাদের ক্ষুদ্র বল ও সাহস লইয়া জয়ী ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন—কতবার পরাজিত হইয়াছেন তবুও সে চেষ্টার বিরাম নাই। ফরাসীরা এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া—স্বাধীনতার জন্য এইরূপ প্রাণপণে খাটিয়াছিল বলিয়া—ঈশ্বর তাঁহাদের দুঃখের দিন অবসান করিলেন। আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় উপায়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজেরা “অরলিন্স্” নামক স্থান অবরোধ করিয়াছে। কত-

দিন কতমাস চলিয়া গেল ফরাসীরা কিছুতেই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইল না। দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে ফরাসীরা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজদিগের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। সকলেই বুঝিতে পারিল এইবার ফরাসীরা চিরকালের জন্য ইংরেজদিগের অধীন হইবে—দাসত্ব ভিন্ন তাহাদের অন্য গতি নাই। কিন্তু সহসা তাহাদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইল। ফরাসীরা ইংরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পন করিবে এমন সময় অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক বালিকা তাহাদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইল।

এই বালিকা ডম্‌রেমী গ্রামের কোন এক কৃষক-কন্যা এবং ইহার নাম জোয়ান। জোয়ান শিশুকাল হইতে অতিশয় ধীর ও শান্ত ছিলেন এবং মাতার সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নিকটস্থ অরণ্যে যাইয়া পক্ষীদিগকে আহ্বান করিতেন আর তাহারা নির্ভয়ে জোয়ানের হস্ত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিত। জোয়ানের শান্ত ধীর স্বভাব এবং তাঁহার পবিত্র জীবন যেন দেশের এই মহৎ কার্য্য সাধন করিবার জন্যই গঠিত হইয়াছিল। যখন আহত ও ক্লান্ত সৈনিকগণ ডম্‌রেমীর নিকট দিয়া গমন করিত তখন তিনি স্বহস্তে তাহাদের সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন; আহার ও পানীয় দ্বারা তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতেন। কে জানিত যে এই ধীর ও শান্ত স্বভাবের মধ্যে বীরত্ব ও দেশানুরাগের খনি নিহিত রহিয়াছে? ক্রমে দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া বালিকার হৃদয় বিগলিত হইল এবং নির্জ্জনে ও নীরবে দেশের কথাই তাঁহার মনে হইত। তখন ফরাসী দেশে এক জনরব ছিল যে "লোরেনের নিকটস্থ কোন কৃষক কন্যা ইংরেজদিগের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবে।" জোয়ানের মনে সে কথা উদয় হইলে কয়দিন তিনি ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন যে সাধু মাইকেলের আত্মা তাঁহাকে স্বদেশ উদ্ধারের জন্য আদেশ করিতেছেন। পরদিন তিনি নিকটস্থ রাজ কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া, এই কথা বলিলেন। কিন্তু তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করিল না—ধর্ম্ম যাজকেরা একার্য্যকে অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রতিজ্ঞা নড়িল না, তিনি বলিলেন "আমি যদি মাতার নিকট থাকিয়া গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম তাহা হইলেই আমি অধিক সুখী হইতাম কিন্তু কি করিব! এ প্রভুর আজ্ঞা; আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না।" অবশেষে জোয়ান রাজ সমীপে নীত হইলেন; কিন্তু সেখানেও পুরোহিতেরা একার্য্য অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। তখন জোয়ান ধীরতার সহিত বলিলেন "আপনাদের পুস্তক অপেক্ষা ঈশ্বরের পুস্তক অধিক মাননীয়।" এবং যখন রাজ সভার মধ্যে রাজা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন তখন আপনার পরিচয় প্রদান করিবার কালে বলিলেন "আমার নাম কুমারী জোয়ান, ঈশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে আপনাকে রিমজ্ নগরে অভিষেক করিতে হইবে। ঈশ্বরই এ রাজ্যের রাজা; আপনি তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।"

যখন এই পবিত্র স্বভাবা অষ্টাদশবর্ষীয়া কুমারী আপাদ মস্তক শ্বেত বস্ত্রে আবৃত হইয়া এবং শ্বেত পতাকা হস্তে গ্রহণ করিয়া অশ্বারোহণে "অরলিন্‌স্" অভিমুখে গমন করিলেন তখন সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কুচরিত্র ইংরাজ সৈনিকেরা তাঁহাকে নানারূপ কুৎসিৎ ভাষায় উপহাস করিতে লাগিল কিন্তু তিনি সেদিকে কর্ণপাত ও করিলেন না। ঈশ্বরের যে আদেশ পালন করিতে আসিয়া ছিলেন তাহা সম্পন্ন করিতেই অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অধ্যবসায়, ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত নির্ভরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ফরাসী সৈনিকদিগের উৎসাহ প্রদীপ্ত হইল এবং একে একে সমস্ত দুর্গ ফরাসীদিগের হস্তগত হইল। শেষ দুর্গ জয় করিবার সময় জোয়ান আহত হইয়া পড়িলেন কিন্তু তথাপি যুদ্ধের বিরাম হইল না। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যাহা ঈশ্বরের আদেশ তাহা সম্পন্ন হইবেই। তাহাই হইল। যখন ইংরেজেরা পশ্চাদপদ হইল তখন জোয়ান ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সমস্ত সৈন্য তাঁহার সঙ্গে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কি চমৎকার দৃশ্য! যুদ্ধের নরহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক ব্যাপারের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য স্বর্গীয় ভাব!! যদি সংসারে সমস্ত যুদ্ধ কার্য্য এমন দেবভাবে চালিত হইত তবে আর পৃথিবীতে এত নির্দ্দোষ রক্ত পাত ও নরহত্যা সংঘটিত হইত না। ইহার পর তিনি রাজার পদতলে পড়িয়া আপনার জন্মস্থানে ভ্রাতা ভগিনীর নিকট যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না।

অতঃপর ইংরাজেরা সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া আবার যুদ্ধ করিতে আসিল এবারও জোয়ান উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল যে একার্য্য তাঁহার জন্য নহে এবং ঈশ্বরের আদেশ তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। বোধ হয় এই বিশ্বাসের জন্যই তিনি এবার শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। একবৎসর কারাগারে অতিবাহিত হইলে ইংরেজেরা তাহার নামে এই অভিযোগ আনিলেন যে "তিনি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন এবং মন্ত্র ও ইন্দ্রজাল দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।" বিচারকেরা তাঁহার প্রতি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল কিন্তু তাঁহার একই উত্তর "ঈশ্বর আমাকে এ কার্য্যে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার আদেশেই ইহা করিয়াছি।" যখন তাহাকে বলা হইল যে যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই হইত তবে তুমি কেন বন্দী হইবে অতএব ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে। তখনও জোয়ান বলিলেন "যদি আমার পতনই ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে তাহাই হউক, কারণ ঈশ্বরের আদেশে যাহা করিয়াছি তাহার জন্য অনুতপ্ত হইব না।" নির্দ্দয় বিচারকেরা তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিল। জোয়ান নির্ভয়ে এক উচ্চস্থানে আরোহণ করিলেন, নিম্নে ভয়ানক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ক্রশ কাষ্ঠ বক্ষে ধারণ করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় তাঁহার পবিত্র দেহ বেষ্টন করিল। শেষ মুহূর্ত্তে একবার খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ করিয়া নরপিশাচদিগের অত্যাচারে তিনি আত্ম সমর্পণ করিলেন। যখন সকলে চলিয়া যাইতে লাগিল তখন এক জন ইংরেজ সৈনিক বলিয়া উঠিল 'আমরা আজ এক সাধ্বীকে দগ্ধ করিলাম আমাদের জয়ের আশাও এইসঙ্গে বিলুপ্ত হইল।' বাস্তবিক ও সেই দিন হইতে ইংরেজদিগের আশা একেবারে নির্ম্মূল হইল। জোয়ান যে আত্মত্যাগ ও দেশানুরাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন তাহাতে ফরাসী হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হইল। এক নূতন সাহস ও বীর্য্যে ফরাসীরা পরাক্রান্ত হইল। শত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে আজিও ফরাসীরা সেই দেবীর স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা ভরে অবসন্ন হইয়া থাকে—সহস্র সহস্র বৎসর

চলিয়া যাইবে তবুও জোয়ানের স্বদেশানুরাগ স্বর্ণাক্ষরে পৃথিবীর ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদিগের কুকীর্ত্তির কালিমা চিহ্নও মানব জাতির চক্ষের সমক্ষে স্পষ্ট-রূপে প্রদর্শিত হইবে।

(প্রাপ্ত।)

আশ্চর্য্য বিনয়।

রুষিয়ার সম্রাট আলেকজ্যাণ্ডারের লাহার্প নামক একজন শিক্ষক ছিলেন। লাহার্প অতিশয় দরিদ্র লোক হইলেও তাঁহার উপর আলেকজ্যাণ্ডারের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি শিক্ষকের কুটীরে গিয়া তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে ভাল বাসিতেন। একদা এই প্রকার সমান্যবেশে লাহার্পের গৃহে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে প্রার্থনা করেন। দ্বারবান নূতন লোক, রাজাকে চিনিতে না পারিয়া কহিল, "মহাশয় আমার প্রভু এখন পাঠে ব্যস্ত, এক ঘণ্টার জন্য তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আমার নিষেধ আছে" এবং তাঁহাকে চাকরদিগের গৃহে বসিতে অনুরোধ করিল। ভৃত্যদিগের আহারের সময় উপস্থিত হওয়াতে অভ্যাগতকে তাহারা আহারে নিমন্ত্রণ করিল। সমগ্র রুষিয়ার অধিপতি, যাঁহার আহারের জন্য পৃথিবীর উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু একত্রিত হয়, এই প্রকার অনুরুদ্ধ হওয়াতে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অতিশয় আহ্লাদ সহকারে ভৃত্যদিগের সামান্য আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আহারান্তে দ্বারবান প্রভুকে জানাইল যে "আলেকজ্যাণ্ডার নামক একজন যুবক তাঁহার সন্দর্শন প্রার্থী।" লাহার্প তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। সম্রাট হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিলে পর, শিক্ষকের লজ্জার পরিসীমা রহিল না। ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আলেকজ্যাণ্ডার আপনার হস্ত দ্বারা শিক্ষকের মুখ বন্ধ করিয়া কহিলেন "ছিঃ মহাশয় আমার নিকট আপনার প্রার্থনা অন্যায়। আপনার এক ঘণ্টা আমার এক দিনের সমান—বিশেষতঃ এত ক্ষণ বাহিরে বসিতে না হইলে আপনার ভৃত্যদিগের সহিত অতি সুন্দর আহারে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইত।"

দ্বারবান অবাক— রুষিয়ার সম্রাটকে সে নিমন্ত্রন করিতে সাহসী হইয়াছিল!! মহামতি আলেকজ্যাণ্ডার সহাস্য বদনে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন ও তাঁহার সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ দ্বারবানকে এক শত রুবল (এক রুবল প্রায় দেড় টাকা) উপহার প্রদান করিলেন।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী লাহিড়ী।

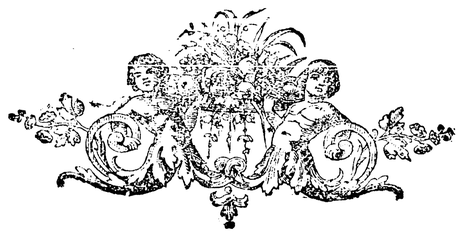

মেডাময়সল্ লি ব্লাঙ্ক।

কাকী বনের মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া একটী বালিকার যে কি দশা হইয়াছিল নিম্নলিখিত ঘটনাটী পড়িলে তাহা জানিতে পারিবে।

১৭৩১ সনে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে সয়নী নামক গ্রামে গ্রামবাসীরা এক দিন সন্ধ্যাকালে একটা উৎসব করিতেছিল; এমন সময়ে তাহারা এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাইল। দেখিল যে, একটা জানোয়ার তাহাদিগের নিকটে আসিতেছে, জানোয়ারটার আকৃতি মানুষের মত, তাহার লম্বা চুল পিঠ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, সমস্ত শরীর প্রায় অনাবৃত, হাতে একগাছি ছোট লাঠি। এই অদ্ভুত জানোয়ার দেখিয়া গ্রামবাসীদিগের উৎসব আনন্দ ত দূরে গেল; ভয়ে কেহ তাহার সম্মুখেও যাইতে সাহস করিল না। একটা খুব বড় তেজাল কুকুর ছিল। সে সকল দেশের লোকেরা চোর ডাকাতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই সকল বড় বড় তেজাল কুকুর রাখিত, কুকুরের গলায় বড় বড় লোহার কাঁটা দেওয়া কলার পরান থাকিত। সেই কুকুরটাকে তাহারা ছাড়িয়া দিল; কিন্তু তাহাতে সেই অদ্ভুত প্রাণী একটুও ভীত হইল না, বরং আত্মরক্ষার জন্য লাঠি হাতে করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কুকুরটাকে খুব উত্তেজিত করিয়া দেওয়াতে, সে এক ভয়ঙ্কর লম্ফ দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যেমন গিয়াছে, অমনি এক লাঠির আঘাতে তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া, এই অদ্ভুত প্রাণী তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল; এবং একটা বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, কাঠবিড়ালীগুলি যেমন নিপুণতার সহিত গাছে উঠে, সেই রূপ নিপুণতার সহিত একটা গাছে গিয়া উঠিয়া বসিল। সে গ্রামের লোকেরা সাহস করিয়া আর তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না; এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত আর এই অদ্ভুত প্রাণীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

কয়েক দিন পরে সেখানকার জমিদার এই প্রাণীর কথা শুনিয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ পাইলেন না। সপ্তাহ খানেক পরে একদিন তাহার একজন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটা আতা গাছের উপর একটা অদ্ভুত আকৃতির জানোয়ার বসিয়া আছে; তাহারা কাছে যাইবা মাত্র, সে একটা গাছ হইতে আর একটা গাছে, সে গাছ হইতে আর একটা গাছে, এই রকম করিয়া অবশেষে বাগানটা পরিত্যাগ করিয়া, একটা খুব উচু গাছের উপর গিয়া বসিল। জমিদার তখন লোকজন জড় করিয়া সেই গাছের তলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কি উপায়ে ইহাকে ধরিবেন তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গ্রামের লোকেরা দেখিয়াই চিনিল যে এইই সেদিন তাহাদিগের কুকুরটাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু সেই ভদ্রলোক তাহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা কোন ভয় করিও না। ইহাকে একটি ছোট বালিকার মত দেখা যাইতেছে, বোধ হয় এ পাগল, ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, কোন মতে পলাইয়া বোধ হয় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা সমস্ত রাত্রি এবং তার পর দিন ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই গাছ তলায়

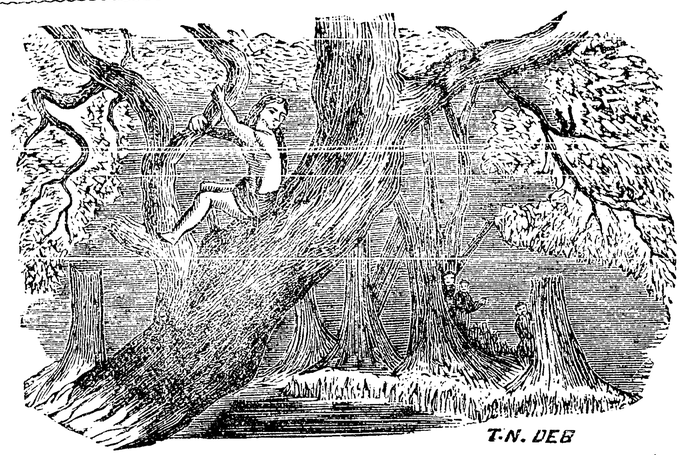

T.N. DEB

দাড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিল। তখন সেই ভদ্রলোক বলিলেন যে, একটা পাত্রে খানিকটা জল গাছতলায় রাখিয়া সকলে সেখান হইতে চলিয়া যাও। সকলে তাহাই করিল। তখন দেখা গেল যে, একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ধীরে ধীরে নামিল, এবং জলের কাছে আসিয়া ঘোড়া প্রভৃতি যেমন করিয়া জল খায়, তেমনি করিয়া সমস্ত জলটা খাইয়া ফেলিল। তখন সেখানে যত লোক ছিল সকলে তাহাকে ধরিবার জন্য একেবারে আসিয়া পড়িল, এবং অনেক কষ্টে অবশেষে তাহাকে ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেল।

প্রথমে তাহাকে রান্না ঘরে লইয়া গেল; সেখানে কতগুলি পাখী ছিল; সে কাঁচাই তাহা খাইয়া ফেলিল। খাওয়ার পর সে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, তাহার চাহনি দেখিয়া বোধ হইল যে, সে কখনও এসকল জিনিস দেখে নাই। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যে, তাহার বয়স বার তের বৎসর হইয়াছে। তখনও কোন কথা বলিতে পারিত না, কেবল এক এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ করিতে পারিত।

এই অদ্ভুত জীব লইয়া কি করিবেন, তখন সেই ভদ্র লোক তাহা ভাবিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন সে নিতান্ত অস্থির হইয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং ক্রমাগত পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাত্রিতে তাহাকে খাবার দেওয়া হইল, কিন্তু সে তাহা স্পর্শও করিল না, বোধ হয় রান্না করা জিনিস দেওয়া হইয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ। শুইবার জন্য তাহাকে বিছানা করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কোন মতেই সে বিছানায় শুইল না; কাপড়ও পরাইবার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। তখন সেই ভদ্রলোক ভাবিতে লাগিলেন, ইহাকে লইয়া কি করিবেন। কথাও বলিতে পারিত না, সুতরাং এ হতভাগ্য বালিকার কোন কথাই জানা গেল না। কিন্তু যাহাই হউক, সেই ভদ্রলোকটি অতি-যত্নের সহিত তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার স্বভাবও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং ক্রমে সে কাপড় পরিতেও আরম্ভ করিল। এবং মাস খানেক পরে দেখা গেল সে আর পলাইবে এ প্রকারও সম্ভাবনা নাই। কিছু কাল পরে তাহাকে এক দিন বাড়ীর বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল; কিন্তু তাহাতে এক বিপদ ঘটিল। বাড়ী ছাড়িয়া মাঠে যাইবা মাত্র সে হঠাৎ দৌড়িতে আরম্ভ করিল, এবং এত দ্রুতবেগে দৌড়িতে লাগিল যে, কেহ তাহাকে দৌড়িয়া ধরিতে পারিল না। কিন্তু সেই ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সে পলাইতে পারিল না। পলাইবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না। কারণ দেখা গেল যে, সে একটা বড় পুকুরের ধারে উপস্থিত হইয়া, কাপড় খুলিয়া রাখিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, এবং চারিদিক সাঁতরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার সে ডুব দিয়া এতক্ষণ জলের মধ্যে ছিল যে, সে ভদ্রলোকটী ভাবিয়াছিলেন যে, হয়ত সে ডুবিয়া মরিয়াছে। তিনি তাহাকে তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখা গেল যে সে একটা মাছ মুখে করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। তারপর তীরে উঠিয়া আবার কাপড় পরিয়া সকলের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সে কথা বলিতে পারিত না বটে কিন্তু বনের সকল প্রকার পাখীর ডাক সুন্দর রূপে অনুকরণ করিতে পারিত; এবং অনেক সময় তাহাকে পাখী বলিয়া ভ্রম হইত! এই সকল দেখিয়া বোধ হইল যে, সে পাগল নহে, কিন্তু কোন ঘটনা বশতঃ ছেলে বেলায় বনে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবং বনে কোন প্রকার জীবন ধারণ করিয়া সে এত বড় হইয়াছে। তাহাকে কথা বলিতে শিখাইবার জন্য অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, এবং অবশেষে সে চেষ্টার সুফলও ফলিয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা বলিবার শক্তি যত বাড়িতে লাগিল, ছেলেবেলার কথা ততই ভুলিতে লাগিল। কতক কতক কথা সে মনে করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল। তাহাতেই তাহার ছেলেবেলার বিবরণ কতক জানিতে পারা গিয়াছে।

সে বলে যে, প্রায় তাহার সমবয়সী আর একটী বালিকার সহিত সে বনে বাস করিত। পিতা মাতার সম্বন্ধে কোন কথাই তাহার মনে নাই। শীতকালে বন্য পশুর চামড়া দ্বারা তাহারা দুই ভগ্নীতে শীত নিবারণ করিত, এবং গ্রীষ্ম কালে একটা ঘাঘরার মত কিছু পরিত, এবং তাহাতে ছোট লাঠি গাছটি ঝুলাইয়া রাখিত। এই লাঠি দ্বারা বন্য পশু মারিয়া আহার করিত। রক্ত পান করিতে বড় ভাল বাসিত, বিশেষতঃ খরগোসের রক্ত তাহাদের বড় প্রিয় ছিল। সে বলে যে, তাহার সঙ্গিনীর মৃত্যু হইয়াছে। এক-দিন তাহারা দুই জনে একটা নদীতে সাঁতরাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হওয়াতে দুই জনেই ডুব দিয়া অনেক দূরে গিয়া ভাসিয়া উঠে। সেখানে তাহারা মালার মত কি একটা জিনিষ পায়, এবং তাহাকে কে লইবে এই লইয়া দুই জনের মধ্যে বিবাদ হয়। তাহার ভগ্নী তাহাকে এক আঘাৎ করে এবং সেও সেই লাঠি দিয়া তাহার মাথায় এক আঘাৎ করে। এই আঘাতে সে পড়িয়া যায় এবং মাথা হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া তাহার অত্যন্ত দুঃখ হয় এবং তাহাকে বাঁচাইবার জন্য সে কি ঔষধ আনিতে যায়। কোন লতা পাতায় রক্ত বন্ধ হইবে, তাহা বোধ হয় তাহারা জানিত। কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া আর তাহার ভগ্নীকে দেখিতে পাইল না। ইহাতে তাহার দুঃখ আরও অধিক হইল, এবং সে বনে বনে তাহার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। এই সময়ে সে ধরা পড়ে। তাহার ভগ্নীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই হতভাগ্য বালিকার স্বভাব যদিও ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, তথাপি অনেক সময় তাহাকে শাসনে রাখা যাইত না, এবং সে

সহজেই অত্যন্ত রাগিয়া উঠিত। বিশেষতঃ পুরুষ জাতির উপর তাহার কেমন এক প্রকার স্বাভাবিক রাগ ছিল; পুরুষ দেখিলেই সে অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিত। একজন ধর্ম্মযাজক এই জন্য তাহাকে একটা কন্‌ভেণ্টে (convent) রাখিতে পরামর্শ দেন, কারণ সেখানে পুরুষের যাতায়াত একেবারেই নাই। কন্‌ভেণ্টে আনিয়া তাহাকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল, এবং মেডাময়সল্ লি ব্লাঙ্ক এই নাম তাহাকে দেওয়া হইল। জীবিত প্রাণীর উপর তাহার লোভ তখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ যায় নাই। এক দিন একটী খুব সুন্দরী স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিতে যান; তিনি আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় তাহাকে তাঁহার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয়। একটা রান্না করা মুরগী টেবিলের উপর ছিল, লিব্লাঙ্কের চেহারা দেখিয়া বোধ হইল, তাহার খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই সে স্ত্রীলোকটী তাহাকে খানিকটা দিতে গেলেন, তখন সে একটু উত্তেজিত এবং সম্পূর্ণ সরলতার সহিত বলিল, "না আমি উহা চাই না, আমি তোমাকে চাই।" এই বলিয়া সে তাঁহাকে ধরিতে যাইতেছিল, এমন সময় বলপূর্ব্বক সেখান হইতে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল।

এই কন্‌ভেণ্টে যখন সেই বালিকা থাকিত তখন পোলাণ্ডের রাণী তাহাকে দেখিতে যান। তাঁহার একজন কর্ম্মচারী তাহাকে কি একটু বিদ্রূপ করাতে সে তাঁহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করে; কিন্তু অনেক কষ্টে শেষে রক্ষা পান।

কন্‌ভেণ্টে আসিয়া তাহার শরীর ক্রমে খারাপ হইতেছিল এই জন্য তাহাকে একটী আশ্রমে রাখা হয় এবং তাহার পরিচর্য্যার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বালিকার যখন অধিক বয়স হইয়াছিল, তখন তাহার পূর্ব্বের স্বভাব কিছুই ছিল না, বেশ ধীর শান্ত ভাবে মানুষের মত জীবন যাপন করিত। পারিস নগরে ১৭৮০ সনে ৬২ বৎসর বয়সে এই হতভাগ্য বালিকার মৃত্যু হয়। উপরে লিখিত ঘটনা ভিন্ন, তাহার জীবনের আর কোন ঘটনা জানা যায় নাই।

ধাঁধা।

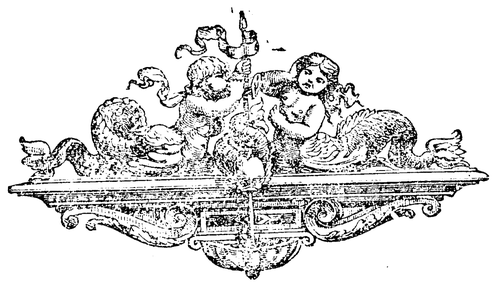

১। ৪৫কে এমন ৪ ভাগে বিভক্ত কর যে, প্রথম ভাগকে ২ দিয়া যোগ করিলে, দ্বিতীয় ভাগ হইতে ২ বিয়োগ করিলে, তৃতীয় ভাগকে ২ দিয়া গুণ করিলে এবং চতুর্থ ভাগকে ২ দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেক ফলই ১০ হইবে।

সন ১২৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা

সখা।
পঞ্চম ভাগ। চতুর্থ সংখ্যা।
এপ্রিল, ১৮৮৭।

প্রতিষ্ঠিত

কুমারী তরু দত্ত।

যদি ফুলের গন্ধ থাকে, তবে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সকল ফুলে গন্ধ থাকে না; একটী বাগানের মধ্যে শত শত ফুল ফোটে, কিন্তু তার মধ্যে অনেকই দেখিতেই সুন্দর। অশোক গাছে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা থোপা থোপা ফুল ফোটে, কিন্তু তাহাতে গন্ধ নাই; এমনিতর অনেক ফুলই ফোটে যাহার গন্ধ থাকে না, দেখিতেই কেবল সুন্দর। কিন্তু বাগানের মধ্যে আবার এমন এক একটী ফুল ফোটে, যার গন্ধ চারিদিক আমোদিত করিয়া তোলে। এই ফুলগুলি ফুটিয়া, চারিদিক সৌরভ বিস্তার করিয়া, অবশেষে শুকাইয়া ঝরিয়া যায়; যত্ন করিয়া রাখিলে, শুকাইয়া ঝরিয়া গেলেও, ইহাদিগের সুগন্ধ একেবারে যায় না।

ত্রিশ বৎসর হইল এমনিতর একটী ফুল কলিকাতায় এক বাঙ্গালীর ঘরে ফুটিয়াছিল। তাহার সৌরভ কেবল বাঙ্গালাদেশে নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অকালে ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতে ফুলটী শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে। ঝরিয়া গেলেও তাহার সৌরভ এখনও যায় নাই।

কলিকাতার রামবাগানের দত্ত পরিবার লেখা পড়া প্রভৃতির জন্য বিশেষ বিখ্যাত। ১৮৫৬ সালের ৪ঠা মার্চ্চ এই প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারে তরুর জন্ম হয়। তরুর পিতা বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত বিদ্বান এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কার্য্য করিতেন এবং শেষ অবস্থায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্মালোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইহাঁর একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। পুত্রের নাম অব্জ এবং কন্যা দুটীর নাম অরু এবং তরু।

অব্জর বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন তাহার মৃত্যু হয়; পুত্রের কাছে গোবিন্দ বাবু অনেক আশা করিতেন, কিন্তু অকালে মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। পুত্রের মৃত্যু হইল, তখন গোবিন্দ বাবু কন্যা দুটীকে অতি যত্নে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অরু এবং তরু উভয়েই অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন, কিন্তু সকলের অপেক্ষা তরুর প্রতিভা অধিক ছিল। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৃতীয় সন্তান অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান হয়। যাহা হউক অরু বড় হইলেও তরুর অনুগত হইয়া—তরুর ইচ্ছামত

চলিত। যেমন একটা উজ্জ্বল আলোকের কাছে একটা ছোট আলোকের প্রভা দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি তরুর কাছে অরুর প্রভা প্রকাশ পাইত না; কিন্তু তাই বলিয়া তরুর কাজে কথায় বা ব্যবহারে কখনও অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ পাইত না।

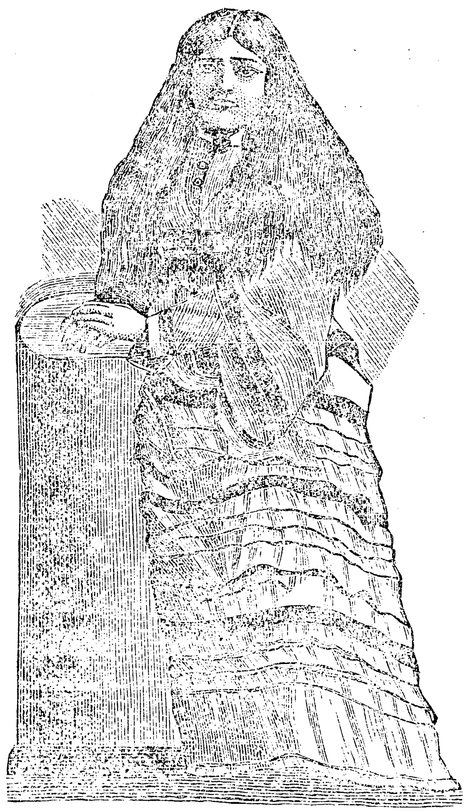

তরুর শিক্ষা এবং তাঁহার মনের বিকাশের প্রধান সহায় যে তাঁহার পিতা ছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। গোবিন্দ বাবু প্রথম হইতেই যাহাতে সন্তানদের সুশিক্ষা হয় তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন; এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া নানা উপায়ে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন। অরু ও তরু ফ্রান্স দেশে কয়েক মাস ভিন্ন আর কখনও কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। যাঁহারা মনে করেন স্কুলে না পড়িলে লেখা পড়া শিক্ষা হয় না, তাঁহারা দেখিবেন স্কুলে না পড়িয়াও তরু যে প্রকার লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, অনেকে বি এ, এম এ, পাশ করিয়াও তাহা পারেন নাই। যদি ইচ্ছা ও যত্ন থাকে, তাহা হইলে ঘরে বসিয়াও অনেক লেখা পড়া, অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। তরু আট মাস মাত্র ফ্রান্সের একটী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নাম মাত্র; গৃহে আপনার যত্নেই অধিক শিক্ষা করিতেন।

গোবিন্দ বাবু ১৮৬৯ সালে ইউরোপ যান, এবং সেই সময় অরু ও তরুকে সঙ্গে লইয়া যান। শিক্ষা দেওয়াই তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাঁরা ফ্রান্সে কিছুকাল থাকেন, এবং ইংলণ্ডে তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক কাল থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের উপর তরুর প্রাণের একটা টান ছিল। ফ্রান্সে যখন ছিলেন তখন তরুর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। ফরাসী কাব্য পড়িবার জন্য তাঁহার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। কেবল যে পড়িয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, ছোট বড় সকল কবিদিগের লেখাই তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তি ছিল, তিনি যে রাশি রাশি কবিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন, সে সকলই তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি অনেক পড়িয়াছিলেন, এবং যাহা পড়িতেন তাহা খুব ভাল করিয়া পড়িতেন, একটীও শক্ত কথা তাঁহার নিকট এড়াইবার যো ছিল না; ছোট বড় সকল অভিধান হইতে সেই কথার ঠিক অর্থ না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। তাঁহার পিতার

সহিত তাঁহার যদি কখনও কোন কথার প্রকৃত অর্থ লইয়া তর্ক হইত, তাহা হইলে দশটীর মধ্যে সাত আটটীতে তিনিই জিতিতেন। তিনি প্রথমে অনেক ইংরেজী বই পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শেষে প্রায় আর তিনি ইংরেজী বই পড়িতেন না, অধিকাংশ সময় ফরাসী ও জর্ম্মাণ বই লইয়াই দিবারাত্র থাকিতেন। ৩।৪ আল্‌মারী পরিপূর্ণ ফরাসী ও জর্ম্মাণ বই পড়া একটী বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নয়। ফরাসী জাতি তাঁহার প্রাণের ভাল বাসার বস্তু ছিল। যখন ফ্রান্সের সহিত প্রুসিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ হইল, তখন তরু ইংলণ্ডে ছিলেন, এবং তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। তখন তিনি তাঁহার দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন—"একদিন বাবা মাকে সম্রাটের কথা কি বলিতেছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি গিয়া শুনিলাম ফরাসীরা হার মানিয়াছে। আমি তখন কি ভাবে আবার সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম তাহা স্মরণ আছে, কে যেন আমার গলা চাপিয়া ধরিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁদ কাঁদ স্বরে অরুকে সকল কথা বলিলাম। ফ্রান্সের কেন পতন হইল? ইহার অনেক লোক পাপ ও নাস্তিকতায় ডুবিয়াছে—এইজন্য কি? হে ফ্রান্স তোমার কি ভয়ানক পতন হইল! এই অবমাননার পর ঈশ্বরকে ভাল করিয়া পূজা ও সেবা করিতে শিখিও। দুর্ভাগ্য ফ্রান্স তোমার জন্য আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।" এই সময়ে তিনি একটী কবিতা লেখেন; তাহার মর্ম্ম এই যে—ফ্রান্স মরে নাই, কিছুকালের জন্য মূর্চ্ছাগত হইয়াছে; সকলে মিলিয়া ইহার শুশ্রূষা কর, আবার ফ্রান্স সকল জাতির উপরে দাঁড়াইবে। পনর বছরের বালিকার কি সহৃদয়তা, —কি ধর্ম্মভাব!

সংসারের কাজ কর্ম্মে তিনি অতিশয় নিপুণা ছিলেন; কোন কাজকেই নীচ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি অতিশয় সুন্দর গান করিতে পারিতেন এবং পিয়েনো বাজাইতে পারিতেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা লিখিয়াছেন যে, "আজিও যেন সেই মধুর শব্দ আমার কর্ণে বাজিতেছে।" অরু ও তরু উভয়ের ইচ্ছা ছিল একখানি উপন্যাস লিখিয়া প্রকাশ করিবেন, তরু লিখিবেন এবং অরু তাহাতে ছবি আঁকিয়া দিবেন। তরু সেই উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৭৪ সালে অরুর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছা আর সফল হয় নাই। ১৮৭৯ সালে একজন ফরাসী মহিলা তাঁহার জীবনী সহিত তাঁহার লিখিত উপন্যাস খানি মুদ্রিত করেন। একটী বাঙ্গালী মেয়ের রচিত ফরাসী উপন্যাস দেখিয়া ইউরোপের লোক যার পর নাই আশ্চর্য্য হন; ইহাতে তাঁহার প্রতিভার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষা পদ্য লেখায় তাঁহার প্রতিভা বিশেষ প্রকাশ পায়; এবং কবিত্বের জন্যই ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তাঁহার এত আদর। জীবিতাবস্থায় তাঁহার কয়েকটী মাত্র কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ সালে তাঁহার পিতা তাঁহার একখানি পদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের এত সুখ্যাতি হইয়াছিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হইয়াছিল এবং ৬।৭ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে ভারত গীতিমালা নামে আর একখানি পদ্য প্রকাশিত হয়—এবং ইহাই তাঁহার শেষ কীর্ত্তি। ইহা দ্বারা তাঁহার কবিত্বশক্তি বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়—এবং তাঁহার যশ চারিদিকে বিশেষরূপে বিস্তৃত হয়। ১৯২০ বৎসরের একটী বাঙ্গালী রম-

নীর পক্ষে ইহা কি সামান্য প্রশংসার কথা! আজ কাল অনেক মহিলারা পদ্য লিখিতেছেন এবং কেহ কেহ ভাল ভাল কবিতাও লিখিতেছেন; কিন্তু বিদেশীয় ভাষায়—ইংরাজিতে পদ্য লিখিয়া ইংরেজের নিকট প্রশংসা লাভ করা সামান্য ক্ষমতার কথা নহে। ১৮৭৩ সালে দেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতার সহিত সংস্কৃত অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। বোধ হয় দেশীয় ভাষার পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু অকাল মৃত্যুতে সে আশা আর সফল হইতে পারে নাই। বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন এমন সময় তাহার শরীর অসুস্থ ছিল। সুতরাং আর পড়া শুনা হইল না। বিষ্ণুপুরাণের দুইটী গল্প ইহার মধ্যে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। প্রাচীন ভারত রমণী নামক একখানি ফরাসী পুস্তক পড়িয়া তিনি তাহা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই পুস্তক লিখিতে লিখিতে ব্যারাম ক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল এবং ১৮৭৭ সালের ৩০শে আগষ্ট একুশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল। অল্প বয়সে তরুর মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে সহজে লোকে তাঁহার নাম ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার যশ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে তাঁহার কত আদর! তরু গিয়াছেন—ফুলটী শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত রহিয়াছে। এমন ফুল বেশী ফোটে না। যে কুসুম ভাল করিয়া না ফুটিতেই এত শোভা এত সৌরভ; ফুটিলে তাহার কি শোভা কি সৌরভই না হইত!

পিঁপীলিকার উপদেশ।

(৩৬ পৃষ্ঠার পর।)

পিঁপড়ে বলিতে লাগিল—মাকড়সা আশ্চর্য্য কীট। ইহারা বড় হিংস্র; মায়া দয়া কিছুমাত্রই নাই। জীবন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া খায়। আহা, সেই পোকগুলি তখন কত ছট্ ফট্ করিতে থাকে, তাহা দেখিয়াও তাহাদের দয়া হয় না। অনেক দুষ্ট ছেলে আছে যারা পোকা মাকড় ব্যাং দেখিলেই কত যন্ত্রণা দেয় ও মারিয়া ফেলে, কিছুই দয়া হয় না, মাকড়সাও সেইরূপ। নিরামিশ ত খাইবেই না, তার পর মরা পোকা মাকড় ও খাইবে না। আমরা পিঁপড়ে, বুঝিলে ভাই, জেয়ন্ত পোকা টোকা খাই না, উদ্ভিদ খাই, চিনি খাই, মধু খাই, সন্দেসের ত কথাই নাই, আর মড়া জিনিসের মাংস খাই। জীব হিংসা করিতে আমাদের কেমন প্রাণে লাগে। ভাই! মাকড়সার অবস্থা দেখিলে আমাদের বড় দুঃখ হয়। তুমি ওদের গিয়ে এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পার! ওদের শিক্ষা দিলে অনেক লাভ হইতে পারে।

ভাই! মাকড়সার আট্টা পা। আট্টা চোক। তলপেটে একটা থলিয়া আছে, সে থলিয়া হাঁসের ডিমের সাদা পদার্থের মত এক রকম রসে পূর্ণ। সে থলিয়ার গায়ে কতকগুলি সূক্ষ্ম ফাঁপা লোম আছে, তাহার ভিতর দিয়া সেই রস বাহির হয়। বাহির হইবামাত্রই জমিয়া সুতার মত হইয়া যায়। এই সূক্ষ্ম সুতাগুলি একত্রিত হইয়া এক এক গাছি মাকড়সার সুতা হয়। এই সুতা দড়ির মত খোলা যায়। এই সুতা মাকড়সার

অনেক কাজে আইসে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে, উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে, বাস স্থান নির্ম্মাণ করিতে, শিকার ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিতে, নিজের ডিমগুলি সাবধানে ঢাকিয়া রাখিতে, শীত হইতে পরিত্রাণের জন্য বস্ত্র বয়ন করিতে—এই সকলেই মাকড়সা সুতা ব্যবহার করিয়া থাকে। সকল মাকড়সাই একই প্রকারের জাল বুনে না। ইহাদের মধ্যেও মহারাট্টা, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, পার্শী আছে। ইহারা জাতীয় রীতি বজায় রাখিতে বড়ই ইচ্ছুক। বাঙ্গালীর মত আবার জাতীয় রীতি অনুকরণ করিতে ভাল বাসে না; কোন কোন মাকড়সা গাড়ির চাকার মত জাল বুনিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে, কেহ আবার মাঝখানটা গর্ত্ত—ভিক্ষার ঝুলির মত—জাল বুনিয়া ঝুলাইয়া রাখে, আবার কেহ কেহ গর্ত্ত বা কোটরের মুখে বোম্বাই চাদরের মত পুরু জাল দিয়া দুয়ার নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে তাহার ভিতর বাস করে। সে দুয়ার মাকড়সা নিজের ইচ্ছায় খুলিতে বা বন্দ করিতে পারে, অপরের পক্ষে সে দুয়ার খোলা বড় কঠিন ব্যাপার। কেহ দিবসে নিদ্রা যায়, রাত্রে আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। কেহ রাত্রে ঘুমায়, সমস্ত দিবস শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ একস্থানে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে, কখন ফাঁদে শিকার পড়িবে তাই ভাবিতে থাকে; সে স্থান হইতে আর নড়ে না। কাহার বা নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, দিন রাত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ শিকারের পশ্চাতে নিঃশব্দে আস্তে আস্তে যায়, তৎপরে হঠাৎ তাহার গায়ে লাফাইয়া পড়িয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করে। কেহ কেহ বাতাসে নিজের সুতা উড়াইয়া দেয়, যখন সুতাটা বেশ বড় হয় তখন আর মাকড়সার ভার সুতাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; মাকড়সা শুদ্ধ সুতা বাতাসে উড়িয়া যাইতে থাকে, ইহাকেই "চাঁদের বুড়ীর সুতা" বলে।

মাকড়সার বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়। একবার একটী মাকড়সা দুটী বৃক্ষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জাল তৈয়ার করে। জালটী বড় বলিয়া টান হয় নাই, বাতাসে বড় দুলিত, তাহাতে মাকড়সার বড় অসুবিধা হইত। টান করিবার জন্য জালের নীচের দিকে তিন চারিটী সুতা বাঁধিয়া সেগুলিকে গাছতলায় পাথর আর ঘাসের সহিত আট্‌কাইয়া দেয়। কিন্তু গাছতলা দিয়া লোক এবং গরু ও ছাগলের যাতায়াতে সে বাঁধ গুলি ছিঁড়িয়া যায়। তখন মাকড়সা সুতার সাহায্যে নীচে নামিল এবং ভূমি হইতে একটী ছোট কাঁকর লইয়া পুনরায় সেই সুতার সাহায্যে উপরে উঠিয়া জালের নীচে সেইটীকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিল। কাঁকরের ভারে জালটী বেশ টান হইয়া রহিল। জালের তলা দিয়া অনায়াসে লোকজন যাতায়াত করিতে লাগিল, আর পূর্ব্বের ন্যায় ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিল না।

মাকড়সা রাগ এবং অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি মাছি ধরিয়া একটী মাকড়সার জালে ফেলিয়া দিতেন, আর যেই মাকড়সা সেই মাছি ধরিত, অমনি তিনি মাছিটীকে কাড়িয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপ পাঁচ ছয় বার করাতে মাকড়সার বড় রাগ হইল। পুনরায় মাছি ফেলিয়া দিলে সে আর ধরিতে আসিল না, জাল কাটিয়া দিয়া মাছিকে নীচে ফেলিয়া দিল। সেই লোকটী তারপর দিন মাকড়সার কত খোসামুদি করিলেন তথাপি তাঁহার মাছির দিকে দৃক্‌পাত করিল না। অনেকক্ষণ পরে সেটীকে দূরে ফেলিয়া দিল।

মাকড়সা বড় সঙ্গীতপ্রিয়। মৃদুস্বরে বেহালা, হারমোনিয়াম বা পিয়ানো বাজাইলে মাকড়সাদিগকে অনেক সময়ে জাল ছাড়িয়া বাজনার নিকটে আসিতে দেখা গিয়াছে। সঙ্গীতে এতই মুগ্ধ হয় যে, সে সময়ে তাহারা কোন বিপদের আশঙ্কা করে না। শব্দ কর্কশ হইলেই তাহারা পলাইয়া স্বস্থানে যায়।

অন্যান্য জীবের ন্যায় মাকড়সাও মৃত্যুর ভাণ করে। ভেককে আঘাত করিলে যেমন মড়ার মত পড়িয়া থাকে, কেন্নো পোকা নাড়িলে গুঁড়ি গুঁড়ি হইয়া যেমন পয়সার মত নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে, মাকড়সাকে আঘাত করিলে সেই রূপ মড়ার মত পড়িয়া থাকে, পা ছিঁড়িয়া লইলেও নড়ে না। তারপর পিঁপড়ে বলিতে লাগিল—এরা কেমন যে এক রকমের জীব তা বলা যায় না। এদের সমাজ নাই, শাসন-প্রণালী নাই। পারিবারিক স্নেহবন্ধন কিছুই নাই। ইহারা বড় স্বার্থপর, নিজের ঘোল আনাই বুঝে। অপরের খোঁজ খবরও রাখে না। একলা একলা থাকে, দু তিন জন এক সঙ্গে থাকিবে না, পরস্পরকে সাহায্য করিবে না, কাজেই ইহারা হিংস্র স্বভাব। যাহারা মিলিয়া মিশিয়া থাকে না, যাহাদের সমাজ নাই, তাহাদের দয়া, মায়া, স্নেহ, অনুরাগ, ভালবাসা—এই সকল বৃত্তি কিরূপে জন্মিবে? আমরা পিঁপড়েরা ক্ষুদ্র জীব, আমরা পরের জন্য সারাদিন রাত খাটি, ভাই ভাই এক সঙ্গে থাকি, আমাদের সমাজ-বন্ধন আছে, শাসন-প্রণালী আছে, অপরের অসময়ে সাহায্য করি, পীড়ার সময়ে সেবা সুশ্রূসা করি। আমাদের মধ্যে কেমন স্নেহ, বন্ধুতা আছে। আমরা বেশ সুখী—এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে আমরা পিঁপড়ের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম।

রমণীর দয়া।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দয়াশীলা। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীজাতীর হৃদয়ে স্নেহ, দয়া প্রভৃতি অনেক অধিক। অন্যের কষ্ট দেখিলে মেয়েদের যেমন কষ্ট হয়, পুরুষের তেমন হয় না। কাহারও দুঃখ বিপদ দেখিলে মেয়েদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, কাহাকেও কাঁদিতে দেখিলে মেয়েরা চখের জল রাখিতে পারেন না। দয়া মনুষ্যের একটী উৎকৃষ্ট ভূষণ। পাঠিকাগণ! তোমরা যেন এই ভূষণ হারাইও না। পরমেশ্বর স্নেহ দয়াতে তোমাদিগের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তোমরা যেন তাহা অবহেলা করিও না। অন্যের দুঃখ ক্লেশ দূর করিবার জন্য যেন তোমাদের প্রাণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, অন্যের চক্ষের জল মুছাইয়া দিবার জন্য, স্নেহের অঞ্চল যেন সর্ব্বদা তোমাদের হাতে থাকে।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অনেক দয়ার কাজ করিয়াছেন, এমন কি অন্যকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। তৃতীয় বর্ষের সখাতে তোমরা তাহার একটী ঘটনা পড়িয়াছ। আজ তোমাদিগকে আর দুইটী ঘটনা শুনাইব।

ফয়জাবাদের সিপাহীরা যখন বিদ্রোহী হয়, তখন সেখানকার ডেপুটী কমিসনার একজন লোক দিয়া তাঁহার স্ত্রীকে, সকল পরিত্যাগ করিয়া, সেই লোকের সঙ্গে শীঘ্র নদীকূলে যাইতে বলিয়া পাঠান। বিবি সেই লোকের সঙ্গে পাল্কীতে নদীকূলে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তখন বিবি পাল্কী হইতে নামিয়া একখানি

গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। একটী এ দেশীয় স্ত্রীলোক তাঁহাকে অসহায় দেখিয়া নিজের ঘরে আশ্রয় দিল এবং একটি তুন্দুরের ভিতরে লুকাইয়া রাখিল। সিপাহীরা রাত্রিতে ঐ গ্রামে প্রবেশ করিয়া পলায়িত ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ দিগের খোঁজ করিতে লাগিল। এবং সকলকে এই বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল যে, যাহারা পলাইতদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহারা যদি তাহাদিগকে না বাহির করিয়া দেয়, তবে তাহাদিগকেও হত্যা করিবে। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটী নিজের প্রাণ যাইবে জানিয়াও সেই বিবিকে বাহির করিয়া দিল না। সেই বিবি যে সে বাড়ীতে ছিলেন তাহা অনেকেই জানিত কিন্তু কেহই তাহা প্রকাশ করিল না। বিবি সমস্ত রাত্রি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; কিন্তু সিপাহীরা কোন খোজ না পাইয়া অন্য গ্রামে চলিয়া গেল। পর দিন প্রাতঃকালে বিবির সঙ্গের সেই লোকটী সেখানকার একজন জমিদারের নিকট গিয়া এক খানি নৌকা চাহিয়া আনিল। তখন সেই নৌকায় ডেপুটী কমিসনারের স্ত্রী এবং আরও কয়েকজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক তাঁহাদের সন্তানাদি লইয়া নৌকায় উঠিলেন। জন কতক বিশ্বাসী সিপাহী তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল। সন্ধ্যার সময় নৌকা লাগাইয়া কয়েকজন গ্রামের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ করিতে গেল। এখানেও স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে অনেক সহায়তা করিয়াছিল। ইহাদিগের দুরাবস্থা দেখিয়া তাহারা কতই ক্লেশ পাইয়াছিল। একটী ছোট ছেলে ক্ষুধায় ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া একজন আসিয়া তাহাকে স্তন্যদান করিতে লাগিল। যাহারা এই নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগকে এই প্রকার সাহায্য করিতেছিল, সিপাহীরা জানিতে পারিলে হয়ত তাহাদিগকে বধ করিত; কিন্তু তাহা জানিয়াও তাহারা আশ্রয় দিতে ক্ষান্ত হয় নাই।

বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে একজন ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার স্ত্রী ও ছেলেদের ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, কেবল একটীমাত্র দেড় বৎসরের ছেলে তাঁহার নিকট ছিল। একজন মুসলমান ধাত্রী ঐ ছেলেটীকে পালন করিত। সে একদিন ছেলেটীকে কোলে লইয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় শুনিতে পাইল যে, সেখানকার সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। সিপাহীরা ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা সকলকেই বধ করিতেছে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়া গেল এবং আপনার কাপড় লইয়া তাহার দ্বারা বেশ করিয়া ছেলেটীকে জড়াইয়া ঘরের এক কোণে লুকাইয়া রাখিল, এবং তাহাকে পিছনের দিকে রাখিয়া সে আপনি সম্মুখে বসিয়া রহিল। সিপাহীরা ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বলিল, "আমরা ইউরোপীয়দিগকে বধ করিব, ছেলেটীকে কোথায় রাখিয়াছ বল।" সে সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে রক্ষা কর—প্রভৃতি অন্য সকল কথা বলিতে লাগিল। সিপাহীরা তাহাদিগের কথার উত্তর না পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইল এবং একজন তাহার হাতের অস্ত্র দিয়া তাহাকে আঘাত করিল। তাহার শরীর হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু তবুও সে তাহাদিগের কথার কোন উত্তর দিল না। সিপাহীরা তাহাকে আরও আঘাত করিল, এবং আঘাতের পর আঘাৎ পাইয়া সে একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল। সিপাহীরা তখন চলিয়া গেল। খানিক পরে চেতনা লাভ করিয়া শিশুটীকে লইয়া সে নিজের বাড়ীতে গেল এবং ইংরেজ বলিয়া কেহ জানিতে না পারে এই জন্য তাহার

গায়ে এক প্রকার রং মাখাইয়া দিল। কিছুদিন পরে সে শুনিতে পাইল যে, তাহার প্রভু লক্ষ্ণৌ নগরে আছেন; এই সংবাদ পাইয়া শিশুটীকে লইয়া সেখানে গেল এবং তাঁহাদিগের ছেলে তাঁহাদিগকে দিয়া আসিল। তাহার শরীর তখনও সুস্থ হয় নাই এই জন্য সে নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে চাহিল; বিদ্রোহ শান্তি হইলে তাহাকে পুরস্কার করিবেন এই বলিয়া তাহার প্রভু তাহাকে তখন বিদায় দিলেন। কিন্তু সেই বিদ্রোহের সময়ই তাহার প্রভু ও তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্ণৌ নগরে হত হন, এবং ঐ শিশুটী অন্যান্য অনাথ সন্তানের সঙ্গে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

(কুসঙ্গের দোষ।)

সৎসর্গ মানবের একটী প্রধানতম অঙ্গ। সংসর্গ ব্যতীত মানব, মানব সমাজের যোগ্য হইতে পারে না। হস্ত পদাদি প্রত্যেক অঙ্গ যেরূপ আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় এবং যাহাদের একটীর অভাবে আমাদের অত্যন্ত কষ্টে নিপতিত হইতে হয়, সেইরূপ সংসর্গের অভাব হইলেও আমরা একাকী পড়িয়া অত্যন্ত কষ্টে পতিত হই; এসংসারে কেহই একাকী থাকিতে ভাল বাসে না, সঙ্গ লাভের ইচ্ছা মনুষ্য মাত্রেরই আছে। মনুষ্যের স্বভাব দেখিলেই প্রতীতি হয় যে, সে একা থাকিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। আমরা অহরহ বহু পরিজন মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকি এবং যখন যাহার নিকট গেলে সুখী হইব বলিয়া মনে করি তখনই তৎসমীপে গমন করিতে সক্ষম হই। এজন্য একাকী থাকা কতদূর কষ্টকর তাহা সহজে অনুভূত হয় না। কিছুকাল নির্জ্জনে বাস করিলেই আবার পুনরায় আমাদের স্বজন- বাসের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে। বহুকাল একাকী অবস্থান করিলে মনে যে গুরুতর কষ্ট হয় তাহার সহিত অন্য কোন কষ্টের তুলনা হইতে পারে না। সঙ্গ লাভের ইচ্ছা মনুষ্যের এত প্রবল যে, যখন অপর মনুষ্যের সহিত মিলিত হওয়া একান্ত অসম্ভব হয় তখন কোন ইতর প্রাণীর সহিত সম্মিলিত হইতে পারিলেও বহু পরিমাণে সচ্ছন্দ অনুভূত হয়। ইহার একটী গল্প আমরা ইংরাজী পুস্তকে অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

পেরিস নগরীতে বেছটাইল নামক একটী বৃহৎ দুর্গ ছিল তথায় বন্দীসমূহ রক্ষিত হইত। তথায় কোন সময় লেটিউত নামক জনৈক বন্দী রক্ষিত হইয়া ছিল। তিনি তথায় সঙ্গী শূন্য হইয়া কোন এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়া ছিলেন কিন্তু তথায় তিনি জেল রক্ষক ব্যতীত কাহাকেও দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ঐ কুটীরে একটী রন্ধ্র প্রবিষ্ট কিঞ্চিৎ আলোক ব্যতীত আর কোন আলো আসিত না। তিনি একদা ঐ সুরঙ্গ মধ্যে একটী ইঁদুর দেখিতে পাইলেন এবং

উহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে কেমন এক প্রকার তৃপ্তি উপস্থিত হইল যে, তিনি উহাকে তাঁহার নিকটে আসিবার জন্য আহারীয় সামগ্রী দ্বারা উহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন, ক্রমে ঐ ইঁদুরটার ভয় হ্রাস হওয়ায় সে ঐ বন্দীর নিকট আসিয়া তাহার আহারীয় পাত্র হইতে আহারীয় দ্রব্য লইয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। এবং এইরূপ ক্রমে ক্রমে তিনি চতুর্দ্দিকে ১০।১২টী ইঁদুর কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে তিনি তাহার বন্ধন যন্ত্রনা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি তাহার মুক্তির বিষয় মনেও ভাবিতেন না। ইহার পর যখন তিনি জেল রক্ষকের আজ্ঞা ক্রমে অন্য কোন কুঠরীতে নীত হইয়া তাঁহার সঙ্গী সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে বন্ধন যাতনার কষ্ট অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! ইঁদুর মানুষের ভাব কিছুই অনুভব করিতে পারে না এবং মনুষ্যের সহিত তাহার কোন ও প্রকার সহানুভূতি হওয়াই সম্ভাবনা নাই; তথাপি আসঙ্গ লিপ্সার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বন্দী স্নেহশীল বন্ধুর ন্যায় তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সংসর্গ দ্বিবিধ; সৎসংসর্গ ও কুসংসর্গ। কুসংসর্গের অপকারীতাই প্রবন্ধের মূল বিষয়। বিশুদ্ধ এবং পবিত্র স্বভাব বিশিষ্ট শিক্ষিত লোকদিগের সঙ্গকেই সৎসংসর্গ বলা যাইতে পারে। সৎসংসর্গই লোকের শিক্ষা লাভের মূল কারণ; এবং সেই শিক্ষাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শিক্ষাই জীবনের হিত সাধক ও মহোপকারী। শিক্ষাই মানুষের যাবতীয় উন্নতির মূল। অশিক্ষিতের হৃদয় আকর নিহিত অপরিষ্কৃত প্রস্তরবৎ। ঐরূপ শ্রীহীন প্রস্তর সুচারুরূপে গঠিত, পরিষ্কৃত ও পরে মার্জ্জিত হইলে যেমন উজ্জ্বল ও রমণীয় হয় তদ্রূপ শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যের লুক্কায়িত মানসিক শক্তি পূর্ণ বিকসিত এবং প্রকৃতি সুগঠিত ও মধুর হয়। ইংরাজিতে একটী কথা আছে "used key is always bright" ব্যবহার্য্য চাবী সর্ব্বদাই উজ্জ্বল হইয়া থাকে অর্থাৎ সৎসংসর্গরূপ উপযুক্ত শিক্ষা এবং চালনা ব্যতীত মানবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয় কখন বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞান শিক্ষা সংসর্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কেবল জ্ঞান শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। শিক্ষায় মনুষ্যের মন যেমন জ্ঞানে উন্নত হইবে, সেইরূপ গুণে বিভূষিত হইবে; স্বভাব যেমন উন্নত ও দৃঢ় হইবে সেইরূপ গুণে বিভূষিত হইবে। জ্ঞানে যিনি উন্নত হইয়াছেন অথচ চরিত্রে সাধু হন নাই তিনি মূর্খেরও অধম। বাস্তবিক যাবতীয় মানসিক শক্তির পূর্ণ ও স্বাভাবিক বিকাশ এবং চরিত্রের সাধুতা ও সৌন্দর্য্য সম্পাদনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত হইতে পারে; উন্নত সমাজে উন্নত পরিবারে বাস করিলে গ্রন্থাদি পাঠ ব্যতীতও মানসিক উন্নতির সুশিক্ষার বহুপরিমাণে অধিকারী হওয়া যায়; যাহারা সাধু ও সৎসঙ্গে বাস করেন তাহাদিগকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা না দিলেও তাহারা বহুপরিমাণে সুনীতি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। অবস্থার বিপাকে পড়িয়া কত কত ধার্ম্মিক ও মহাজন, কত বীর ও বিজ্ঞানবিদ, কত জ্ঞানী ও গুণী, ইতর আলয়ে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাদের ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। নিয়মিত শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে চিরকালের জন্য গভীর তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। সংসর্গ লোকের পরীক্ষা স্থল। যাহার যেরূপ রুচি সে সেরূপ দলে ভুক্ত হয়; যাহারা সৎ তাহারা

সজ্জনের সংসর্গ ত্যাগ করে না। এবং যাহারা দুশ্চরিত্র তাহারাও কখন অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে না। সাধারণতঃ সদ্বিষয় অপেক্ষা অসদ্বিষয়ে মনুষ্যের মন অধিক আকৃষ্ট করে, কাজেই কুনীতি সহজে শিক্ষা হয়। এজন্য অসৎ লোক সজ্জনের সহিত সমাগম করিলেও তাহাদের চরিত্র সহজে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কিন্তু সৎলোক অধিক দিন কুসঙ্গে বাস করিলে কুজনের দোষরাশী সহজেই তাহাদের অভ্যস্থ হইয়া উঠে। * * * * * * * * * * কুসঙ্গে থাকিলে যেরূপ দুর্দ্দশায় পড়িতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য একটী ঐতিহাসিক ঘটনা এস্থলে লিখিত হইতেছে। হিন্দু দিগের রাজত্বের পর দিল্লীতে পাঠান বংশীয় রাজার রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই পাঠান-বংশীয় মুসলমানদের মধ্যে কৈকোবাদ নামে এক ব্যক্তি এক সময় দিল্লীর অধিপতি ছিলেন। যখন কৈকোবাদ দিল্লীর বাদসাহ হইয়াছিলেন তখন তাহার বয়ক্রম অষ্টাদশ বৎসর ছিল। নিজাম নামে কৈকোবাদের এক প্রধান মন্ত্রী ছিল। ইহার চরিত্র সাতিশয় মন্দ ছিল। এই মন্দ লোকের সংসর্গ দ্বারা কৈকোবাদের চরিত্র দূষিত হইয়া যায়। কৈকোবাদ কুচরিত্র নিজামের পরামর্শে অল্প বয়সে মদ্য পানাদি নানাপ্রকার পাপকার্য্যে এত আসক্ত হন যে,শীঘ্রই তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে। কৈকোবাদের পিতা বখর খাঁ এই সময় বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তেজস্বিতা ও সৎ-স্বভাবের জন্য তাহার সুখ্যাতি ছিল। পুত্র কুসংসর্গে পড়িয়া খারাপ হইয়া যাইতেছে শুনিয়া তাঁহাকে সদুপদেশ দিবার জন্য দিল্লীতে আসিলেন। এদিকে কুমন্ত্রী নিজাম কৈকোবাদকে পরামর্শ দিল যে, বাঙ্গলার নবাব দিল্লীর বাদসাহের অনুমতি ব্যতীত সৈন্য লইয়া দিল্লীতে আসিয়াছে, সুতরাং সে রাজবিদ্রোহী; তাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কৈকোবাদ কুমন্ত্রীর কুহকে মুগ্ধ হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন, বখর খাঁ পুত্রের এই ভাব দেখিয়া তাঁহাকে লিখিলেন, "বৎস! যুদ্ধ করিতে হয়, পরে করিও, আমি অগ্রে তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" কৈকোবাদ পিতার এই পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কুমন্ত্রী নিজাম তাঁহাকে এই পরামর্শ দিল যে, কৈকোবাদ রাজ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া,সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন, বখর খাঁ সামান্য ভৃত্যের ন্যায় সেলাম করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। বখর খাঁ কি করেন, রাজসভায় আসিয়া ভূমিষ্ট হইয়া পুত্রকে তিন বার সেলাম করিলেন। এরূপ অবস্থাতেও কৈকোবাদ সিংহাসনে রহিয়াছেন দেখিয়া, বখর খাঁ নিতান্ত দুঃখ বোধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৈকোবাদ পিতাকে কাঁদিতে দেখিয়া, সিংহাসন হইতে নামিয়া তাঁহার পা ধরিতে গেলেন, বখর খাঁ পুত্রকে এই কার্য্য করিতে নিরস্ত করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার গল দেশ ধারণ করিলেন। তখন পিতা পুত্র উভয়েই শোকে অধীর হইয়া, অনবরত অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। সভাস্থ লোক ইহা দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। কৈকোবাদ সমুচিত সম্মানও আদর করিয়া পিতাকে নিজের সিংহাসনে বসাইলেন। পিতা পুত্রে অনেকক্ষণ আলাপ হইল। অনন্তর বখর খাঁ কয়েক দিন নির্জ্জনে বসিয়া পুত্রকে সৎপথে আসিতে অনেক উপদেশ দিলেন। কৈকোবাদ

প্রকৃত পক্ষে বড় সরল ও কথার বাধ্য ছিলেন। কেবল দুষ্ট স্বভাব নিজামের সংসর্গে থাকাতে তিনি নানাপ্রকার গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে পিতার সৎপরামর্শে তাঁহার স্বভাব শুধরাইতে লাগিল। তিনি পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কখনও নিজামের কথা শুনিবেন না; এবং তাহার কথায় কুকর্ম্মে রত হইবেন না। বখর খাঁ পুত্রের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার রাজ্যে গমন করিলেন। বখর খাঁ বাঙ্গলায় চলিয়া গেলে, নিজাম সুযোগ পাইয়া, আবার কৈকোবাদকে নানাপ্রকার কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। কৈকোবাদ কুমন্ত্রীর সংসর্গে পড়িয়া আবার দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বদা পাপকার্য্য করাতে শীঘ্রই কৈকোবাদের পক্ষাঘাত রোগ হইল। এদিকে রাজ্যে নানা প্রকার গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। এই গোলযোগের সময় একদল লোক প্রবল হইয়া, কৈকোবাদের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লইল।

দেখুন! কৈকোবাদ দিল্লীর বাদসাহ ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও কেবল কুসংসর্গে পড়িয়াই, তরুণ বয়সে তাহার কি পরিণাম হইল? সর্ব্বদা সৎসংর্গে থাকা উচিত। কুসংসর্গে থাকিয়া আপনার অনিষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে।

অপরিণত বয়সে লোকের অনুকরণ-প্রিয়তা প্রবল ও কার্য্যক্ষম থাকে কিন্তু পরিণত বয়সে সেরূপ থাকে না। শিশু স্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে মাতার প্রকৃতি অধিকার করে ও তাহার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে, বালক সমবয়স্ক সহচর দিগের রীতি পদ্ধতি গুণ দোষ চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিয়া তদনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। যুবক বন্ধুমণ্ডলীর চরিত্র ও ব্যবহার দেখিয়া স্বীয় চরিত্র সংগঠন করে; জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাত সারেই হউক তাহাদের প্রকৃতি ও আয়ত্ত করে। কিন্তু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে তেমন নহে। বস্তুত অপরিণত বয়সেই অনুকরণ ইচ্ছা ও অনুকরণ ক্ষমতা অধিকতর প্রবল থাকে। মোম দ্বারা যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ প্রতিমূর্ত্তি অনায়াসে গঠন করিতে পারা যায়, অল্প বয়সে যখন মন কোমল থাকে তখন তাহাকে যে পথে ইচ্ছা সেই পথে অনায়াসে চালিত করা যায়। এবং ভাল মন্দ যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ চরিত্র অনায়াসে সংগঠিত হইতে পারে, অতএব বাল্যকাল হইতে যাহাতে কোন কুব্যবহার অভ্যস্ত হইতে না পারে বরং অন্তঃকরণ নানা মনোহর গুণগ্রামে শুশোভিত হইতে পারে তৎপক্ষে প্রত্যেককেই একান্ত যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব ছেলে বেলা হইতেই লোকের কুসঙ্গ পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং সৎসঙ্গে থাকা বিধেয়।

শ্রীললিতকুমার বসু, বরিশাল।
বয়স ১৫ বৎসর।

চীনের কথা।

তোমরা গত বৎসরের "সখা"য় চীন দেশের গল্প পড়িয়াছ। চীনের লোকেরা ছেলে মেয়ের প্রতি কিরূপ যত্ন করে, ছেলেবেলা হইতে তাহাদের কাঁধে কিরূপ কাজের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়—

তাহা তোমরা শুনিয়াছ। ছেলেরা কিরূপে সারাদিন স্কুলে থাকে, মাষ্টার মহাশয় কেমন আফিম খাইবার নল এবং থলে হাতে করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন তাহাও দেখিয়াছ। চীন দেশের লোকগুলি দেখিতে কেমন, তাহাদের বাড়ী ঘর কেমন, তাহাদের কিরূপ আবার ব্যবস্থা ইহা কি তোমাদের শুনিতে ইচ্ছা হয় না? কোন দেশের কিম্বা লোকের বিষয় একটু কিছু জানিলে আরো বেশী জানিতে ইচ্ছা হয়। তাই তোমাদিগকে আজ চীন দেশীয় লোকেরা দেখিতে কেমন সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

আমাদের দেশে যেমন এক এক জনের এক এক রকম বর্ণ তাহাদের তাহা নয়। আমাদের দেশে হয়ত তিন চারিজন ভাইবোন তিন চার রকম রঙের। কেহবা মিচ্‌মিচে কাল, কেহবা আধময়লা, কেহবা একটু কাল এইরূপ পাঁচ রকমের পাঁচ জন দেখা যায়। কিন্তু চীন দেশে সে রকম নয়। সেখানে সকলেরই এক রকম রঙ্; কেবল তাহাই নহে দেখিতেও প্রায় সকলেই এক রকম; হঠাৎ দেখিলে কোনরূপ প্রভেদ বুঝা যায় না। সকলেরই চ্যাপ্টা মুখ, খাঁদা নাক এবং মিট্‌মিটে ছোট ছোট চোখ। আমাদের চাইতে তাহাদের রঙ্ অনেক ফরসা এইজন্য কলিকাতায় তাহাদিগকে সামান্য লোকেরা "চীনে সাহেব" বলিয়া থাকে। রঙ্ ফরসা বলিয়া চীনেরা সুন্দর নহে। ছেলেবেলা তাহাদিগকে বেশ সুন্দর দেখায়, কিন্তু যতই বয়স বাড়ে ততই মুখ ক্রমে চ্যাপ্টা হইতে থাকে এবং আকৃতি কদাকার হইয়া উঠে। বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা নিতান্ত কুৎসিৎ হয়।

চীনেদেব দুই একটী অতিশয় হাস্যকর প্রথা প্রচলিত আছে। তাহারা মনে করে এইরূপে তাহাদিগকে অতি সুন্দর দেখায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা আরও কদাকার হয়। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বাম হাতের নখ রাখিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে ইহা পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। এই নখ রাখা অতিশয় সম্মানজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়; কারণ যাহারা শারীরিক পরিশ্রম ও কঠিন কার্য্য করে তাহারা নখ রাখিলে তাহা ভাঙ্গিয়া যায় এই জন্য দরিদ্র লোক এবং শ্রমজীবিরা তাহা রাখিতে পারে না। বড় বড় নখ থাকিলেই বুঝা যায় যে,তাহারা ভদ্র লোক এবং কোন হীন কাজ করে না। আমাদের দেশে ও মাঝে মাঝে লোকে তারকেশ্বরের কিম্বা অন্য কোন দেবতার নামে নখ ও চুল মানস করে। বড় বড় নখ রাখিলে হয়ত হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং তাহা হইলে বড় কষ্ট পাওয়া যায়; চীনেরা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নখের দুই পার্শ্বে দুই খণ্ড বাঁসের বাখারি দিয়া বাঁধিয়া রাখে।

ইহা অপেক্ষা আর একটী প্রথা অতিশয় কষ্টদায়ক। তোমরা হয়ত শুনিয়াছ চীনেদের মেয়েদের পা অতিশয় ছোট। তাহাদের ছোট পা সৌন্দর্য্যের প্রধান চিহ্ন বলিয়া মনে করা হয়। সকল দেশেই এ রকম কোন না কোন কুসংস্কার আছে। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা কোমর সরু করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করে। আমাদের দেশেও যে মেয়েদের মধ্যে দুই একটি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার নিয়ম নাই তাহা নহে। তবে চীন দেশীয়দের এইরূপে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অনেক আড়ম্বর করিতে হয়। কিরূপে তাহারা পা ছোট করে তাহা শুনিতে অতি অদ্ভুত। যখন মেয়েদের তিন চারি কিম্বা পাঁচ বৎসর বয়স হয় তখন এই মহৎ ব্যাপারের

অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই ব্যাপার শেষ হইতে প্রায় দুই তিন বৎসর সময় লাগে এবং সেই সমস্ত সময় সুন্দরীরা অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। পা বাঁধিবার জন্য চীন দেশে এক-রকম সাদা রাঙা ব্যাণ্ডেজ (পুলটিস) কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ দুই ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ৮ হাত লম্বা। ইহা দ্বারা পা বাঁধিবার পূর্ব্বে ফিটকিরির গুড়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়, কারণ তাহা হইলে পরে কোন রূপ ফোঁড়া কিংবা ঘা হইতে পারে না। পা এত শক্ত করিয়া বাঁধা হয় যে প্রায় একখানা পাকে মাঝখানে ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ করা হয়। ইহাতে রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং পা আর বড় হইতে পারে না। ইহাতে কি কষ্ট হয় তাহা একবার অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়; কিন্তু তবু সুন্দরী হইবার এত প্রবল ইচ্ছা যে চীনের বালিকারা ইহা অম্লান বদনে সহ্য করে।

এইরূপ প্রায় একমাস কাল পা বাঁধা থাকে। একমাস পরে এইরূপ বাঁধা পা দুইখানাকে খুব গরম জলে অনেকক্ষণ ডুবাইয়া রাখা হয়। তখন পুলটিসটি আস্তে আস্তে খুলিয়া ফেলিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পায়ের এক পরদা মরাচাম উঠিয়া যায়। এই সময়ে কাহারো কাহারো পায়ের তলায় কতকগুলি মাংস অথবা দুই তিনটি আঙ্গুল ও খসিয়া পড়ে।

যখন পা জলে ভিজিয়া যায় তখন বেশ করিয়া পুছিয়া ফেলা হয়। তাহার পর আবার কিছু ফিটকিরির গুড়া ছড়াইয়া ৫ ফুট লম্বা নূতন এক পুলটিস দ্বারা পা বাঁধা হয়। এবারকার বাঁধা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক শক্ত হয়। ইহার পর স্ত্রীলোকেরা মাসে একবারের অধিক পা খুলে না। পা খুলিলে আর তাহারা হাটিতে পারে না এবং ভয়ানক যন্ত্রণা হয়।

যখন প্রথম এইরূপে পা ছোট করিবার জন্য ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা হয় তখন প্রথম প্রথম তিন চারি মাস ভয়ানক যন্ত্রণা থাকে। কেহ কেহ বা এক বৎসর কালও এই যন্ত্রণা ভোগ করে। সারাদিন রাত্রিতে একটুও শান্তি নাই, যেন কেহ ছুঁচ বিঁধাইয়া দিতেছে। এইরূপে ক্রমে যখন পা অবশ হইয়া যায়, তখন আর কিছু বোধ হয় না। কিন্তু উহা চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য ও কদাকার হইয়া থাকে। তোমরা হয়ত মনে করিতে পার যে চীনের বালিকারা এই ভয়ানক কার্য্য করিতে ভীত হয় কিন্তু তাহা নহে; আমাদের দেশে যেমন অলঙ্কার পরিবার সাধে মেয়েরা অক্লেশে নাক ও কাণ বিঁধাইতে পারে সেখানেও মেয়েরা সুন্দরী হইবার অভিলাষে নিজেরাই পায়ের ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া থাকে।

এইরূপ ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা পা যেমন অকর্ম্মণ্য হয় তেমনই কদাকার হয়। যে বালিকার চিত্র দেওয়া হইতেছে তাহার পায়ের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। চীনের খ্রীষ্টান পাদরীরা এই কুপ্রথা উঠাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু বড় কৃতকার্য্য হন নাই, কারণ চীনদিগকে একথা বলিলে তাহারাও বলে "কেন বাপু, তোমাদের মেয়েরাও ত কোমর সরু করিবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করে; তবে আর আমাদের দোষ কি?" পাদরী সাহেবেরা তখন মুখ ফিরাইয়া ঘরে আসেন। নিজের দোষ থাকিলে পরের দোষ সংশোধন করা বড়ই কঠিন। একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। অতএব যাহারা জীবনে কোন সৎ-

কার্য্য করিতে চাহে তাহাদের বাল্যকাল হইতেই আপনাদিগের সৎপথে চালাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

চীন দেশের বালক এবং পুরুষেরা সকলেই পশ্চাতে একটী বেণী মাত্র রাখিয়া মাথার আর সমুদয় চুল ফেলিয়া দেয়। তাহারা দাড়ি গোঁফ ও প্রায় রাখে না। তবে কোন কোন স্থানের লোকেরা চল্লিশ বৎসর পরে গোঁফ ও ষাটি বৎসরের পর দাড়ি রাখিয়া থাকে। সকলেই এক একটী বেণী রাখিয়া থাকে। যখন চীনেরা মৃত ব্যক্তিদিগের জন্য শোক প্রকাশ করে তখন মস্তকের সকল স্থানেই চুল রাখিয়া থাকে।

বেণী কাটিয়া দেওয়া চীনদের মতে ভয়ানক অপমানের কথা। এই উপায়ে চোরদিগকে মধ্যে মধ্যে সাজা দেওয়া হয়। চীনদেশীয় কৃষক ও শ্রমজীবীরা যখন কাজ করিতে যায় তখন পাগড়ীর মত মাথার চারিদিগে বেণী বাঁধিয়া থাকে।

চীন দেশীয় স্ত্রীলোকেরা অতি আশ্চর্য্যরূপে চুল বাঁধিয়া থাকে। এক এক জনের চুল বাঁধিতে দুই চারি ঘণ্টার কমে হয় না। ইংরেজেরা চুল ঠিক রাখিবার জন্য পোমেটাম ব্যবহার করে, আমাদের মেয়েরা পোমেটামের কথা শুনিবার আগে মোম ব্যবহার করিতেন এখনও হয় ত পাড়াগাঁয়ে কেহ কেহ সেই পূর্ব্ব প্রকারের অনুসরণ করিয়া থাকেন। চীন দেশীয় স্ত্রীলোকেরা এক রকম গাছের আটা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা তাঁহারা নানা সময়ে চুলের নানা রকম আকৃতি করিয়া থাকে। কখনও ফুলদান কখনও বা পাখীর মত এবং কখনও বা অন্য কোন রকমের আকৃতি করিয়া চুল বাঁধা হয়।

ইহারা সুন্দর দেখাইবার জন্য মুখ সাদা ও লাল রঙে চিত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে বরং আরও বিশ্রী দেখায়। সুন্দর দেখাইবার ইচ্ছা সকলেরই আছে, কিন্তু সে ইচ্ছা যখন অস্বাভাবিক হয় তখন লোককে সুন্দর না করিয়া

বরং কুৎসিত করে। ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, প্রকৃতির যাহা নিয়ম তাহা অতিক্রম করিলেই লোক অস্বাভাবিক ও কুৎসিত হইয়া পড়ে। চীনেরা যদি অস্বাভাবিক উপায়ে পা ছোট না করিত এবং মুখ চিত্রিত না করিত তবে তাহাদিগকে সুন্দর দেখা যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের অতি সুন্দর হইবার ইচ্ছাই তাহাদিগকে অতিশয় কুৎসিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে কি আমাদের কিছু শিক্ষা করিবার নাই?

অতি লোভের শাস্তি।

(সত্য ঘটনা।)

কলিকাতার পনর ষোল ক্রোশ দূরে কোন পল্লীগ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের বিদ্যাসাধ্য কিছুই ছিল না কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াতে ছেলেপিলে অনেক গুলি হইয়াছিল। সন্তানগুলি সকলেই বুদ্ধিমান কিন্তু ব্রাহ্মণের এমন ক্ষমতা ছিল না যে কোনটিকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা দেন; ভাত যুটে ত কাপড় যুটেনা এই প্রকার অবস্থা। বড় ছেলেটি ১৩। ১৪ বৎসরের ছেলে হইয়া উঠিল তথাপি পড়াশুনার কোন বন্দোবস্ত হইল না। অমূল্য সময় বৃথা বহিয়া যাইতে লাগিল। ছেলেটী এক এক বার একখানি সংস্কৃত পুথী হাতে করিয়া এক একবার ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাটিতে গিয়া বসিত আর অধিকাংশ সময় ঘুড়ি উড়াইয়া, মাছ ধরিয়া, পাখীর ছানা চুরি করিয়াও গৃহস্থের গাছের ফল পাকড় পাড়িয়া বেড়াইত। যতই বয়স বাড়িতে লাগিল ছেলেটীর লেখাপড়া শিখিবার বাসনা ততই প্রবল হইতে লাগিল। সে চাহিয়া চিন্তিয়া কয়েকখানি পুস্তক সংগ্রহ করিল, তাহা লইয়া স্কুলের বালকদিগের নিকট গিয়া পড়া বলিয়া আনিত ও যথাসাধ্য শিখিবার চেষ্টা করিত।

ঐ দরিদ্র বালকটীর একজন আত্মীয় ব্রাহ্মণের কলিকাতার দক্ষিণ বর্ত্তী ভবানীপুর নামক স্থানে একখানি টোল চতুষ্পাটী ছিল। তিনি বালকটীর শিক্ষার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়া তাহাকে নিজ টোলে যায়গা দিতে স্বীকৃত হইলেন। বালকটী ভবানীপুরে আসিল। তখন কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানদিগকে ১৲টাকার অধিক বেতন দিতে হইত না। একজন দয়ালু লোক মাহিনার টাকাটী দিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন বালক আনন্দের সহিত কলেজে ভর্ত্তি হইল। কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ ভবানীপুর হইতে ২॥ ক্রোশ তিন ক্রোশের কম হইবে না। বালকটী প্রত্যহ এই পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইত ও অপরাহ্ণে আবার হাটিয়া আসিত। ইহা ভিন্ন তাহাকে আশ্রয়দাতার সাহায্যের জন্য তাহার যজমান বাড়ীতে নিত্য পূজা করিতে হইত ও রাত্রে ঠাকুরদের আরতি করিতে হইত। ইহাতে সেই বালকের এত সময় যাইত যে, সে আর দুবেলা আহার করিবার সময় পাইত না; রাত্রে একবার রাঁধিত প্রাতে সেই পান্তভাত খাইয়া স্কুলে যাইত। এইরূপ নিত্যই যাইত।

এইরূপ কয়েক বৎসর কাটিয়া গেলে একজন আত্মীয় লোক দয়া করিয়া কলিকাতার বাসায় তাহাকে স্থান দিতে সম্মত হইলেন। বালকের দুঃখ ঘুচিল। সে কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা

করিতে লাগিল। কিন্তু ওদিকে তাহার আরও অনেকগুলি ভাই ভগিনী জন্মিয়াছে এবং ভাই গুলি বড় হইতেছে। বেচারাকে জনক জননীর সাহায্যের জন্য প্রাইভেট পড়াইয়া কিছু কিছু টাকা বাড়ীতে পাঠাইতে হইত; সমুদায় সময় পড়াতে মন দিতে পারিত না। এইরূপ করিয়া অতি কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। তখন সংস্কৃত কালেজের যে শ্রেণীতে উঠিলে বৃত্তির পরীক্ষা হইত সে অনেক কষ্টে সেই শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিল। ভাবিয়াছিল যে সেই শ্রেণীতে একটি বৃত্তি পাইবে তাহা হইলে আর তাহার পড়ার বিঘ্ন ঘটিবে না। পড়া শুনাও চলিবে এবং পিতা মাতাকেও কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পরীক্ষাতে সে কৃত কার্য্য হইতে পারিল না। ওদিকে পিতা মাতা তাহারও বিবাহ দিয়াছেন এবং একটি সন্তানও জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া এই বয়সেই লেখা পড়া সাঙ্গ করিতে হইল।

ক্রমশঃ

নববর্ষের সঙ্গীত।

(১)

বরষে বরষে দিবসে দিবসে
নিমেষে নিমেষে সময় যায়;
তাহার তরঙ্গে নানা রঙ্গ ভঙ্গে
জীবন প্রবাহ ছুটিয়া ধায়।

(২)

কোথায় কে ছিল কোথায় আসিল
কিছুই বুঝিতে পারি না ভাই;
সময়ের গতি, সুগভীর অতি
ধরিতে ছুঁইতে নাহিক পাই।

(৩)

অজ্ঞান আঁধার রাখি সবাকার
জগতের পতি করুণাময়;
করেন পালন মায়ের মতন
জীবনে মরণে তাঁহারি জয়।

(৪)

প্রকৃতির মাঝে নব নব সাজে
দেন দেখা তিনি মানব গণে;
যেন বাজীকর বহু গুণাকর
করেন বিহার আনন্দ মনে।

(৫)

নূতন বরষে নূতন হরষে
নবীন বালক বালিকা সবে;
সেই জননীরে, চারি দিকে ঘিরে
কর জয় গান মধুর রবে।

(৬)

ঐ দেখ কত ফল ভরে নত
নবপল্লবিত পাদপরাজী;
নমিছে ঈশ্বরে সমীরণ-ভরে
নবীন কুসুম ভূষণে সাজি।

(৭)

মলয় বাতাসে সুনীল আকাশে
ভাসিছে নবীন নীরদ রাশি;
তরু কুঞ্জবনে মা বাপের সনে
নবজাত পাখী বসিল আসি।

(৮)

যাঁহার কৃপায় মৃত প্রাণ পায়,
সাজে সবে নিত্য নবীন বেশে;
তিনি চির নব প্রেমরসার্ণব,
তাঁহার বিভব দেখ হে এসে।

পঞ্চম ভাগ। পঞ্চম সংখ্যা।

মে, ১৮৮৭।

পাখীদের দেশ ভ্রমণ।

খার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি কখন লক্ষ্য করিয়াছ যে, শীত ও বসন্ত কালে এমন কতকগুলি পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি গ্রীষ্মকালে আর দেখা যায় না? বৈশাখ মাস শেষ হইয়াছে, এখন আর বাড়ির উঠানে, প্রশস্ত রাস্তার মাঝখানে খঞ্জন পাখী নেচে নেচে বেড়ায় না। আঁব, কাঁটালের বাগানে, ঝোঁপে, জঙ্গলে আর হুদ্‌হুদ্, কচ্ কচে প্রভৃতি পাখীর ডাক শুনিতে পাওয়া যায় না। মাঠে, ঘাটে, কিম্বা ধান্যক্ষেত্রে নানা বর্ণের নানা প্রকার হাঁস, টিল্, মুনিয়া প্রভৃতি পাখী সকল মনের সুখে আর চরিয়া বেড়ায় না। বসন্ত কাল অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও কোকিল ও পাপিয়ার মিষ্ট রব এক আধ বার শুনিতে পাওয়া যায়, কিছু দিন পরে আর তাহাদের গান শুনিতে পাইব না। কলিকাতা এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে, এখন ঝাঁকে ঝাঁকে চিল দেখা যায় কিন্তু বর্ষা আসিলে উহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে, তখন দুই একটা এখানে ওখানে দেখা যাইবে মাত্র। কলিকাতায় আজ কা'ল হাড়গিলা পাখী একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আর কিছুদিন পরে অনেক আসিয়া উপস্থিত হইবে। খঞ্জন, হাঁস, প্রভৃতি পক্ষীরা এখন কোথায় গিয়াছে? চিলেরা কোথায় যাইবে? ইহারা কেনই বা যায় আর কেনই বা আসে, এই সকল বিষয় তোমরা কি কখন অনুসন্ধান করিয়া থাক?

তোমরা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছ যে, আমাদের দেশের বড় লাট, ছোট লাট প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ শীতের কয়েক মাস মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলেই শিম্‌লা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া থাকেন এবং গ্রীষ্মের কয়েক মাস সেই খানেই বাস করেন। শীত আসিতে না আসিতে আবার এদেশে ফিরিয়া আসেন। কি জন্য তাঁহারা পাহাড়ে যান তা তোমাদের মত বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী পাঠক পাঠিকাকে বলিয়া দিতে হইবে না। তাঁহারা শীত প্রধান দেশের লোক, একেত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাকাই তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর, তাহাতে আবার গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে তাঁহাদের পক্ষে এদেশে বাস করা আরও কষ্টকর, এমন কি অসাধ্য হইয়া উঠে। কাযে কাযেই তাঁহারা গ্রীষ্মকালটা এমন কোন স্থানে বাস করেন যেখানকার জল বায়ু অনেক অংশে তাঁহাদের স্বদেশের জল বায়ুর মত। এই সকল বড়

বড় কর্ম্মচারীদিগের যথেষ্ট সুবিধা আছে বলিয়াই তাঁহারা কখন পর্ব্বতে কখন এদেশে বাস করিতে পারেন। যখন আমরা গ্রীষ্মের জ্বালায় ছট্ ফট্ করি তখন কি আমাদের কোন শীতল স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা হয় না? পৌষ, মাঘ মাসের শীতে শরীর যখন কাঁপিতে থাকে তখন কি আমরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না? আমাদিগের ইচ্ছা হইলেও সুবিধা নাই, কাযেই শীত ও গ্রীষ্মে কষ্ট পাইলেও তাহা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু পক্ষীরা ত আমাদের মত নয়, তাহারা স্বাধীন, তাহাদিগের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সুবিধাও যথেষ্ট, এক দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে যাওয়াও তাহাদিগের পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। আমরা শীতকালে যে সকল পক্ষী দেখিতে পাইতাম আর এখন তাহাদিগকে দেখিতে পাই না—তাহারা সকলেই বেশী গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারে না বলিয়া শীত প্রধান দেশে চলিয়া গিয়াছে।

এখন তাহারা যেখানে বাস করিতেছে সেখানে শীত বেশী হইলেই আবার এদেশে ফিরিয়া আসিবে। কেবল যে শীত ও গ্রীষ্মের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই পক্ষীরা এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়ায় তা নয়, আহার অন্বেষণের নিমিত্তও সময়ে সময়ে তাহাদিগকে এক দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে যাইতে হয়। আহার খুঁজিয়া বেড়ান প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব। অতি প্রাচীন কালে যখন সমস্ত মানবজাতি অসভ্য ছিল, কাহারো ঘর দুয়ার ছিল না, তখন মানুষেও আহারের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইত। এখনও মধ্যআসিয়া নিবাসী অসভ্য জাতিরা তাহাই করিয়া থাকে। যখন দেখে যে, বাসস্থানের নিকট আর বড় একটা আহারোপযোগী বন্য পশু পাওয়া যায় না তখন অন্য এমন কোন স্থানে চলিয়া যায় যেখানে অন্ততঃ কিছু দিন আহারের ব্যাপারটা ভাল চলে। কিন্তু মানুষ বল, আর পশু বল, ইহাদের চলা ফেরার সুবিধা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। যাইবার রাস্তায় যদি একটি বৃহৎ নদী পড়িল তাহা হইলে মানুষের নৌকা চাই, না হইলে মানুষ আর এক পা চলিতে পারেন না, একটি উচ্চ পাহাড় সম্মুখে থাকিলে সেটি আর অতিক্রম করিবার যো নাই। অন্যান্য চতুষ্পদ পশুদিগের পক্ষেও তাই। হয় তো এক স্থানে শীত ও বাতাসে কষ্ট পাইতেছে, বরফ পড়িয়া সমস্ত প্রদেশ ঢাকিয়া গিয়াছে, একটি তৃণ নাই যে আহার করে, একশত ক্রোশ রাস্তা চলিয়া গেলেই সমস্ত কষ্ট দূর হয়, শীত ও বাতাস হইতে বাঁচে, যথেষ্ট আহার পায়, কিন্তু যাইবার যো নাই, সম্মুখে হয় তো একটি সমুদ্রের খাড়ি, কিম্বা একটি পাহাড়, পশু ভায়ার সাধ্য নাই যে, এ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যান। পক্ষীরা কিন্তু এ সকল বাধা বিপত্তি কিছুই মানে না, তাহাদের আবশ্যক হইলেই তাহারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে চলিয়া যাইতে পারে। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, হিমালয়ের মত উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিয়াও অনেক পক্ষী বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই বার আসা যাওয়া করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হাস, টিল প্রভৃতি জলচর পক্ষী আর মাঠে, ঘাটে, ধান্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। একবারেই যে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা বলিতে পারি না; দুই একটি স্থান বিশেষে থাকিতেও পারে, কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে আর দেখা যায় না। সখার পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকে হয় ত শীতের

ছুটিতে বাড়ী যাইবার সময় নদীর বালুকাময় চড়ায় নানা বর্ণের হাজার হাজার হাঁস বসিয়া থাকিতে দেখিয়া থাকিবেন। কতকগুলি হাঁস এক পা গুটাইয়া এক পায়ের উপর ভর দিয়া মাথাটি ডানাতে লুকাইয়া সুখে ঘুমাইতেছে; আবার কতগুলি ঐ বালুকাময় তটের নিকট নদীর নির্ম্মল জলে কেমন সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে কি সুন্দর! কি আমোদজনক! কিন্তু এবার গ্রীষ্মের ছুটির সময় কি হাঁসের ঝাঁক দেখিতে পাইয়াছিলে? নিশ্চয় দেখিতে পাওনি। আর কেমন করেই বা দেখিতে পাইবে, তারা কি আর এ দেশে আছে! এখন তাহারা মধ্য আসিয়ার নানা প্রদেশের নদী, হ্রদ, তড়াগে মনের সুখে বিচরণ করিতেছে। কোন কোন জাতীয় হাঁস আবার সায়বিরিয়া পর্য্যন্ত গিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন করিতেছে, বাসা নির্ম্মাণ হইলেই ডিম পাড়িবে। আবার শীত পড়িলেই ছানা গুলিকে সঙ্গে লইয়া এদেশে চলিয়া আসিবে।

অক্টোবর মাস আরম্ভ হইতে হইতেই মধ্য আসিয়ার মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত শীত পড়িতে থাকে, হাঁস প্রভৃতি জলচর পক্ষী সকল তখন ঐ প্রদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করে। ঐ সকল প্রদেশে এখন যত হাঁস বাস করিতেছে সবগুলিই যে এক দিনে চলিয়া আসে তাহা নয়। ক্রমে শীত ও যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে হাঁসেরাও তেমনি দলে দলে চলিয়া আসে। নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে যখন নদ, নদী, হ্রদ প্রভৃতি বরফে ঢাকিয়া যায় তখন আর একটি হাঁসও সেখানে থাকে না। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে আবার গিয়া জমা হয়। কর্ণেল প্রেজ ভ্লাস্‌কি নামক রুস দেশীয় একজন বিখ্যাত সৈনিক পুরুষ মধ্য আসিয়ার অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আপনার চোখে হাঁস জাতির গতি বিধি ও স্বভাব বেশ করিয়া দেখিয়াছেন।

হাঁসেরা যখন হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহারা প্রথমতঃ হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শীত প্রধান প্রদেশে সকলে বাস করে; ক্রমে যত শীত বেশী হয় তত বাঙ্গলা প্রভৃতি নিম্ন দেশে চলিয়া আসে। ইহারা আপন আপন বাসস্থান বেশ মনে করিয়া রাখিতে পারে, এবং প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা দল ছাড়া থাকে না। একটি হাঁসকে কিন্তু আশ্চর্য্য রকম দল ছাড়া হইতে দেখা গিয়াছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নানা জাতীয় অনেকগুলি হাঁস আলিপুর পশুশালার ঝিলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কয়েক দিন পরে তিন চারিটি হাঁস বড় ঝিল ত্যাগ করিয়া গণ্ডারের পুষ্করিণীতে গিয়া বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন এইখানে থাকিয়া হাঁস কয়েকটি কোথায় চলিয়া গেল কেহ খোজ খবর করিল না। ১৮৭৮সালে ডিসেম্বর মাসের প্রথম গণ্ডারের পুষ্করিণীতে একটি হাঁস খেলিয়া বেড়াইতে দেখা গেল, দেখিয়া বোধ হইল যে, যে কয়েকটি হাঁস চলিয়া গিয়াছিল এটি তাহাদের মধ্যের একটি, তৎকালে কিন্তু উহা বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করিল না, কারণ, আবার মার্চ্চ মাস আসিতে না আসিতেই হাঁসটি কোথায় অদৃশ্য হইল। পরবৎসর ২৭সে নবেম্বর পুনরায় ঐ হাঁসটি আসিয়া উপস্থিত। এইরূপ পাঁচ বৎসর কাল হাঁসটি শীতের সময় আসিত এবং গ্রীষ্ম কালে চলিয়া যাইত। বিগত তিন বৎসর হইল হাঁসটিকে আর দেখা যায় না। হয় তো কোন নিষ্ঠুর শিকারীর হাতে প্রাণ হারাইয়াছে কিম্বা কোন দলে মিশিয়া গিয়াছে।

হাঁসটির কেমন স্মরণ শক্তি এবং স্থান বিশেষের প্রতি ভালবাসা! হাঁসেরা যখন হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম কোণস্থিত গিরিশঙ্কট পার হইয়া যাওয়া আসা করে তখন কত শত হাঁস শীতে মরিয়া যায়।

পক্ষীদিগের স্থান পরিবর্ত্তনের বিষয় আরও অনেক বলিবার রহিল, আগামী বারে বলা যাইবে।

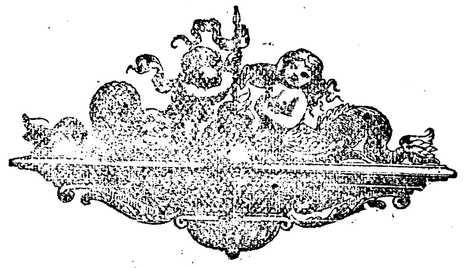

পিপীলিকার উপদেশ।

খন পিঁপড়ার বাড়ী আসিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। সেখানে যাইবামাত্রই বড় এক মজার যুদ্ধ দেখিলাম। একটা ক্ষুদ্র গুবরে পোকার সহিত বার তেরটা পিঁপড়ার যুদ্ধ বাধিয়াছে। বেচারা গুবরে পোকা একলা, তথাপি সে নির্ভয়ে অতি বীরত্বের সহিত বার তেরটা পিঁপড়ার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। আমি নিতান্ত উৎসুক-চিত্তে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল; অবশেষে গুবরে পোকারই জয় হইল, তাহার বীরত্বে চমৎকৃত হইয়া আমি করতালী দিয়া 'সাবাস সাবাস' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তাহার পর বাড়ীর ভিতর গিয়া আহারাদির পর কিছু ক্ষণ আমার বন্ধুর সহিত গল্প করিতে করিতে শরীরের ক্লান্তি প্রযুক্ত শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

রাতটা বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়াছিল, সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই; ভোর হইবামাত্র আমার বন্ধু আসিয়া আমাকে জাগাইল। এবং আমার খাবার জন্য এক টুকরা মিছরি লইয়া আসিল। আমার আহার সমাপ্ত হইলে পর পিঁপড়ে কিছু গম্ভীর ভাবে আমাকে বলিল, "ভাই আমি তোমাকে একটা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমাদের দলের লোকের সহিত গুবরে পোকার যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহাতে আমাদের দলের লোক হারিয়া যায় সেই জন্য তুমি গুবরে

পোকাকে 'সাবাস' বলিয়াছিলে, তাহাতে আমাদের উদ্ধত স্বভাব কতিপয় যুবক বড় চটিয়াছিল, দেখ আমাদের ছোঁড়ারা বড় গোঁয়ার, তাদের অগ্রপশ্চাৎ কোন বিবেচনা নাই, আর বড় অভিমানী, তাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, অনর্থক ঝগড়া বাধাইয়া কায কি?" আমার তখন মাকড়সার কথাগুলি সব মনে পড়িতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিলাম পরের ধানে মই দিতে যাওয়া বড়ই অন্যায়। আমার বন্ধুকে বলিলাম "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অতি সাবধানে তোমার ভাতৃবর্গের সহিত ব্যবহার করিব।" তাহার পর আমরা দুজনে পিঁপড়ের দেশ দেখিতে লাগিলাম, তাহাদের বাড়ী ঘর দুয়ার রাস্তা নগর সমস্তই দেখিতে লাগিলাম। ইহাদের নগরটী প্রকাণ্ড এক গাছের গুঁড়ির পাশে; অর্দ্ধেক মাটীর উপরে অর্দ্ধেক মাটির ভিতরে। ইহাদের রাস্তাগুলি মাটিতে সুড়ঙ্গ করা, ঘরগুলিও মাটি খুদিয়া তৈয়ার করা। মাটির উপরের অংশটী পিঁপড়েদের খুব পরিশ্রমের পরিচয় দেয়। মাটি দিয়া কেমন ছাত তৈয়ার করিয়াছে, ছোট ছোট খড়কুটা ও মাটি দিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ছোট ছোট ঘর করিয়াছে, সেগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনই পরিস্কার!

পিঁপড়ে বলিতে লাগিল "আমাদের এ নগর অতি প্রাচীন। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য যে কবে আরম্ভ হয় তাহা ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহই বলিতে পারে না ইহা কত দিনকার। তবে আমাদের ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপারের নির্দ্দেশ আছে। আমাদের দেশে কত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কত হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। আমরা যুদ্ধে কত বন্দী আনিয়াছি। সন্ধি বিগ্রহ যে কত হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। আমার মনে আছে এবং এই কথা আমরা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি যে, একদিন আবাল বৃদ্ধ সকলেই মহাভীত হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্যাপারটা এই যে, আমাদের দেশে ভয়ানক ভূমি কম্প উপস্থিত হইল, সমস্ত ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ছারখার হইয়া গেল, কত লোক চাপা পড়িয়া মরিল, আমাদের শিশু সন্তান কত হারাইল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সাহসী ছিলেন তাঁহারা বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড অসুর, লম্বায় দশ বার হাজার হাত, চওড়ায় দু তিন হাজার হাত, দুটা হাত ও দুটা পা, আসিয়া আমাদের নগরের অর্দ্ধেক উপড়াইয়া লইয়া গেল, তাহারই জন্য এত কাণ্ড হইয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর ঠিক হইল যে সেই শত্রুটা মানুষ বলিয়া যে একদল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসুর আছে তাহারই একটা। ইহারা আমাদের শাবক চুরি করিতে আইসে, ইহারা শালিক ময়না বুলবুলী পোষে; তাহাদিগকে সেইগুলি খাইতে দেয়। আর মাছ ধরিবার সময়ে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা ধরিয়া তাহা দিয়া টোপ তৈয়ার করে। এই নিষ্ঠুর পাষণ্ডদের কিছুমাত্র মায়া দয়া নাই, আবার এই অসুরেরা সকলের প্রভু হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া যাঁক করিয়া বেড়ায়। কেউত আর বলবার নাই, গায়ে জোর বেশী, যা খুসী তাই করে। কিন্তু ভাই, আমরা দলে বেশী, আমরাও সময়ে সময়ে তাদের বড় জব্দ করিয়া থাকি।" আমি বলিলাম "ওদের জবরদস্তির কথা আর বলিও না। আমরা ফড়িং আমাদেরও ঐ রকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, আর তাদের পোষা পাখিদের খাইতে দেয়। আমার ভাই, একদল মাসতুত ভাই আছে, তাদের কাছে ভায়ারা বড় জব্দ

থাকেন, তখন ইহাদের সব বীরত্ব ও চালাকি বাহির হইয়া যায়। আমার মাসতুত ভাইরা পঙ্গপাল, তাহারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া ওদের দেশে শস্য ক্ষেত্রে পড়ে, সেই বার ভায়ারা না খাইয়া মরেন, তাহাদের গায় পড়িলে ছটপট করিয়া মরেন, তখন আর ঘরের বাহিরে আসিতে সাহস হয় না, তাদের গরু বাছুর ঘোড়া সবই পঙ্গপালের জ্বালায় ছট ফটিয়া মরে।"

এই রকম কথা বার্ত্তার পর আমি কতকগুলি নূতন নূতন পোকার বাড়ী দেখিতে পাইলাম। এক রকম শুঁয়োপোকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম একি ভাই। পিঁপড়ে বলিল "ওরা অনেক এখানে আছে। আমরা ওদের কিছু বলি না, আমাদের বাপ দাদারাও কিছু বলিতেন না, তাঁহারা আরও যত্ন করিতেন। আমাদের ছোট ছোট শিশুরা খোসা বদলায়, ইহারা সেইগুলি খায়। আমাদের অন্যান্য যত ময়লা আবর্জ্জনা থাকে ইহারা তাহা খাইয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। ইহারা আমাদের বড় উপকারে আসে। ইহারা না থাকিলে আমাদের বড় কষ্ট হইত। সেই জন্য আমরা ইহাদের ঘর বাড়ী দিয়াছি ও যত্ন করিয়া থাকি।"

তারপর একটা ছোট হল্‌দে রঙ্গের গুবরে পোকার মত একটা পোকা দেখিয়া বলিলাম "একি ভাই!" পিঁপড়া বলিল "ওদের আমরা পুষিয়াছি। ওরা আমাদের গরু। ওরা দুধ দেয়। ওরা কেমন মধুর মত একরকম রস বের করে তা খাইতে বড়ই উপাদেয়। আমরা ইহাদের বড় যত্ন করি ও ভাল ভাল খাবার দি। আমাদের গোয়াল ঘরে আর এক রকমের গরু আছে, চল দেখ্‌বে চল।" গিয়া দেখি ছিম্ গাছে বেগুন গাছে ও অন্যান্য গাছে যে ছোট ছোট উকুনের মত পোকা থাকে তাই অনেক আছে।

পিঁপড়ে বলিল, "আমরা যখনই ইহাদের গাছের উপর দেখিতে পাই তখনই শুঁড় দিয়া ইহাদের ল্যাজের উপর সুড় সুড়ি দি আর অমনি ওরা কোন উচ্চ বাচ্য না করিয়া এক রকম রস বাহির করে, আমরা তাহা পান করিতে বড়ই ভালবাসি। তাই আমাদের ছেলেরা, ইহারা পোষ মানে কি না তাই পরীক্ষা করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছিল, এখন ইহারা বেশ পোষ মানিয়াছে এবং আমাদের ইচ্ছামত সুড় সুড়ি দিলেই সেই রস নির্গত করিয়া দেয়। ইহাদের ধরিয়া আনিয়াছি, এখানে আসিয়া ইহারা কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট নহে, কারণ আমরা ইহাদের সহিত কোন অসদব্যবহার করি না। তবে ইহাদের পোষা কিছু কষ্টকর, ইহারা গাছের রস ভিন্ন আর কিছুই খায় না, আমাদের এদেশে গাছ নাই তবে আমরা গাছ রোপনের চেষ্টায় আছি।"

পিঁপড়ের গোয়াল ঘরে এই রকমের সব গরু দেখিলাম।

ক্রমশঃ।

অতি লোভের শাস্তি।

৬৪ পৃষ্ঠার পর।

বিদ্যালয় ছাড়িয়া সে কলিকাতাতেই ১৫৲ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম পাইল। সে আয়ে তাহার যদিও এক প্রকার কুলাইতে পারিত কিন্তু অসময়ে লেখা পড়া ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহার মনে বড় ক্ষোভ হইল; সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে তাহার ত লেখা পড়া হইলই, না, ভাইগুলিকে একবার মনের সাধে লেখা পড়া শিখাইবে। এই ভাবিয়া সে স্কুলের কর্ম্মের উপরে তিন চারিটী প্রাইভেট পড়ান যুটাইল। বাপ্‌রে সে কি ভয়ানক পরিশ্রম! অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মুখ হাতে জল দিয়া পড়াইতে বাহির হয়। দুই জায়গায় পড়াইয়া ৯ টার সময় ফিরিয়া আসে, আসিয়া আহার করিয়া ১০টার সময় বিদ্যালয়ে যায়, আবার সেখান হইতে ৪টার পর বাহির হইয়া, দুই জায়গায় পড়াইয়া ৮।৯টার সময় বাসাতে আসে। এইরূপে সে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিত। দুই তিনটী ভাইকে আনিয়া নিজের নিকট রাখিয়া অতি উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখাইতে লাগিল। ক্রমে বাড়ীর চেহারা ফিরিয়া গেল, জনক জননীর হাহাকার দৈন্য দশা ঘুচিয়া গেল। বধূর অঙ্গে দুই দশখান গহনা হইল। লোকে দেখিতে লাগিল যে, সে দিন দিন বেশ উন্নতি করিতেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রে সে ব্যক্তি পড়াইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া আহার করিতে যাইবে এমন সময়ে মাথা বেদনা করিতেছে বলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ভাইগুলি অনন্য গতি হইয়া তৎক্ষণাৎ পাল্‌কী করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া গেল। আত্মীয় স্বজন কলিকাতাতে যে দুই একজন ছিলেন সকলেই সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বড় বড় ডাক্তারেরা তাহার চৈতন্য করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই চৈতন্য হইল না। কয়েকদিন সেই অবস্থায় থাকিয়া তাহার মৃত্যু হইল। ডাক্তারেরা সকলেই বলিলেন যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য সে মারা পড়িল।

আমরা সকলে হায় হায় করিতে লাগিলাম। এত পরিশ্রম না করিলেও তার চলিত। বধূর অঙ্গে এত গহনা না হৌক, পরিবারের সকলে সুখে খাইয়া পরিয়া থাকিতে পারিত। কিন্তু মানুষের যখন আশা বাড়ে তখন বাড়িতেই থাকে, অবশেষে অর্থ-লোভে মানুষ শরীরকে শরীর বলিয়া গণনা করে না, শ্রমকে শ্রম বলিয়া ভাবে না। তাহার শাস্তিও পায়। এ ব্যক্তি যদি এত অতিরিক্ত শ্রম না করিত, তাহা হইলে আরও কত দিন বাঁচিয়া পিতা মাতার সেবা করিতে পারিত, ও ভাইদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিত। তাহার কিছুই হইল না। তাহাদের যে দৈন্য দশা সেই দৈন্য দশাই রহিয়া গেল। ভাইগুলিকে পড়া ছাড়িয়া কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হইল, এবং সমুদায় উন্নতির ব্যাঘাত হইয়া গেল। কোন প্রকারের লোভে শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়।

প্রাপ্ত।

(বালকের রচনা।)

সাধুতার পুরস্কার।

বিনয়, নম্রতা, সত্য, বিশ্বাস, ন্যায়, ক্ষমা, পরোপকার প্রভৃতি গুণে যিনি অলঙ্কৃত, তাঁহাকে সাধু কহে। সাধুর ভাবকে সাধুতা ও তাহার পুরস্কারকে সাধুতার পুরস্কার কহে।

কি বালক, কি বালিকা, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সকলেরই ভাল বা সাধু হইবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু বহুবিধ কারণ প্রযুক্ত এইভাব কাহাতেও অধিক, কাহাতেও কম, তজ্জন্য অনেকেই ভাল বা সাধু হইতে পারেন না। আমরা যদি বাল্যকাল হইতেই সাধু সঙ্গে থাকি, সৎকথা শুনি, সচ্চিন্তা করি ও সাধুদিগের জীবন-চরিত পাঠ করি, এবং পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি সদাচরণ করি, ও তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে আমরাও সাধু হইতে পারিব। এবং সাধু হইলেই তাহার পুরস্কার আছে। আর যদি তাহা না করিয়া সর্ব্বদা খেলাইয়া বেড়াই, ও উন্নতির কথা ভুলিয়া গিয়া, বৃথা আমোদ, বৃথা গল্প করিয়া অমূল্য সময়কে নষ্ট করি, কুসঙ্গে বেড়াই, কুচিন্তা করি, তাহা হইলে ক্রমে সাধু না হইয়া সাধুর বিপরীত অসাধু হইব। আর আমাদের সাধু হইবার ইচ্ছাও কখন উন্নত হইবে না। সুতরাং আমাদিগকে দেখিলে সকলেই ঘৃণা করিবে; এমন কি আমাদের সহিত বাক্যালাপও করিবে না।

বিশ্বাস, সত্য, ন্যায় প্রভৃতি যাহা সাধুদিগের ভূষণ তাহাদেরই দুই একটীর পুরস্কারের বিষয় উল্লেখ করিব।

বিশ্বাস—আমাদের দেশের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যিনি প্রথমে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" আবিষ্কার করেন, যাঁহার জীবন-চরিত শুনিতে বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ভালবাসে, তিনি যখন উক্ত (ব্রাহ্ম) ধর্ম্ম আবিষ্কার করেন, ও শিক্ষিত লোকেরা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন মহা হুল স্থূল ঘটিল, একবারে চারিদিকে দ্বেষানল প্রজ্জলিত হইল, পুরাতন দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা ও প্রাচীনসংস্কারাপন্ন লোকেরা তাঁহার উপর কত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল; এবং ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত কত বাধা দিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু পর্ব্বত যেমন সহস্র সহস্র তরঙ্গাঘাতেও বিচলিত হয় না, সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন রায়ও আপনার বিশ্বাস হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি এইরূপ অনেক পরিশ্রম করিয়া কলিকাতায় প্রকাশ্যে একটী ঈশ্বরের উপাসনালয় স্থাপন করিয়া যান। অধুনা সেই "ব্রাহ্মসমাজ" নানা শাখা বিশাখায় বিস্তৃত হইয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের যশঃকীর্ত্তন করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা রামমোহন রায়ের সুমহৎ জীবনের পরিচয় দিতেছে। দেখ দেখি ভাই ভগিনী সকল, কেমন সাধুতার পুরস্কার হইল।

ন্যায় পরায়ণতা—সুবিখ্যাত মৃত রামদুলাল দে যিনি বাল্যকালে অন্নাভাবে কলিকাতায় মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া তাঁহারই আফিসে ১০৲ দশ টাকা বেতনে মুহুরি রূপে নিযুক্ত হন, তিনিই ন্যায় পরায়ণতার জন্য সময়ে কলিকাতায় একজন প্রভূত ধনশালী বলিয়া বিখ্যাত হয়েন।

কোনও সময় রাম দুলালের প্রভু তাঁহাকে কিছু টাকা দিয়া টালা কোম্পানির বাটীতে একটা

নির্দ্দিষ্ট নীলাম ক্রয় করিতে পাঠান। তাঁহার (রামদুলালের) আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই উক্ত নীলাম বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অবিলম্বেই শুনিলেন যে, একখানি জাহাজ নীলামে ধরা হইয়াছে। তিনি এই জাহাজ খানি কয়েক দিবস পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। এবং তাহাতে কত মূল্যের দ্রব্য আছে, কি রূপেই বা উদ্ধৃত হইতে পারে, তাহা একপ্রকার নিরূপণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে শুনিবা মাত্র তাঁহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট জাহাজ বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, যাহা তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অনেক অল্প মূল্যে ডাক হইতেছে; সুতরাং জাহাজ খানি ক্রয় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার ডাক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায়, প্রভু মদনমোহনের নামে ১৪০০০৲ চৌদ্দ হাজার টাকায় ক্রয় করিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া তিনি নিকটস্থ অন্য কোনও গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় এক সাহেব উক্ত বস্তু ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিলেন; এবং তাহা লইবার জন্য বাবু রামদুলালকে কত ভয় দেখাইলেন, ও কত গালি দিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভীত হইলেন না। অবশেষে তাঁহাকে বিক্রয় করিতে অনুরোধ করাতে বাবু রামদুলাল চৌদ্দ হাজারের উপর প্রায় একলক্ষ টাকা লাভ রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এই লক্ষ টাকা মদনমোহনের প্রাপ্য, কিন্তু তিনি মনে করিলেই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু লাভের টাকা লওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ প্রভুর বিনানুমতিতে এই কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে প্রভুর সমীপে গমন করিলেন। এবং সভয়ান্তঃকরণে বিনীত ভাবে যথাযথ সমুদয় বলিলেন; এবং স্বীয় দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া টাকাগুলি সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। মদনমোহন দত্ত মহাশয় বাবু রামদুলালের ন্যায়পরায়ণতা ও সরলতা দেখিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত লাভের সমস্ত টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিলেন। এই খান হইতেই বাবু রামদুলাল দের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইল। শুনা যায় যে, শেষে তিনি কোটী টাকা করিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের ত ইহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, মিথ্যা কথা, চুরি প্রভৃতি কদাচার কার্য্য না করিলে বাণিজ্য হয় না, তাঁহাদের বাবু রামদুলাল দে মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা উচিত। আইস ভাই ভগিনী সকল! আমরাও এখন হইতে সাধু হইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে বড় হইয়া সাধু হইতে পারিব।

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস, চন্দননগর।

ভরত-বিলাপ।

কৈকেয়ী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইয়া, ভরতকে মাতামহের ভবন হইতে আনাইল। ভরত রামের বনগমনের কথা কিছুই জানিতেন না। তিনি গৃহে আসিয়া রামের বন গমন সংবাদ ও পিতার মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। নিজ মাতা কৈকেয়ীকে অনেক তিরস্কার করিয়া তৎপরে মহারাণী কৌশল্যার নিকট গমন করিলেন। কৌশল্যার সহিত তাঁহার কিরূপ কথা বার্ত্তা হইয়াছিল তাহারই বিবরণ

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ হইতে সহজ বাঙ্গলাতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। এবারে স্থানাভাবে কৌশল্যার সহিত সাক্ষাৎ করা পর্য্যন্ত দেওয়া গেল, ভরতের বিলাপ আগামী-বারে দেওয়া যাইবে।

ভরত চেতনা পেয়ে বহুক্ষণ পরে,
কাতরে বিলাপ করে, ভাসে নেত্র-ধারে।
কৈকেয়ী সমীপে বসি হেঁট-মুখ লাজে,
ভরত ভর্ৎসনা করে সভাজন মাঝে;—
"চাহি না এ রাজ্য-পদ, তোর কুমন্ত্রণা
করিনু প্রতিজ্ঞা আর কাণে লইব না।
রাম অভিষেকে পিতা করিলা বাসনা;
দূরে থেকে বার্ত্তা তার কিছুই জানিনা;
শত্রুঘ্ন ভেয়ের সনে থাকি দূরদেশে,
না জানি কেমনে রাম গেলা বনবাসে।
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই, ঠাকুরাণী সীতা,
গেলা শূন্য করি ঘর, না জানি বারতা।"
ভরত কাঁদিয়া কহে কত আর্ত্তস্বরে!
শুনিয়া কৌশল্যা ডাকি কন সুমিত্রারে;—
"ওলো শোন্ ঘরে বুঝি আসিল ভরত,
শোন লো বিলাপ করি কাঁদিতেছে কত।
ভরত ধার্ম্মিক ধীর সাধু সদাশয়,
বারেক দেখিতে তারে ব্যাকুল হৃদয়।"
এত বলি রাম-মাতা, শোকেতে মলিনা,
শীর্ণ-দেহ, ম্লান-কান্তি, যেন দীন হীনা,
চলিতে শকতি নাই কাঁপে থর থর,
ভরত উদ্দেশে মাতা যান তার ঘর।
ওদিকে ভরত মায়ে নিন্দিয়া বিশেষ,
কৌশল্যা দর্শন আশে যান অবশেষ,
সঙ্গেতে শত্রুঘ্ন বীর; যায় দুই জনে;
পথেতে হইল দেখা কৌশল্যার সনে।
অমনি হারায়ে জ্ঞান পড়িলা জননী;
আলিঙ্গিয়া ধরি তোলে দুই নরমণি!
পাইয়া চেতন মাতা দেখে নেত্র-জলে
ভাসিছে দোঁহার মুখ; সম্বোধিয়া বলে;—
"রাজ্য যদি চাও বাপ ভুঞ্জ নিষ্কণ্টকে,
মা তোর কৌশলে রাজ্য ঘটাইল তোকে,
প্রাণের কুমারে মোর পাঠাইল বনে;
না জানি কি গুণ তাতে বুঝিল বা মনে।
বল্ বাপ মায়ে তোর, করুণা করিয়া
অভাগীকে সেই বনে দিক্ পাঠাইয়া।
তোরা থাক্ রাজ্যে বাপ, আমি অভাগিনী
বনে যাই, গেল যথা আমার বাছনি।
ধার্ম্মিক যশস্বী বীর আমার শ্রীরাম,
যাই তার পাশে, রাজ্যে নাহি মোর কাম।
দেও অনুমতি বাপ সুমিত্রারে লয়ে,
ছাড়িয়া এ রাজ্য-পদ যাই দূর হয়ে।
রাজার আদেশ আছে তর্পণ তাঁহার
করিতে পাবে না তুমি, নাহি অধিকার।
সেই অগ্নিহোত্র লয়ে পলাই দুজনে,
নিজে রেখে এস বাপ, সে ঘোর কাননে।
যেখানে প্রাণের রাম তপস্যাতে রত,
দিয়ে এস সেই স্থানে বাপরে ভরত।
সুবিস্তীর্ণ এই রাজ্য, হস্তি অশ্ব রথ,
ভুঞ্জ তুমি, কৈকেয়ীর পূর মনোরথ।"
ব্রণেতে ফুটালে সূচি যেমন যাতনা,
ভরত পাইলা প্রাণে তেমনি বেদনা।
হারায়ে চেতনা বীর কৌশল্যা চরণে
পড়ে গেল, দর দর ধারা দুনয়নে।
বহুক্ষণে পেয়ে জ্ঞান, উঠিয়া বসিল,
অঞ্জলি বাঁধিয়া মায়ে বলিতে লাগিল।
"মাগো আমি জ্ঞানে ধর্ম্মে কিছুই না জানি;
পোড়াও না বাক্যানলে আমারে জননি!

ক্রমশঃ।

এলিফাণ্টা গিরি-মন্দির।

এখান্‌ পাঠক পাঠিকা; তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে, আমাদের এই দেশে দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ম্যাপ খুলিয়া তোমরা বেহার ও অযোধ্যার মধ্যে গোরকপুর নামে একটী নগর দেখিবে, তাহার কিয়দ্দূরে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কপিলাবস্তু নামে একটী বড় নগর ছিল। ঐ নগরে সেই সময়ে শুদ্ধোদন নামে শাক্য বংশীয় একজন রাজা রাজ্য করিতেন। মহাত্মা বুদ্ধ তাঁহার ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল গৌতম; পরে অলৌকিক জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়াতেই বুদ্ধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গৌতম বাল্যাবধিই ধর্ম্মানুরাগী ও চিন্তাশীল ছিলেন। রাজ সংসারের ধূম ধাম তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁহার পিতা তাঁহার মন ফিরা-ইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। অবু-শেষে গৌতম রাজ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন। ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর তিনি এক নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। দিন দিন তাঁহার দলে শত শত লোক যুটিতে লাগিল। ক্রমে বড় বড় রাজারা তাঁহার মতাবলম্বী হইল। বর্ত্ত-মান পাটনা নগর যেখানে দেখিতেছ, তখন ঐ স্থানে একটী রাজ-নগর ছিল। সেই নগরে অশোক নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি দেশ বিদেশে ধর্ম্ম-প্রচারক পাঠা-ইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ প্রচা-রকগণ ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন; এমন কি ভারত-বর্ষ পার হইয়া সিংহল দ্বীপ ও পূর্ব্বে জাবা, জাপান, চীন প্রভৃতি স্থানেও গিয়া পড়িয়া-ছিলেন। অশোক রাজা আর একটী কার্য্য করিয়া-ছিলেন; তিনি অনেক পর্ব্বতের গুহার মধ্যে মনো-হর গিরি-মন্দির সকল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ তাপসগণ তাহার মধ্যে বসিয়া ধ্যান ধারণা করিতেন। সেখানে প্রস্তরফলকে বুদ্ধের উপদেশ সকল খোদিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে এরূপ বৌদ্ধ-কীর্ত্তি সকল এখনও বিদ্যমান আছে। অশোকের খোদিত অনেক প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহার কতক-গুলি কলিকাতার মিউজিয়মে আনিয়া রাখা হই-য়াছে। এরূপ বোধ হয়, গিরি-গুহা খনন করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করার পথ বৌদ্ধেরা প্রথমে প্রদ-র্শন করিয়া থাকিবে। তৎপরে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণ তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে এরূপ দেখা যায় যে, কোন গিরিগুহাতে অগ্রে বৌদ্ধগণ মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তৎপরে আবার হিন্দুর প্রতাপ বাড়িলে তাহাতে হিন্দুদের দেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এরূপ ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ও পঞ্জাবে অনেক মুসলমানের মসজিদ দেখা যায় যাহা এক সময়ে হিন্দুর দেবালয় ছিল, মুসলমান রাজাগণ হিন্দুর দেবালয় ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার শিকদিগের অমৃত-সরস্থিত স্বর্ণ-মন্দির দেখিলে বোধ হয় শিক রাজগণ মুসলমান মসজিদ ও গোরস্থান হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তর সকল হরণ করিয়া সেই

মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে গুজরাটের আমেদাবাদ নগরের একটী প্রস্তরে বাঁধান রাস্তার কতকগুলি পাথর উঠিয়া যাওয়ায় উল্টাইয়া দেখা গেল যে,তাহার অপরদিকে হিন্দুর দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। পরে যে পাথর খানি তোলা যায় সেই খানেই একটী দেবমূর্ত্তি। ইহাতে অনুমান হয় যে, ঐ নগরের কোন মুসলমান রাজা কোন হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া সেই সকল দেবমূর্ত্তি দ্বারা ঐ রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, লোকে তাহাদিগকে পদ দ্বারা দলন করিয়া যাউক।

যাহা হউক যে গিরি-মন্দিরটীর বিষয় আমরা বর্ণনা করিব, তাহার বিষয় কিছু বলি। এই গিরি-মন্দিরটী বোম্বাই সহরের কিছুদূরে সমুদ্র মধ্যস্থিত একটী পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত। বোম্বাই হইতে লোকে বোটে করিয়া এই গিরি-মন্দির দেখিতে গিয়া থাকে। বোম্বাইএর নিকটে সমুদ্র সর্ব্বদা আন্দোলিত, সাহসী লোক না হইলে বোটে যাইতে বড় ভয় পায়। বোট ডোবে না কিন্তু তরঙ্গের উপরে নাচিতে থাকে, ও কখন কখনও তরঙ্গের জল বোটের উপরে আসিয়া আরোহিদিগকে স্নান করাইয়া দেয়। এই জন্য এলিফাণ্টা গিরিগুহা দেখিতে যাইবার সময় লোকে অনেক সময় দুই সুট কাপড় লইয়া যায়। বোট নাচিতে নাচিতে, দুলিতে দুলিতে, সেই পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলে দেখি, বরাবর পাষাণ-নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী উপরে উঠিয়া গিয়াছে। উঠিয়া দেখি, সোপানগুলি কি সুন্দর! তাহাতেই বা কত পরিশ্রম হইয়াছে! ক্রমে গিরিমন্দিরের দ্বারে গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে দুই একখানি ঘর বাঁধিয়া প্রহরীস্বরূপ দুই চারিজন লোক আছে। তাহারা পথ প্রদর্শন করিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। দেখিলে বোধ হয় সেখানে একটী সামান্য গুহা ছিল, তারপরে মানুষের পরিশ্রমের গুণে সেই গুহা এক আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার ভিতরে বড় বড় থাম, নানা প্রকার খোদিত মূর্ত্তিবিশিষ্ট ঘর। এক পার্শ্বে একটী জলপূর্ণক্ষুদ্র উদপান (চৌবাচ্চা), সেখানে দিনরাত্রি জল ঝরিয়া পূর্ণ রাখিতেছে। ঘরগুলি প্রকোষ্ঠে (মহলে মহলে) বিভক্ত। বিশ্রাম কর, রাঁধিয়া খাও,—ধ্যান ধারণা কর, সকল কার্য্যের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। সচরাচর বৌদ্ধ-নির্ম্মিত গিরিমন্দিরে যে সকল ধ্যানস্থ বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহা বড় দেখিতে পাইলাম না। কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার অবয়ব সকল কালক্রমে কোন কোন স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারা গেল না। অনুমানে বোধ হইল কোন হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি হইবে। এমনও হইতে পারে যে, এই গিরিমন্দির এক সময়ে বৌদ্ধদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয় তৎপরে হিন্দুরাজাদিগের রাজত্ব কালে হিন্দুদিগের হস্তে পতিত হয়। তাঁহারা ইহাকে আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

পর্ব্বতে যাঁহারা কখনও যান নাই, তাঁহারা গিরি-গুহা কি তাহা বুঝিতে পারেন না। পর্ব্বতের গায়ে বা দুইটী পাহাড়ের মাঝে কখনও কখনও এক একটী গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গর্ত্তের মুখ এমন ছোট যে, একজন মানুষকে অতি কষ্টে প্রবেশ করিতে হয়। বাহির হইতে দেখিলে বোধ হয় যে, গর্ত্তটী অতি সামান্য ও অধিক দূর বিস্তৃত নয় কিন্তু প্রবেশ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, তাহা বহুদূর-বিস্তৃত, কোন কোনটীর মধ্যে যাইবার বেশ পথ আছে; কোন কোনটী যে কতদূর বিস্তৃত তাহার ঠিকানা করা যায় না। ভিতরে এমনি অন্ধকার ও বায়ু এমন বদ্ধ যে যাইতে ভয় হয় ও নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। এই সকল গিরিগুহাকে কাটিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পীগণ মনোহর দেব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এলিফাণ্টা গিরি-মন্দির তাহার একটী। সখার পাঠক পাঠিকা! গিরি-মন্দিরের কথা যদি তোমাদের শুনিতে ভাল লাগে আরও কতকগুলির বর্ণনা সংগ্রহ করিয়া শুনাইতে পারি।

পণ্ডিতের ভ্রান্তি।

আমরা সময়ে সময়ে বড় বড় পণ্ডিতের বড় বড় ভ্রান্তির কথা শুনিয়া কত কৌতুক করিয়া থাকি। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্রের বড় চর্চ্চা ছিল। সর্ব্বদা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচার করিয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা অনেক সময় স্থূল স্থূল বিষয় ভুলিয়া যাইতেন। এরূপ গল্প আছে যে, একবার একজন মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিত ন্যায়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্ক ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীতে আসিতেছিলেন। তিনি তখন চিন্তাতে এমনি নিমগ্ন যে, বাহিরের বিষয় একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া কৌতুক করিয়া খুব গম্ভীরভাবে তাঁহাকে বলিল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার বাড়ীর বড় অমঙ্গল সংবাদ। আপনার গৃহিণী বিধবা হইয়াছেন।" ব্রাহ্মণের এ বুদ্ধিটুকুও তখন যোগাইল না যে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার পত্নী কিরূপে বিধবা হইবেন। তিনি খুব চিন্তান্বিত অন্তরে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। যখন তাঁহার পত্নী তাঁহার পা ধুইবার জল দিতে আসিলেন তখনও তাহার ভ্রান্তি ঘুচে নাই; তাঁহার শরীরে অলঙ্কার দেখিয়া ব্রাহ্মণ একেবারে কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজের বিধবা কন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "আমি শুনিয়া আসিলাম তোমার গর্ভধারিণী বিধবা হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার দেহে অলঙ্কার; এ কিরূপ বিধি?" কন্যা হাসিয়া বলিল, "সে কি বাবা! ন্যায় পড়িয়া তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে গিয়াছে? তুমি থাকিতে মা কিরূপে বিধবা হইবেন।" তখন ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—তাই তো!"

ইংলণ্ডেও এরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে; তাহার কয়েকটী নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা ও বৈজ্ঞানিক আইসাক্ নিউটন সাহেব বাচ্চা শুদ্ধ একটা বিড়াল পুষিয়া ছিলেন। বিড়ালের থাকিবার জন্য একটা ছোট কাঠের ঘর তৈয়ার করেন। বিড়ালটার সেই ঘরে ঢুকিবার জন্য একটা খুব বড় ছিদ্র করিয়া রাখেন। তার পর মনে মনে ভাবিলেন যে, বড় বিড়ালটার যাইবার পথ ত করিলাম, ছোট বিড়ালটা ঘরে ঢুকিবে কি করিয়া? এই বলিয়া তিনি সেই বড় ছিদ্রের পাশে ছোট বিড়ালটা ঢুকিতে পারে এই রকম একটা ছোট ছিদ্র করিলেন। বড় ছিদ্র দিয়া বড় বিড়াল যাইবে, ছোট ছিদ্র দিয়া ছোট বিড়ালটী যাইবে। যিনি অঙ্কশাস্ত্রের অতি কঠিন এবং দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিতে আর এটা যোগাইল না যে, যে ছিদ্র দিয়া বড় বিড়াল প্রবেশ করিতে পারে সেই ছিদ্র দিয়া ছোট বিড়ালও প্রবেশ করিতে পারিবে।

বিখ্যাত নাটককার এবং অদ্বিতীয় বক্তা শেরিডান সাহেব একটী বাগান বাড়ী ভাড়া

করেন। সে বাড়ীর চারিদিক বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল। একদিন বাড়ীর বাহির হইয়া বেড়ার ঝাঁপ বা দরজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আর সে দড়ির বাঁধন খুলিতে পারিলেন না। অগত্যা বেড়া লাফাইয়া আসিতে হইল। এইরূপ দুই দিন ধরিয়া যতবার আবশ্যক হইত ততবারেই বেড়া লাফাইয়া আসা যাওয়া করিতেন। দুইদিন পরে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। শেরিডান বলিলেন, অনুগ্রহ করিয়া বেড়াটা লাফাইয়া আসুন। তাঁহার বন্ধু বলিলেন, দরজাটা খুলিয়াই দিন্ না কেন? তিনি উত্তর করিলেন ও দড়ির বন্ধন আমি খুলিতে পারি না। বন্ধু বলিলেন, দড়িটা তবে কাটিয়া ফেলেন না কেন? তখন শেরিডান থ হইয়া তাঁহার বন্ধুর দিকে কিছু ক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন, তৎপরে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া দড়ি কাটিয়া দিলেন ও সজোরে এক লাথি মারিয়া বেড়ার দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন "আপনি যদি আমার বন্ধু হন এবং আমাকে কিছুমাত্র ভাল বাসেন তবে আমার পৃষ্ঠে ঐরূপে পদাঘাত করুন।" যাঁহার হাসি ঠাট্টার সময়ে, রসিকতার সময়ে মজার মজার কথা বলিতে এবং নাটকে মানব মনের গূঢ় ও বিচিত্র ভাব সকলের বর্ণনা করিতে যে বুদ্ধি যোগাইত, বেড়ার দড়ি কাটিলে যে বেড়া খোলা যায় সে বুদ্ধি আর যোগাইল না!

মার্কিন দেশীয় একজন পণ্ডিতের বাড়িতে সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, আমি তাঁহার যে ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেই ঘরে এত কম আলো ছিল যে, বলিতে গেলে আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না; অতি কষ্টে এক ধার হইতে অন্য ধারে গেলাম। দেখিলাম তিনি চিঠি লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন; তিনি আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার চোখ খারাপ হইয়া আসিতেছে, তিনি কি লিখিতেছেন তাহা স্পষ্ট দেখিতে পান না। আমি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মিট মিট করিয়া সে ঘরে যে গ্যাস জ্বলিতেছিল তাহা বাড়াইয়া দিলাম। তখন আমার বন্ধু চমৎকৃত হইয়া যে কিরূপ ভাবে একবার গ্যাসের দিকে একবার আমার দিকে একবার চিঠির দিকে তাকাইতে লাগিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না।

বাঘ-মানুষ।

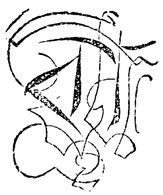

দ্বে মানুষে কেমন ভাব তাহা সকলেই জানে। ফাঁক পেলে কেহও কাহাকে ছেড়ে কথা বলে না। ব্যাঘ্র মহাশয় যদি সুবিধা পান তবে ঘাড় ভাঙ্গিয়া মানুষ ভায়ার রক্ত পান করিতে ত্রুটী করেন না; আর মানুষে সন্ধান পাইলেও গোলা বারুদের তোপ-ধ্বনি করিয়া দাদা মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। * আমাদের দেশে বাঘ ও মানুষের এরূপ আদর অভ্যর্থনা প্রায়ই হইয়া থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে আবার ইহাও শুনা যায় যে, বাঘের ঘরে মানুষের সন্তান পালিত হইয়া থাকে। আমার মনে আছে ছেলে বেলা এই রকম কত গল্প শুনিয়াছি। যখন বড় হইয়া ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলাম তখন

* আমরা ডারউইন সাহেবের সূত্র অনুসারে ব্যাঘ্রকে জ্যেষ্ঠ বলিলাম, বোধ হয় ইহাতে কাহারও আপত্তি হইবে না।

আর এসমুদায় গল্পে বড় বিশ্বাস হইত না। কিন্তু ইংরাজী পড়িয়াও নিস্তার নাই। রোমের ইতিহাসে পড়িলাম রোমের স্থাপন কর্ত্তা এক বাঘিণীর দুধ খাইয়া বাঁচিয়াছিলেন। সে সত্য যুগের কথাও বরং অবিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু আজ কাল যাহা শুনিতে পাই তাহা আর গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ফতেপুরে বাঘের ঘর হইতে একটী মানুষের বাচ্ছা আনা হইয়াছিল। সেখানকার সিভিল সার্জ্জনের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, বালকটীর বয়স ৬ অথবা ৭ বৎসর ছিল। ছেলেটী কথা বলিতে পারিত না, কাপড় পরিতে চাইত না এবং রান্না করা কিছুই খাইত না। সে যে অনাথ নিবাসে থাকিত সেখানকার পাদ্রি সাহেব ভয়ে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতেন। ডাক্তার সাহেব গিয়া তাহাকে ছেড়ে দিতে ব্যবস্থা করিলেন এবং মাংস ও হাড় রান্না করে খেতে দিতে বলিলেন। বাঘের মানুষ-বাচ্ছাকে ছেড়ে দেওয়া হইলে তাহার দৌরাত্ম্যে সকল অস্থির হইয়া উঠিল। একদিন ডাক্তার সাহেব গিয়া দেখিলেন যে, বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার পায়ের উপর হাত দিয়া মুখের দিকে কাতর ভাবে তাকাইতে লাগিল; এবং যেন কথা বলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অতি কষ্টেও কিছু বলিতে পারিল না, কেবল "শাক" এই কথাটী বাহির হইল। ডাক্তার সাহেব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে শাক ও ভাত খাওয়াইতে বলিলেন। ক্রমে তাহার ছেলে বেলার কথা মনে আসিতে লাগিল এবং "মা" ও "বাবা" এই কথা বলিতে শিখিল। কিন্তু এরূপ ভাবে তাহাকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। শাক খাইতে খাইতে তাহার ভয়ানক পেটের অসুখ হইল। এইরূপে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় পড়িয়া তাহার উদ্ধত ব্যাঘ্রের স্বভাব যাইতে লাগিল এবং ক্রমেই পোষ মানিতে লাগিল; ডাক্তার সাহেব কাছে গেলে আর তাহাকে সহজে ছাড়াইয়া আসিতে পারিতেন না। যদিও তাহার গায়ে বাঘের ন্যায় দুর্গন্ধ ছিল এবং দেখিতে অতিশয় কদাকার ছিল তথাপি দয়ালু স্বভাব ডাক্তার তাহার কাছে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতেন এবং তাহাকে আদর করিতেন। শত চেষ্টায়ও তাহার সে ব্যারামের উপশম হইল না। মৃত্যু দিন যখন ডাক্তার সাহেব তাহাকে দেখিতে গেলেন তখনও সে তাঁহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিল এবং যখন সাহেব আদর করিয়া তাহার মাথার উপর হাত দিলেন তখন সে সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিল। হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে "শাক" এই কথাটী বাহির হইল। ডাক্তার সাহেব চাহিয়া দেখিলেন হতভাগ্য ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে।

কিছুদিন হইল কানপুরে একটী বাঘ-মানুষের কথা শুনা গিয়াছে। একজন ইংরেজ মহিলা যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, ইহার বয়স ২৫ কি ৩০ বৎসর হইবে। দেখিতে খুব বলবান এবং দৃঢ়কায়; চুলগুলি এবং পরিধান কাপড় বেশ মোটামুটি পরিষ্কার, দেখিলে খুব ছোট লোক কিম্বা ভিক্ষুকের মত বোধ হয় না। ইহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, বাঘ-মানুষকে কেমন ভদ্র লোকের মত দেখা যায়। চক্ষু দুটি ভয়ানক রক্তবর্ণ, দেখিলে ভয় করে, এবং জিহ্বা হিংস্র জন্তুর মত লক্‌লকে। কাহাকেও কোন উপদ্রব করে না; কিন্তু সাধারণ

লোক বলিয়া থাকে যে, সে ছোট ছোট ছেলে পেলে দেখিলেই যেন খাইবার জন্য জিহ্বা বাহির করে। যাহা হউক সকলেই তাহাকে ভয় করে এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য অথবা পয়সা দিয়া থাকে।

বাঘ-মানুষকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একটী ১০ বৎসরের মেয়েকে দেখাইয়া বলিল যে, যখন সে দেখিতে তত বড় তখন এক জঙ্গল হইতে রোজ সাহেব তাহাকে ধরিয়াছিল। তখন সে চা'র হাত পার উপর ভর দিয়া চলিত। কিছুকাল হাঁসপাতালে থাকার পর রোজ সাহেব নিজেই তাহাকে রাখিয়া ছিলেন এবং মা বাপের মত যত্ন করিতেন। রোজ সাহেব বিলাত চলিয়া যাওয়ার পর হইতে সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে।

উক্ত ইংরাজ মহিলা যখন ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন সে জোড় হাত করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় ঈশ্বর এবং স্বর্গ সম্বন্ধে কত কথা বলিল। এই মনুষ্যাকৃতি ব্যাঘ্র-স্বভাব বিশিষ্ট জীব মদ খাইতে বিশেষ পটু। একটী ইংরেজ মহিলা ইহাকে অনেক দিন খাওয়া পরা দিতেন, কিন্তু হতভাগা ভয়ানক মদ খাইত ও খারাপ ব্যবহার করিত। অবশেষে সেখান হইতে পালাইয়া আর পুনরায় যায় নাই। এখনও যে পয়সা কড়ি পায় তাহা দিয়া মদ খাইয়া থাকে।

অদ্ভুত জন্তুর আচার ব্যবহার প্রায়ই মানুষের ন্যায় হইয়াছে। এখন কাহারও কোন ক্ষতি করে না। শুনা গিয়াছে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন কোন স্ত্রীলোক তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে ভয়ানক রাগান্বিত হইয়াছিল এবং তাহাকে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিল। ইহা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে আর কিছু শুনা যায় নাই।

এই গল্প পড়িয়া কি তোমরা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণার প্রমাণ পাইবে না? তাঁহার সৃষ্ট জীব জন্তুকে তিনি কত ভাবে লালন পালন করিতেছেন ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়! যে বাঘ মানুষের ভক্ষক, ঈশ্বরের আদেশে সেই আবার রক্ষক হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের কৌশল!! ধন্য তাঁহার মহিমা!!!

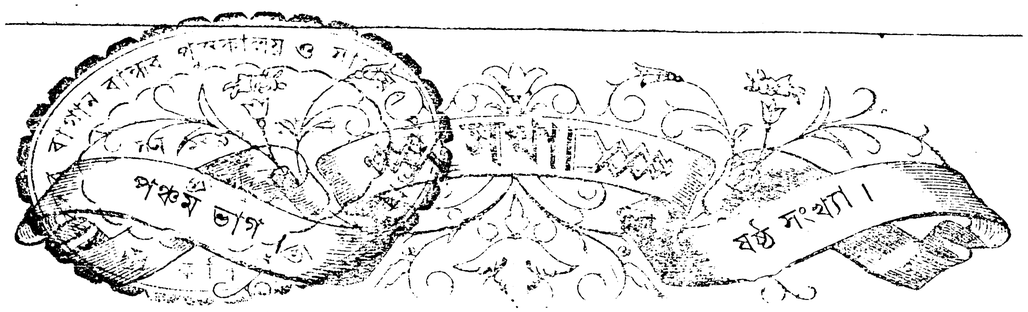

জুন, ১৮৮৭।

পাখীদের দেশ ভ্রমণ।

(৬৮ পৃষ্ঠার পর)।

হাঁস ভিন্ন আরও অনেক প্রকার পক্ষী শীতকালে এদেশে আইসে এবং গ্রীষ্ম কালে আবার চলিয়া যায়। সে পক্ষীগুলি যে কি কি তাহা বলিয়া দেওয়া সহজ নয়, কারণ তাহাদিগের অধিকাংশেরই বাঙ্গালা নাম নাই। তবে সাধারণতঃ এই শ্রেণীর পক্ষীকে "কাদাখোঁচা" বলিয়া থাকে, কারণ ইহারা নদী, তড়াগ ও বিলের ধারে ধারে চরিয়া বেড়ায়, এবং ঠোঁট ও পা দ্বারা নরম মৃত্তিকা হইতে ছোট ছোট ভেক ও শম্বুক তুলিয়া আহার করে। হাঁসের মত ইহারা সাঁতার দিতে পটু নয়। ইহারা যে হাঁসের মত সাঁতার দিতে পারে না কেন, তাহা এই দুই শ্রেণীর পক্ষীর পা দেখিলেই সহজে বুঝা যায়। হাঁস জাতীয় পক্ষীর পায়ের আঙ্গুলগুলি একখানি পাতলা চর্ম্ম দ্বারা আবৃত, কাদাখোঁচার আঙ্গুলগুলি মুক্ত, হাঁসের মত গোড়া নয়। হাঁসের পায়ের গঠন এইরূপ হওয়াতে তাহাদিগের পক্ষে সাঁতার দেওয়া বড় সুবিধা,—কারণ দুখানি পা দুখানি দাঁড়ের কাজ করিয়া থাকে। তোমরা হয় ত অনেকেই ডাক পাখী (ডাহুক) দেখিয়াছ,—আর যদি না দেখিয়া থাক তবে এবার সুবিধা পাইলেই দেখিবে, কাদাখোঁচা পাখীর আকার অবয়ব অনেকটা এই ডাক পাখীর মত।

হাঁস, কাদাখোঁচা প্রভৃতি পক্ষীগণ যখন এদেশে আইসে তখন তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাজ, ঝহিরি, লঘুঘর প্রভৃতি কতকগুলি শিকারী পক্ষীও এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নিরীহ জলচর এবং অন্যান্য পক্ষীগণকে মারিয়া আহার করে। গরিব হাঁস ও কাদাখোঁচা বেচারিদের আর নিস্তার নাই, শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবে এবং যথেষ্ট আহার পাইবে বলিয়া তাহারা যদি এদেশে আসিল, এখানেও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার শত্রু আসিয়া উপস্থিত! ঐ সকল শিকারী পক্ষীরা হাঁস এবং অন্যান্য পক্ষীর প্রাণ বধ করিয়া আহার করে শুনিয়াই হয়ত তোমরা চটিয়া উঠিবে। বলিবে, ঐ নিষ্ঠুর পক্ষীরা অন্য কিছু আহার করে না কেন? কিন্তু ঐ শিকারী পাখীদিগেরই বা দোষ কি? তাহারা ত আর আমোদ করিয়া কিম্বা নিছা মিছি জব্দ করিব বলিয়া অন্য পাখী মারিয়া খায় না। তাহাদের আহারই হ'ল মাংস। ধান, ছোলা, গম কিম্বা ফল মূল খাইয়া তাহারা জীবন ধারণ করিতে পারে না, কাজে কাজেই তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় পক্ষী

এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু মারিয়া আহার করিতে হয়। একেই বলে জীবন-সংগ্রাম। সমস্ত প্রাণীদিগের মধ্যেই এই নিয়ম বিদ্যমান। তোমরা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই পড়িয়াছ যে, কাদাখোঁচা প্রভৃতি পাখীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক ও শম্বুক তুলিয়া খায়, ভেকগণ আবার কীট, পতঙ্গ ধরিয়া আহার করে। এইরূপ যে দিকে তাকাইবে সেই দিকেই প্রাণীদিগের মধ্যে খাদ্য ও খাদক সম্বন্ধ দেখিবে। আপাততঃ এ সকল বড় অন্যায় বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু তোমরা প্রকৃতির তত্ত্ব যতই অনুসন্ধান করিবে ততই দেখিতে পাইবে যে, এই অন্যায় ও অত্যাচারের মধ্যেও একটি সুনিয়ম আছে।

গতবারের 'সখা'তে তোমরা পড়িয়াছ যে, এখন আর খঞ্জন পাখী এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারা যে এখন কোথায় বাস করিতেছে তাহা ঠিক করিয়া বলা সহজ নয়, তবে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, তাহারাও এখন মধ্য এবং উত্তর আসিয়ার স্থানে স্থানে বাস করিতেছে, শীতের আরম্ভেই আবার এদেশে ফিরিয়া আসিবে। খঞ্জন ভিন্ন আরও অনেক পাখী এখন এদেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে। তোমরা যদি যত্ন করিয়া এক খানি স্মরণ পুস্তকে (Note Book) প্রতিদিন যাহা দেখিতে ও শুনিতে পাও তাহা লিখিয়া রাখ তাহা হইলে ছয় মাস কিম্বা এক বৎসর পরে দেখিতে পাইবে যে, নূতন নূতন অনেক বিষয় শিখিয়াছ, তখন আপনা আপনিই জানিতে পারিবে কোন সময়ে কি পাখী আসে এবং কি পাখী চলিয়া যায়।

হাঁস, কাদাখোঁচা, খঞ্জন প্রভৃতি যাহাদিগের কথা এতক্ষণ বলা হইল তাহারা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া অন্য দেশে চলিয়া যায়, কিন্তু এ সকল ভিন্ন আরো অনেকগুলি পাখী আছে যাহারা ভারতবর্ষের মধ্যেই কখনও এদেশ কখনও ওদেশ করিয়া বেড়ায়। আমাদের দেশে এখন আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি নানাপ্রকার সুমিষ্ট ফল পাকিয়াছে, এখন এই সকল ফলের বাগানে কত প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কিছু দিন পরে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না; কারণ ফল ফুরাইয়া গেলে পক্ষীরা আহার অন্বেষণের নিমিত্ত অন্য স্থানে চলিয়া যাইবে। শীত কালে যখন এদেশের নদ নদীর জল কমিয়া যায় তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গাঙ্গশালিক আসিয়া নদীর উচ্চ পাড়ে গর্ত্ত করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে এবং আবার যখন নদীর জল বৃদ্ধি হয় তখন অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

'সখা'র পাঠক পাঠিকা! এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ কত প্রকার কারণে পক্ষীগণকে কখনও এদেশ কখনও ওদেশ করিয়া বেড়াইতে হয়। কেবল যে ভারতবর্ষেই পাখীদের এইরূপ দেশ ভ্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নয়, ইউরোপ, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও তাহারা সুবিধা ও অসুবিধা অনুসারে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। তোমরা সকলেই জান—ইউরোপ শীত প্রধান দেশ, যে সকল পক্ষী বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে বাস করে তাহারা শীতের প্রারম্ভে উত্তর আফ্রিকা কিম্বা অন্য কোন স্থানে চলিয়া যায়, কারণ এই সময়ে ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রদেশে এত প্রবল শীত হয় যে, এই সকল পাখী তাহা সহ্য করিতে পারে না, বিশেষ এই সময়ে সমস্ত দেশ বরফে ঢাকিয়া যায় বলিয়া আহার প্রাপ্তিরও বিশেষ অসুবিধা হয়। আবার যে সকল পাখী

শীত কালেও ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, উত্তর ফ্রান্স, হলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাস করে তাহারা গ্রীষ্মকাল আসিলে ইউরোপের আরও উত্তর দিকে এমন কি লাপলাণ্ড দেশ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

বায়ু-মণ্ডল।

এবার পাঠক পাঠিকা! তোমরা শুনিয়া থাকিবে এবার একটা ভয়ানক বিপদ ঘটিয়াছে। রথযাত্রার সময়ে লক্ষ লক্ষ যাত্রী জগন্নাথ ক্ষেত্রে যায়। অনেক লোকে প্রায় স্থল পথে হাঁটিয়া জগন্নাথে যাইত। কিছুকাল হইতে যাত্রীদিগকে কলের জাহাজে করিয়া লইয়া যাওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অনেক যাত্রী এইরূপে গিয়া থাকে। এবার প্রায় ৭৫০ জন যাত্রী "সার জন লরেন্স" নামক একখানি কলের জাহাজে আরোহণ করিয়া উড়িষ্যাতে যাইতেছিল। গঙ্গাসাগরে ভয়ানক"সাইক্লোন" (ঘূর্ণী-ঝড়) উপস্থিত হয়। এই সাইক্লোনে সেই সাতশতের অধিক যাত্রী সমেত জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে। আমরা কলিকাতায় বসিয়া এই "সাইক্লোনের" আভাস পাইয়াছিলাম। যে দিন গঙ্গা সাগরে ঝড় হয় তার পূর্ব্বদিন হইতেই কলিকাতাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমরা আর কয়েকবার এইরূপ ঝড় দেখিয়াছি; আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, কলিকাতাতেই বা ঐরূপ ঝড় হয়। ২৬শে মে বৃহস্পতিবার তার যোগে কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে গঙ্গাসাগরে ভয়ানক ঝড় হইতেছে, বায়ুর গতি এত দ্রুত যে ঘণ্টায় ৬৭ মাইল ছুটিতেছে। পূর্ব্বদিন অর্থাৎ বুধবার হইতেই গঙ্গাসাগরে এই ঝড় আরম্ভ হয়। তখন আমরা জানিতে পারি নাই যে, ঐ দারুণ ঝড়ে বাঙ্গালা দেশের অনেক গৃহে হাহাকার ধ্বনি উঠিবে। বুধবার "সারজন লরেন্স" নামক একখানি কলের জাহাজ প্রায় ৭৫০ জন যাত্রী লইয়া কলিকাতা হইতে গঙ্গাসাগরে প্রবেশ করে। জাহাজখানি যখন সমুদ্রে প্রবেশ করিতে যায় তখনই ঝড়ের সঞ্চার হইয়াছিল। এরূপ শুনা যায় যে, জাহাজখানি যখন সমুদ্রে প্রবেশ করিতে যায় তখন তীরের বন্দর হইতে বিপদ-সূচক নিশান দেখান হইয়াছিল। তাহার অর্থ এই—"আকাশের অবস্থা বড় ভয়-জনক, সমুদ্রে প্রবেশ করিও না।" কিন্তু ঐ জাহাজের কাপ্তেন আরভিং সাহেব সে নিশান গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি নাকি আরও কয়েকবার ঝড়ে পড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। তিনি সাহস করিয়া জাহাজ লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন, এই মাত্র লোকে দেখিল, তার পর সে জাহাজের কি হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। জাহাজের সংবাদ না পাওয়াতে গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে তিন চারিখানি জাহাজ সারজন লরেন্সের অন্বেষণে পাঠাইলেন। তাহারা চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে ভয়ানক দৃশ্য সকল চক্ষে পড়িতে লাগিল। কোথাও ৫।৭টী স্ত্রীলোক জড়াজড়ি করিয়া মরিয়া ভাসিয়া আসিতেছে, শরীরগুলি পচিয়া ঢোল হইয়াছে; কোথাও বা জননী ক্ষুদ্র শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া মরিয়া

ভাসিয়া আসিতেছে; কি অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ! ভয়ানক বিপদের সময়েও অঞ্চলের ধনটীকে ছাড়ে নাই! কোথাও কোন ইংরেজের দেহের কতকটা ভাসিয়া আসিতেছে, অবশিষ্ট অংশ হাঙ্গরে খাইয়া ফেলিয়াছে। কোথাও বা কোন ইংরাজের নামাঙ্কিত কাঠের বাক্স তীরের নিকট ভাসিতেছে। কাপ্তেন সাহেবের বাক্স এইরূপে পাওয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক দৃশ্য! এদিকে বঙ্গদেশে ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কি জানি এই বর্ণনাগুলি পড়িতে হয়ত সখার কোন পাঠক বা পাঠিকার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে! হয়ত তাঁহাদের কোন আত্মীয় স্বজন ঐ ভয়ানক দিনে দুরন্ত সাগরের গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছেন! যদি সখার পাঠক পাঠিকার মধ্যে এমন কেহ থাকেন, তাঁহার সান্ত্বনার জন্য আমরা কি বলিব? এই ভয়ানক বিপদের বার্ত্তা শুনিয়া আমরা যে প্রাণে কত বেদনা পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। যদিও আমাদের নিজ বাড়ীর লোক কেহ ঐ জাহাজে ছিলেন না, কিন্তু আমাদের প্রিয় জন্মভূমির শতশত সন্তান একদিনে অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ-ত্যাগ করিল ইহাতে কাহার প্রাণে না আঘাত লাগে! অতএব তাঁহাদের দুঃখে সমুদায় দেশের লোক দুঃখিত। এইমাত্র সান্ত্বনা।

এই বিপদের সমাচার শুনিয়া পাঠক পাঠিকার মনে কি প্রশ্নের উদয় হইতেছে! তোমরা অনেকে বোধ হয় জাহাজ দেখ নাই। একটী বড় জাহাজ একটী সহর। তাহা জলে ডোবা বড় সহজ নয়। অধিক কি ৭৫০ জন যাত্রী ও তাহার উপরে আবার জাহাজের চাকর বাকর এই সমুদায় লোক লইয়া যে জাহাজ যাইতেছিল, তাহা কত বড় হইবার সম্ভাবনা তাহা তোমরা সহজেই অনুমান করিতে পার। এতবড় একখানি জাহাজ জলে ডুবাইয়া দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। ইহা-তেই তোমরা অনুমান করিতে পার সেই "সাই-ক্লোনের" জোর কত। ১২৭১ সালে কলিকাতার নিকটে এইরূপ এক সাইক্লোন হইয়াছিল, তাহার জোর দেখিয়া একজন কবি একটী গান রচনা করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"বাপ্‌রে পবনের পায়ে নমস্কার"

বাস্তবিক পবনের এই বিক্রম দেখিলে ঐ কথাই বলিতে হয়। তোমাদের কি "সাই-ক্লোনের" বিষয় কিছু জানিতে ইচ্ছা হইতেছে না? সাইক্লোন কেন হয়? ইহার এত জোর কেন? এসকল কি জানিতে ইচ্ছা কর না? যদি কর, তবে গোড়া হইতে আরম্ভ করা যাউক, মন দিয়া শুন।

তোমরা যদি খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া আকা-শের দিকে চাহিয়া দেখ উপরে কিছুই দেখিতে পাও না; কেবল শূন্য। বাস্তবিকই কি সব শূন্য? প্রাতঃকালে যখন ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস বহিতে থাকে, ও শরীর স্নিগ্ধ করে তখন কি বলিতে পার সমুদয় শূন্য? বোধ হয় পার না। বোধ হয় তখন জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে সব শূন্য নয়, ইহার মধ্যে বাতাস আছে। বাস্তবিক কথাটা এই, পুষ্করিণীর জলে একটি খেলিবার মার্ব্বল ফেলিয়া দিলে সেটী যেমন জল রাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকে তেমনি এই পৃথিবী বায়ু সাগরের মধ্যে ডুবিয়া আছে। মৎস্যেরা যেমন জলরাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকে, জলরাশির মধ্যেই ক্রীড়া করে, ও বিচরণ করে, আমরা তেমনি বায়ু-রাশির মধ্যে ডুবিয়া আছি, বায়ু-রাশির মধ্যে ক্রীড়া করিতেছি, বায়ু-রাশির মধ্যেই বিচরণ করিতেছি। যেন একটী বায়ুময় কোষের মধ্যে পৃথিবী আবৃত হইয়া রহি-

য়াছে। এই বায়ুময় কোষকে বায়ু-মণ্ডল বলা গেল।

পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে কতদূর উপর পর্য্যন্ত এই বায়ু-ময় কোষ পাওয়া যায় তাহা বলা যায় না। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, পৃথিবীর উপরে ৯০ মাইল অর্থাৎ ৪৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত এই বায়ু-মণ্ডল পাওয়া যায়, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আরও অনেক উপরে অর্থাৎ ২১২ মাইল উপরে ও পাওয়া যায়। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ বলিতেন বায়ুর ভার নাই, কিন্তু ইউ-রোপীয় পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, বায়ুর ভার আছে। এমন কি এক স্কোয়ার ইঞ্চ অর্থাৎ এক বুরুল লম্বা ও এক বুরুল প্রস্থ এই পরিমাণ ভূমির উপরে প্রায় সাত সের বায়ু থাকে। তোমরা বলিতে পার তবে ত আমাদের মাথার উপরে অনেক মণ বায়ু আছে, তবে আমাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে না কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার। ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে তোমা-দিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। জলের ভার আছে তাহা ত জান। এক কলসী জল তুলিতে তোমাদের কত কষ্ট হয়! ভাল এক কলসী জলের যদি এত ভার হইল, তাহা হইলে একটা মানুষের শরীরের উপরে কত জলের ভার হওয়া সম্ভব, ভাবিয়া দেখিবে। কিন্তু তোমরা যখন ডুব সাঁতার দেও তখন কি ভারে শরীর পিষিয়া যায়? অধিক কি, তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, জল পূর্ণ কলসীটা উপরে তুলিতে কোমর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; সেই জল পূর্ণ কলসীটা জলে ডুবাইয়া দেখিবে, অনায়াসে নাড়িতে পারিবে। ইহার কারণ কি? কারণ এই, জলের উপরে বাতাসের যে চাপ পড়ে তাহা জলের সকল দিকে ও সকল ভাগে সমানরূপে সঞ্চা-রিত হয়। অর্থাৎ কোন দেয়ালে যদি তুমি একটী গজাল মার, ও সেই গজালের উপরে ঘন ঘন হাতুড়ির আঘাত করিতে থাক, যে ভূমিটুকুর উপরে গজালটী বসিতেছে, হাতুড়ির যত জোর সেই ভূমি টুকুর উপরেই লাগে; তাহার পাঁচ হাত দূরের ইষ্টকে সে জোর পৌছে না। জল কিম্বা বাতাসের প্রকৃতি এরূপ নয়। পুষ্করিণীর এক দিকে যে শক্তি প্রয়োগ করা যায়, সকল দিকের জলেই সেই শক্তি অনুভব করিবে। তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার; কাণায় কাণায় জল পরিপূর্ণ একটী বড় গামলা বা টবের একপার্শ্বে যদি একটী বড় জিনিস জোরে ডুবাইয়া দেও দেখিবে অপর পার্শ্ব দিয়া জল উছলিয়া পড়িতেছে। কে অপর-দিকের জল ঠেলিয়া তুলিল? তুমি জিনিসটীকে ডুবাইবার জন্য একদিকে যে বল প্রয়োগ করিতেছ তাহা যদি অপরদিকে না যাইবে তবে কে সে জলকে ঠেলিয়া তুলিল?

এখন একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, তুমি জলপূর্ণ যে কলসীটি পুনরায় জলে ডুবাইতেছ, তাহার ভিতরে যেমন জলের ভার আছে, তেমনি তাহার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, অধো, ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দিক হইতে জলের ভারের শক্তি, ও উপরের বায়ুর ভারের শক্তি তাহাকে ঠেলিয়া রাখিতেছে, এইজন্যই তোমার হাতে জোর লাগিতেছে না। আমরা বায়ুসাগরে যখন বেড়াই, তখনও এই কারণে মস্তকের উপরের বায়ুর ভার অনুভব করিতে পারি না।

বাতাসের ভার আছে, একথাটা যদি একবার বুঝিতে পার তাহা হইলে একথাটীও সহজে বুঝিতে পারিবে যে, উপরের বায়ুর অপেক্ষা পৃথি-বীর নিকটের বায়ুর উপরে অধিক ভার সুতরাং তাহার ঘনত্ব অধিক। অর্থাৎ যদি বেলুনে

করিয়া ক্রমাগত উপরে উঠিয়া যাও, যতই উপর উঠিবে ততই পাতালা বায়ু দেখিবে। এমন কি ৫।৬ মাইল উপরে বাতাস এত পাতলা যে, সেখানে বায়ুর অভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলাই দুষ্কর।

বায়ু-মণ্ডল কি কি দ্রব্যে গঠিত? —বায়ু-মণ্ডলে অনেক প্রকার দ্রব্য আছে। প্রায় ৮০ ভাগ নাইট্রোজান নামক একপ্রকার গ্যাস, ২১ ভাগ অক্সিজেন নামক গ্যাস, অল্পাংশ কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস, ও এমোনিয়া প্রভৃতি অন্যান্য অংশও আছে। তদ্ভিন্ন বায়ু-মণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম জলীয় পরমাণুসকল বাষ্পাকারে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহার সকলগুলিই অতিশয় প্রয়োজনীয় পদার্থ। এই সকলের দ্বারা কি কি কাজ হয় একথা ভাবিলে, বিশ্বকর্ত্তার অপূর্ব্ব পালনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নাইট্রোজান 'গ্যাস' জীব-দেহের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহাতে আমাদের দেহপুষ্টি হয়। অক্সিজেন গ্যাস অগ্নিকে রক্ষা করে, ঐ গ্যাসই অগ্নির খাদ্য বস্তু। অক্সিজেন না থাকিলে অগ্নি জ্বলে না। আমাদের রক্তাধারের পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাসে নিরন্তর অক্সিজেন গ্যাস ভিতরে লইতেছি ও কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস উদ্গীরণ করিতেছি। কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস আমাদের পক্ষে বিষাক্ত দ্রব্য কিন্তু উদ্ভিদদিগের তাহা খাদ্য। আবার অক্সিজেন গ্যাস তরুলতার পক্ষে বিষাক্ত, আমাদের দেহের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এইরূপে আমরা যাহা উদ্গীরণ করিতেছি, তাহা লইয়া বৃক্ষেরা প্রাণধারণ করিতেছে। আবার তাহারা যাহা উদ্গীরণ করিতেছে তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা বাঁচিতেছি। বৃক্ষেরা আমাদের কেমন বন্ধু!! বিধাতা কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে পরস্পরের বিনিময় দ্বারা আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

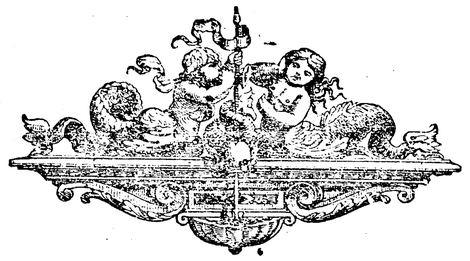

পিপীলিকার উপদেশ।

(৭০ পৃষ্ঠার পর।)

পিঁপড়েদের গোয়াল ঘর দেখিয়া আসিলাম। তাহার পর আহারাদি করিয়া দুজনায় বাহির হইয়া গ্রাম দেখিতে গেলাম। বন, জঙ্গল, মাঠ, ঘাট সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম, গাছে কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কত পাখীরা সুমিষ্ট গান করিতেছিল। এরূপ নানা বস্তু দেখিতে শুনিতে বেলা অবসান হইয়া আসিল। পাঁচ হাত গাছের পঁচিশ হাত ছায়া হইতে লাগিল। সূর্য্য ডুবু ডুবু হয়। তখন আমরা বাড়ী ফিরিতে লাগিলাম। আসিবার সময়ে পথিমধ্যে একস্থানে ফোয়ারার মত ধূলি জোরে উপরদিকে উঠিতেছে দেখিলাম। কেন ওরূপ হইতেছে কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না; বড় আশ্চর্য্য হইলাম। আমি আমার বন্ধু পিঁপড়ের দিকে চাহিয়া দেখি যে, তাঁহার মুখটী শুকাইয়া গিয়াছে, ভয়ে জড় সড় হইতেছেন। আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি ভাই'। সে বলিল "ভাই এখানে আমাদের অনেক শত্রু আছে। আমার প্রাণে বাঁচা বড় দুষ্কর। ঐ যে ধূলা উঠিতেছে ও কি জান ও বাঘে ধূলা উঠাইতেছে। বাঘ কি বুঝিতে পারিলে না। ওরা এক রকম পোকা, পিঁপড়ে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা খাইতে ভাল বাসে। ওরা মাটীতে আমাদের জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে, আমরা ফাঁদে পড়িলেই আমাদের ধরিয়া খায়। ওরা বড় মজার ফাঁদ পাতে। প্রথমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটীতে বড় একটি গোল দাগ দেয়। ওরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না, কেবল পিছন দিকে হাঁটে। সেই দাগের ভিতরে মাটি খুঁড়িয়া ফেলিতে থাকে। মাটি গর্ত্তের বাহিরে ফেলিবার সময়ে ধূলার ভিতর মাথাটী গুজিয়া দেয়, তার পরে জোরে মাথাটী সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া দেয়, অমনি মাথার উপরের ধূলিগুলি দূরে গিয়া পড়ে। ঐরকম করিতেছিল বলিয়া ঐ ধূলি উঠিতেছিল। যে গর্ত্তটি খোঁড়ে সেটা দেখিতে ঠিক তেল ঢালিবার ফনেলের মত। মুখটী খুব চৌড়া, তার পর শেষভাগটী ক্রমে সরু হইয়া আসিয়াছে। গর্ত্তের চারিপাশে এমনি ভাবে আল্‌গা করিয়া ধূলি রাখিয়া দেয় যে, তার কাছে গেলেই গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে হয়। গর্ত্তের ভিতর ধূলা ঢাকা দিয়া কর্ত্তা বসিয়া থাকেন কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, ছোট কোন পোকা গর্ত্তের নিকট গেলেই, এমনি জোরে ভিতর হইতে ধূলা ছুড়িয়া মারে যে, সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া যায়। তখনি তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত চুষিয়া খায়। খাওয়া হইয়া গেলে খোসাটা ঐ রকম করিয়া ছুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয় ও নূতন শীকারের আশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। গর্ত্তটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পোকাগুলি বড় ছোট, তোমার মাথার মত বড় হইবে কিনা সন্দেহ। অথচ এত বড় গর্ত্ত এক ঘণ্টার মধ্যে তৈয়ার করিয়া শীকার ধরিবার আশায় বসিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং মেটে, মাথা আর গলা সমস্ত শরীরের পরিমাণে খুব ছোট। মুখের সম্মুখে খুব শক্ত ছোট দুখানি কাস্তের মত শুঁড় বা দাঁত আছে তাহা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া খায়। ইহাদের চলন বড় মজার, মাটিতে কেমন গুঁড়ি গুঁড়ি হইয়া থাকে; এক এক হেঁচকা মারে আর অনেক পিছনে গিয়া পড়ে। এইরূপে পিছাইয়া যাইতে থাকে, সম্মুখে যাইতে পারে না, আর আমাদের মত ক্রমাগত পা দিয়া হাঁটিতে পারে না। এই জন্য শীকারের পিছনে পিছনে ছুটিয়া ধরিতে পারে না। কাজেই ফাঁদ পাতিয়া শীকার ধরিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ইহাদের অনেক দিন থাকিতে হয় না; কিছুদিন পরে একটা গুটি করিয়া কিছুকাল তাহার ভিতর থাকিবে তার পর ফড়িংএর মত হইয়া উঠিয়া যাইবে। এখনকার অবস্থা বড় কষ্টজনক। তবে যদি ভবিষ্যতে সুখের জীবনের আশা না থাকিত, তবে ইহাদের বাঁচিয়া থাকা কি দায়ের হইত।"

"এখানে ইহাদের অনেক গর্ত্ত আছে তাই আমার ভয় হইতেছে।" আমি বলিলাম "ভয় কি আমার হাত ধরিয়া চল, আমি থাকিতে কোন ভয় নাই।" আমরা সাবধানে চলিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম। পিঁপড়েদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময়ে তাদের প্রহরীরা আমার দিকে কট মট করিয়া তাকাইতে লাগিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে। কলিকাতায় বাবুদের বাড়ীতে

যেমন গ্যাসের আলোকে ঘর আলোকিত হয়, অন্যান্য লোকের ঘর যেমন কেরোসিন ল্যাম্পে বা প্রদীপে আলোকিত হয়, ইহাদের সে সব কিছু নাই অথচ ইহাদের ঘরগুলি সব আলোকময়। পিঁপড়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ আলো কোথা হইতে আসিল, সে হাঁসিয়া বলিল, "সেওলার মত ছোট ছোট একরকম ব্যাংএর ছাতার গাছ আছে রাত্রে খুব চক্‌চক্ করে, এ তারি আলো। আমরা ঘর আলোর জন্য এগুলিকে এখানে রোপণ করিয়াছি। কেন, তুমি এরকম গাছ দেখ নাই? তোমরা কখন মাঠে ঘাটে বেড়াও না, তা জানিবে কি করিয়া। না দেখিলে শুনিলে কি কিছু জানা যায়। আমরা কত দেশ বেড়াইয়াছি, কত দেখিয়াছি, তাই কত শিখিয়াছি।" তার পর সে আমাকে কিছু খাবার দিয়া একটী ঘর দেখাইয়া দিল আর বলিল "এইখানে রাত্রে ঘুমাইও।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। খানিক পরে আমি ঘরের দোর বন্ধ করিয়া শুইয়া আছি এমন সময়ে কে আমার দোরে আসিয়া "এ ঘরে কে" বলিয়া

ধাক্কা দিতে লাগিল। আমি বলিলাম "তুমি কে? কি চাও।" সে রাগিয়া বলিল "তুমি কে? ভাল চাও ত শীঘ্র দোর খোল।" আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি দোর খুলিয়া দিলাম আর বলিলাম "আমি তোমাদের বন্ধু, তোমাদেরই একজন আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আনিয়াছেন," তখন সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। আমি গিয়া শুইলাম, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম আসিল না। কত দুর্ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে ঘুম আসিল। ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। যেন পুকুরের উপর এক ভেলা রহিয়াছে। হঠাৎ ভেলার পাশে এক প্রকাণ্ড মাথা হুস্ করিয়া উঠিল। তার চোখ দুটী কট্‌মট্ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, যেন দুটা আগুন জ্বলিতেছে। বড় ভয় হইল, পলাইবার জন্য মুখ ফিরাইলাম। সে দিকেও ঐরূপ একটা প্রকাণ্ড মাথা, ঐ রকম দুটা চোখ জ্বল্‌ছে। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে বিকটাকার মূর্ত্তি সব জল হইতে উঠিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, সকলেরই চক্ষু আমার দিকে। সে সময়ে দেখি আমার পিঁপড়ে বন্ধু বলিতেছে "ঐ দেখ ভেলায় একটা ছিদ্র আছে, আইস ইহার ভিতর দিয়া জলে ডুব দি, আর উহারা ধরিতে পারিবে না।" ইতিমধ্যে শত শত বিকট মূর্ত্তি আমাকে টানিয়া জলের ভিতর লইয়া গেল—নীচে নীচে আরও নীচে লইয়া যাইতে লাগিল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে, এমন সময়ে পূর্ব্বের সেই মাকড়সা আসিয়া বলিতে লাগিল "কেমন বেশ হয়েছে। আমি আগেই ত সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, বারণ করিয়াছিলাম পিঁপড়েদের ওখানে যাইও না।" তার পর দেখি যে এক ক্ষুদ্র কারাগারে বদ্ধ আছি। অনেকগুলি পিঁপড়ে ক্রোধান্ধ হইয়া দোর ঠেলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল, "উহাকে মারিয়া ফেল, খাইয়া ফেল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি এক কোণে জড় সড় হইয়া করজোড়ে কাতরে মাপ, চাহিতে লাগিলাম, বলিলাম "দোহাই তোমাদের! আমাকে রক্ষা কর, তোমাদের নিজের লোক আমাকে আনিয়াছে। কোথায় আমার বন্ধু আমাকে রক্ষা কর।" এ সময়ে আমার বন্ধু আসিয়া আমাকে ঠেলিতে লাগিল আর বলিল "ওঠ, বেলা হইয়াছে।" আমি উঠিয়া বসিলাম। সে বলিল "ওকি কাঁপ্‌ছ যে, তোমার গা দিয়া ঘাম বাহির হচ্চে যে, কি হয়েছে কি?" আমি লজ্জায় কিছু বলিলাম না। তার পর উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া একটু আহারাদি করিলাম।

ক্রমশঃ

টাকা কড়ি।

তোমরা যে সাদা সাদা গোল গোল চক্‌চকে জিনিষগুলি দেখিতে পাও, যাহার বলে ভাত খাও কাপড় পর, যাহার মধুর ঝন্‌ঝন্ টুন্‌টুন্ শব্দে মনটা কেমন আনন্দে নাচিতে থাকে সেই টাকা যদি সংসারে

না থাকিত তবে কি হইত বলিতে পার? একটা গানে আছে,

"যার পয়সা নাইরে ভাই
সংসারে তার মরণ ভাল।"

এমন জিনিষ না হইলে কি পৃথিবী চলিত? এরূপ অবস্থা হয়তো তোমাদের কল্পনায়ও আসে না; অথচ পৃথিবীতে এমন একদিন ছিল যখন টাকা কড়ি কিছুই ছিল না। অবশ্য সে দুই এক শত বৎসরের কথা নয়; পৃথিবীর অতি আদিম কালে এইরূপ অবস্থা প্রচলিত ছিল।

এখন যেমন কোন জিনিষের আবশ্যক হইলে টাকা দিয়া আমরা কিনিয়া থাকি তখন লোকে তাহা করিতে পারিত না। এখন টাকা দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কিনিতে পার। লোকে কথায় বলে "পয়সায় বাঘের দুধও মেলে।" অর্থাৎ টাকা পয়সা হইলে সংসারে কিছুই দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ পৃথিবীতে আর টাকা পয়সা কিছুই নাই। তোমার হয়ত কোন জিনিষ প্রচুর পরিমাণে আছে, আবার কোন জিনিষ হয়ত কিছুই নাই। যে লাঙ্গল চাষ করিয়া ধান জন্মায় তাহার কেবল ধানই আছে, যে কাপড় তৈয়ার করে তাহার কেবল কাপড়ই আছে, যে বই লেখে তাহার কেবল বইই আছে অর্থাৎ যাহার যে ব্যবসা তাহার তাহাই আছে। যে ব্যবসার জন্য যে সমুদায় জিনিষ পত্রের প্রয়োজন তাহাই বা কোথা পাওয়া যায়? তবে কি পৃথিবীতে তখন ব্যবসাদি চলিত না? যাহার ধান আছে সেইই কেবল ভাত খাইত আর সকলে কি উপবাস করে দিন কাটাত? যাহার কাপড় আছে সেইই কেবল কাপড় পরিত আর সকলে কি ন্যাংটা হইয়া থাকিত? না, তাহা নয়। তখনও সকলে আবশ্যকীয় সমুদায় দ্রব্যই পাইত কিন্তু অত্যন্ত কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। মনে কর, তোমার অধিক কাপড় আছে কিন্তু খাইবার কিছু নাই; তখন তোমার এমন লোক খুঁজিতে হইত যাহার কাপড়ের প্রয়োজন আছে। যদি তাহার নিকট খাদ্যদ্রব্য অধিক থাকিত তবে তোমার বেশী কষ্ট পাইতে হইত না কিন্তু যদি তাহা না হইয়া তাহার নিকট কতকগুলি টেবিল চেয়ার থাকিতো তবে তোমার কি কষ্টই হইত!! সেই গুলি লইয়া আবার তোমাকে খুঁজিতে হইত "কাহার নিকট খাদ্য দ্রব্য অধিক আছে অথচ তাহার টেবিল চেয়ারের আবশ্যক?" হয়তো তোমার কপালক্রমে সেখানেও বিফল হইতে হইত আবার তোমাকে "কে নেবে গো" "কে নেবে গো" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে হয়তো তোমার পরিবারের লোকদিগকে ১০ দিন না খাইয়া থাকিতে হইত। এই প্রথাকে "বিনিময়" প্রথা বলা যায়।

লোকে যখন এইরূপ অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিল এবং সমাজের অবস্থা যখন ক্রমে উন্নত হইতে লাগিল তখন সকলেই একটা সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে উদ্যোগী হইল। সকলে একমত হইয়া একটা কোন পদার্থকে সকল প্রকার জিনিষের সাধারণ বিনিময়ার্থ নিযুক্ত করিল। ইহাতে কেমন সুবিধা!! যে কাপড় বিক্রী করিবে সেও সেই সাধারণ পদার্থের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিত, যে কাপড় কিনিবে সেও সেই সাধারণ পদার্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে পারিত। তখন নানা দেশে নানা প্রকার পদার্থ দ্বারা এই সাধারণ বিনিময়ের কার্য্য চলিতে লাগিল। ইহার নাম "মুদ্রা" এবং সাধারণ ভাষায় ইহাকে

"টাকা কড়ি" বলে। কত দেশে কত প্রকার দ্রব্য এই সাধারণ বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত তাহা শুনিলে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। চীন দেশীয় লোকেরা কিছুদিন পূর্ব্বে চা পাতা দ্বারা টাকা কড়ির কাজ চালাইত। আফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতি এখনও এক প্রকার কড়ি ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রাচীন আরব দেশীয়েরা ঘোড়া গরু দ্বারা বিনিময় করিত। যখন কেহ কোন জিনিষ কিনিতে যাইত তখন এক পাল গরু, ঘোড়া, ছাগল তাড়াইয়া লইয়া যাইত, আবার যে বিক্রয় করিত তাহারও এইরূপ জিনিষ বেচিয়া একপাল পশু তাড়াইয়া লইয়া যাইতে হইত। ইহা হইতেও হাসির কথা আছে। আবিসিনিয়া দেশে লবণ মুদ্রারূপে বিরাজ করিতেন। কোন কোন দেশে চামড়া দিয়াও টাকার কাজ চালান হইত।

এ সকল অসভ্য দেশের কথা। সভ্য দেশে সর্ব্বত্রই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। সকল সভ্য দেশেই এই এক রূপ নিয়ম হইবার কারণ কি? যে সমুদায় জিনিষ সহজে পাওয়া যায় তাহাদ্বারা যদি মুদ্রা প্রস্তুত হইত তবে কি অসুবিধা হইত একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। মনে কর মাটী কিংবা কাঠ যদি টাকারূপে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে একটা সামান্য জিনিষ কিনিতে হইলেও গাড়ী গাড়ী টাকা বোঝাই করিয়া লইতে হইত। এইজন্যই যাহার মূল্য অধিক এবং যাহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে সহজে লইয়া যাওয়া যায় তাহাই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুদ্রার জন্য এরূপ জিনিষ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য যাহা দুষ্প্রাপ্য নয় অথচ অধিক মূল্যবান এবং সহজে বহনীয়। কেবল যদি অধিক মূল্যবান জিনিষই মুদ্রারূপে প্রচলিত হইত তাহা হইলে হীরক মণিমুক্তা প্রভৃতিই অধিক উপযোগী ছিল। কিন্তু এত অধিক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য জিনিষ ব্যবহৃত হইলেও অতিশয় অসুবিধা হইত। সামান্য লোকে টাকা কড়ি পাইত না এবং কিছুদিন পর হীরক ও মণিমুক্তা হয়তো আর পাওয়াই যাইত না। এইরূপ নানা কারণেই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রারূপে প্রচলিত হইয়াছে এবং হইতেছে; আশা করা যায় এ প্রথা শীঘ্র উঠিয়া যাইবার নহে।

যে টাকা কড়ি দ্বারা আমরা এত অসুবিধা হইতে নিস্তার পাইয়াছি এবং যাহার প্রসাদে এত সুখ ও সুবিধা ভোগ করিতেছি তাহা কত আদরের জিনিষ! এইরূপ জিনিষ যাহারা অন্যায় আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যয় করে তাহারা কি মূর্খ!! যাহাদের টাকা কড়ি নাই, একবার ভাবিয়া দেখ তাহারা কত কষ্ট ও কত অসুবিধা ভোগ করে। ভাই, যদি তোমার বেশী টাকা থাকে যদি তুমি নিজের ব্যয় কুলাইয়া টাকা বাঁচাইতে পার; তবে তাহা অসৎকাজে ব্যয় না করিয়া কুপথে বিসর্জ্জন না করিয়া দরিদ্রের সুখ ও সুবিধার জন্য ব্যয় কর। তুমি টাকার প্রসাদে যে সুখভোগ করিতেছ তাহাদিগকে সেই সুখের কিঞ্চিৎ ভাগী কর। ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন—দরিদ্র স্বর্গের দিকে দুই হস্ত তুলিয়া তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।

প্রজাপতি।

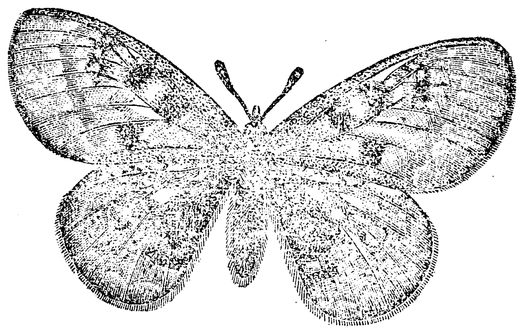

১

ছুঁওনা ছুঁওনা প্রজাপতি ওটি,
যেওনা যেওনা উহার কাছে ;
বাতাসে বিছায়ে ছোটপাখা দুটী
ঘুরিয়া ফিরিয়া কেমন নাচে !

২

নবীন নধর, নিখুঁত সুন্দর
বিমল কোমল শরীর খানি !
কিবা অপরূপ রূপ মনোহর
নিরখিলে আহা জুড়ায় প্রাণি !

৩

তরুণ-তপন কোমল-কিরণ
পড়েছে উহার শরীর'পরে,
আহা মরি মরি কর দরশন
কি সুন্দর শোভা বিকাশ করে !

৪

স্বভাবের শিশু, ফেরে বনে বনে
নাহি কোন ভয় ভাবনা-ঘোর,
নাচে, হাসে, গায় আপনার মনে
আপনার ভাবে আপনি ভোর !

৫

সদাই প্রফুল্ল—সরল-হৃদয়,
করে না করে না কাহার ক্ষতি !
কপট আচার, হিংসা কারে কয়,
জানে না কখন সুশীল মতি !

৬

ফুলে ফুলে ফুলে করি মধুপান,
কুসুমের রেণু মাখিয়া গায়,
বিহরে আনন্দে সারা-দিনমান,
আর কোন সুখ নাহিত চায় !

৭

জননীর কোলে শিশুটি যেমতি
স্তনপান করে ঘুমায় সুখে !
কুসুমের মধু খেয়ে প্রজাপতি
তেমতি ঘুমায় কুসুম-বুকে !

৮

সাদা-সিধা মন, সরল সুজন,
উহার মতন কে আছে আর ?
তবু দুষ্ট-লোকে বল কি কারণ,
"পাগল" বলিয়া নিন্দেরে তার ?

৯

যে বলে বলুক, তাহে ক্ষতি নাই,
নিন্দুক লোকের স্বভাব এই
শত শত গুণ না দেখিয়া ভাই,
তিল-পারা দোষ ধরিবে সেই !

১০

আমরাও ভাই করিয়া যতন,
প্রজাপতি মত সকলে হব,
সরল সুজন, হব খোলা মন,
যে যা বলে তাহা সকলি সব !

কাশ্মীরে দেখিবার জিনিষ।

সুখের দিন দিন জ্ঞান বাড়িতেছে, বিদ্যা বুদ্ধি বাড়িতেছে। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সকল কার্য্যেরই একটা না একটা কারণ ঠিক করিয়া লইতেছে ; কিন্তু তবুও প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেকগুলি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার নিকট মানুষের জ্ঞান, মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে অনেক স্থানে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। আজ আমরা কাশ্মীর রাজ্যের কয়েকটী আশ্চর্য্য পদার্থের বিষয় বলিব।

শ্রীনগরের নিকট একস্থানে একটী ছোট দ্বীপ আছে, এই দ্বীপে একটী কুণ্ড আছে, এবং কুণ্ডের মাঝখানে ইঁটের একটী ছোট বেদীর উপর একটা ধ্বজা ও পতাকা স্থাপিত আছে। হিন্দুদিগের ইহা একটী তীর্থস্থান। যাত্রীগণ ক্ষীর এবং পায়স এই কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া, দেবীর পূজা করিয়া থাকে সেইজন্য ইহার নাম, —ক্ষীর ভবাণী। এই কুণ্ডের জলের বর্ণ অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; জলের রং কখনও গোলাপী, কখনও রক্ত বর্ণ, কখনও সবুজ, কখনও বা অন্যপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকদিন যদি জলের রং রক্ত বর্ণ থাকে, তাহা হইলে সে দেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, দেবী কুপিতা হইয়াছেন ; এবং রাজ্য মধ্যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে, এই আশঙ্কা করিয়া থাকে। জলের বর্ণ কেন এপ্রকার পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা এপর্য্যন্তও কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। যাত্রীরা কুণ্ডের জলে যে সমস্ত পদার্থ নিক্ষেপ করে, সময় সময় তাহা তুলিয়া কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করা হয়, কিন্তু তাহাতেও কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। জলের রং কখনও নীল হইতেছে, কখনও বা সাদা হইতেছে, কখনও বা রক্ত বর্ণ হইতেছে ; আবার কখনও বা অনেকদিন পর্য্যন্ত এক রংই রহিয়াছে। কি কারণে এপ্রকার হয়, তাহা এখনও কেহ স্থির করিতে পারেন নাই।

শ্রীনগরের দক্ষিণভাগে, একস্থলে একটী অতি উচ্চভূমি আছে ; এই উচ্চভূমির নিম্নভাগে প্রায় ২০ হস্ত প্রশস্ত একটী নালা দেখা যায়। এই নালাটী সকল সময়ই শুষ্ক থাকে ; কিন্তু প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে, শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ঐ উচ্চভূমির নানাস্থান হইতে জল নিস্থত হইয়া নালায় পড়ে, এবং নালাটী পূর্ণ হইয়া যায়। এই নালাটীর নাম জটাগঙ্গা ; বছরের সমস্ত সময় ইহা শুষ্ক থাকে, কেবলমাত্র ঐ এক নির্দ্দিষ্ট দিনে, ইহা জলপূর্ণ হয়।

এই জটাগঙ্গার কিছুদূরে, একটা খুব বড় হ্রদ আছে; ইহার নাম হাকের সর। এই হ্রদের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলিতে বড় বড় বৃক্ষ প্রভৃতি জন্মিয়াছে এবং গরু প্রভৃতি দ্বীপের উপর চরিয়া বেড়াইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খুব প্রবলবেগে যখন বাতাস বহিতে থাকে, তখন এই দ্বীপগুলি নৌকার মত ইতস্ততঃ ভাসিতে থাকে; বড় বড় গাছ, গরু বাছুর প্রভৃতি জীবজন্তু লইয়া বাতাসে এদিক ওদিক চালিত হইতে থাকে। কাশ্মীরে এ প্রকার ভাসমান ক্ষেত্র আরও আছে, কিন্তু সেগুলি মানুষের তৈয়ারী। জলের উপর লতা পাতা জন্মাইয়া, ক্রমে তাহার উপর মাটী ফেলিয়া কাশ্মীরের লোকেরা তাহার উপর শস্যক্ষেত্র তৈয়ার করে; এবং ইচ্ছামত এক স্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া যায়। সময় সময় এই সকল ক্ষেত্র চুরি যায়, এবং তাহা লইয়া মোকদ্দমাও হইয়া থাকে। কিন্তু উপরে যে দ্বীপের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি মানুষের তৈয়ারী নহে, এবং তাহার আয়তনও খুব বড়।

আর একস্থানে একটা কুণ্ড আছে, তাহাতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হইতে জৈ্যষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার কুণ্ডের মধ্যস্থ সাতটী স্থান হইতে জল বাহির হইয়া কুণ্ডপূর্ণ করে, এবং প্রত্যেকবার অতি অল্পকাল পর্য্যন্ত জল থাকে, তার পর আবার শুকাইয়া যায়। ইহার নাম ত্রিসন্ধ্যা।

আর একটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়; সেটী সকল সময়ই শুষ্ক থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মধ্যে মধ্যে হঠাৎ কোথা হইতে জল আসিয়া কুণ্ড পূর্ণ হইয়া যায়; কুণ্ড এই ভাবে কতকক্ষণ পূর্ণ থাকে; আবার জল কোথায় চলিয়া যায়। তখন একবিন্দু জলও কুণ্ডের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর এক স্থানে একটা খুব বড় পর্ব্বতের গুহা আছে। ইহার নাম মণ্ডা। শুনা যায় এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার ভিতরের জিনিষ খাইলে ঠিক বরফের মত বোধ হয়; কিন্তু তাহা খাইতে খাইতে গুহার বাহিরে আসিলে, আর সে শীতল বরফ থাকে না; কঠিন পাথরের মত হইয়া যায়। এখন এই গুহার মুখে একখানা বড় পাথর পড়িয়া যাওয়াতে আর ইহার মধ্যে যাওয়া যায় না।

আর একটী বলিয়াই আজ শেষ করিব। এক স্থানে একখণ্ড খুব বড় পাথর আছে, ইহার নাম হলদর। উহার নিকটে গিয়া "হলদর জল দেও" বলিয়া কয়েকবার চিৎকার করিয়া বলিলেই, সেই পাথরের গাত্র হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকে।

কাশ্মীরে দেখিবার জিনিষ যে ইহাতেই শেষ হইল তাহা নহে। কাশ্মীরে দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। এমন সুন্দর এবং সুখের স্থান অতি অল্পই আছে। আমরা কেবল কয়েকটী প্রাকৃতিক আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

পৃথিবীর কত স্থানে যে এই প্রকার কত আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, তাহা কে বলিতে পারে? আজ যে গুলির কথা বলিলাম, তাহা আমাদিগের এই দেশেই রহিয়াছে। আমরা আশা করি আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অন্ততঃ দু চার জন এ সকল চোকে দেখিয়া চক্ষু স্বার্থক করিবেন।

পুস্তকালয় ও সাধারণ

নানাপ্রসঙ্গ।

এক দিন বড় ঝড় হইতেছিল। দশ বার জন লোক একটা ঘরে আশ্রয় লইল। মেঘে আকাশ অন্ধকার হইয়াছে। এমন সময় এক খানা কাল মেঘ ঘরের উপরে আসিয়া থামিল। মেঘ খানা ভয়ানক কাল; দেখিলেই ভয় হয়। ইহা দেখিয়া একজন বলিল "মেঘটা অবশ্যই কিছু চায়, হয়ত আমাদের মধ্যে একজন মহাপাপী আছে, তাহার মাথায় বাজ ফেলিয়া মেঘটা তাহাকে মারিতে আসিয়াছে।" আর একজন বলিল "একজন দোষীকে মারিতে গিয়া তাহার সঙ্গে এতগুলি নির্দ্দোষীকে বধ করিবে, বোধ হয় এই জন্যই বাজ পড়িতে দেরী হইতেছে। কিন্তু দেরী আর কতক্ষণ হইবে, দোষী ব্যক্তি যদি শীঘ্র পৃথক হইয়া না যায় তবে আর আর সকলেও তাহার সঙ্গে মারা যাইবে।" আর একজন বলিল "ইহা কখনই হইতে পারে না; চল আমরা প্রত্যেকেই এক এক বার করিয়া বাহিরে যাই। যে দোষী সে বাহিরে গেলেই তার ঘাড়ে বাজ পড়িবে।" এই পরামর্শ বেশ সঙ্গত বোধ হইল; তার পর এক এক জন করিয়া বাহিরে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে এক জন ছাড়া আর সকলেই বাহিরে গিয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের কাহারও মাথায় বাজ পড়িল না। শেষ ব্যক্তির পালা যখন আসিল, তখন সে আর কোনমতেই বাহিরে যাইতে চাহে না। অন্যান্যেরা মনে করিল "এই ব্যক্তিই দোষী, ইহাকে ঘর ছাড়িয়া যাইতে হইবে, নতুবা ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মারা পড়িব।" এই ভাবিয়া সকলে ঠেলিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল, আর অমনি ঘরের উপর বাজ পড়িয়া তাহারা মরিয়া গেল। যাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল সে বাঁচিল।

একটী ছোট ছেলের বাপ মা মরিয়া যাওয়াতে সে বড়ই দুঃখে পড়িল। সে মনে করিল যে এরূপ দুঃখ সহ্য করার চাইতে মরিয়া যাওয়াই ভাল। এই ভাবিয়া সে একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে এক পুত্রহীন সওদাগর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে সেই ছেলেটীকে ঐরূপ গর্ত্ত খুঁড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বালক উত্তর করিল "আমার মা নাই, বাপ নাই; আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? আমি এই গর্ত্তে পড়িয়া মরিব।" সওদাগরের বড় দয়া হইল; সে বলিল "তোমার মরিয়া কাজ নাই; তুমি আমার সঙ্গে এসো, আমরাই তোমার বাপ মা হইব।" বালক সওদাগরের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গেল, সেখানে সে খুব যত্ন পাইতে লাগিল। কিছু দিন পরে সওদাগরের এক ছেলে হইল। সওদাগর ও তাহার স্ত্রী এখন সেই দুঃখী ছেলেটীকে অত্যন্ত হিংসা করিতে লাগিল। তাহাদের হিংসা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে তাহারা সেই ছেলেটীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একটা গভীর কূপ খুঁড়িয়া রাখিল—মনে করিল "একবার তো কূপে পড়িয়াই মরিতে গিয়াছিল, এবারে কূপ প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিলে অবশ্যই তাহাতে ঝাপিয়া পড়িয়া মরিবে।" কিন্তু সেই দুঃখী সন্তান ইহার কোন খবর পাইবার পূর্ব্বেই সওদাগরের নিজের ছেলে সেই কূপ দেখিতে গেল এবং হঠাৎ তাহাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

গল্প গুলি সত্য না হউক, ইহাদের ভিতরে বেশ উপদেশ আছে? পরের মন্দ ভাবিও না। দেখ এই সকল লোক পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া কি শাস্তিই পাইল!

বালকের সৎশিক্ষা।

কয়েক দিন হইল একখানি রেলের গাড়ীতে অনেক লোকের ভিড় হওয়াতে উপযুক্ত স্থানাভাব বশতঃ যাত্রীরা বড়ই কষ্ট পাইতেছিল, ইহার পর আবার গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বেই একটী বৃদ্ধ লোক দৌড়িয়া আসিয়া উক্ত রেলের গাড়ীতে উঠিলেন। স্থানাভাবে উক্ত বৃদ্ধ লোকটীর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। সে গাড়ীতে অনেক লোক ছিল কেহই কিছু বলিল না; সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। একটী ১০।১২ বৎসরের বালক বৃদ্ধের কষ্ট দেখিয়া নিজের স্থান ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার বসিবার জায়গা করিয়া দিল এবং নিজে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার যায়গায় বসিল। বালকের এইরূপ সৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্যান্য সকলেই তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। এটী যে উচিত কর্ম্ম তাহা সকলেই জানেন তত্রাচ অন্য কেহই বৃদ্ধের বসিয়া বিশ্রাম করার স্থান দিলেন না।

এই ঘটনাটীতে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই তত্রাচ যেরূপ সময় হইয়াছে তাহাতে না উল্লেখ করিলে এইরূপ সৎকাজের জন্য অন্যান্য বালককে উৎসাহিত করা হয় না। আজ কাল সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হুজুক দিন দিন বাড়িতেছে এবং আমাদের প্রাচীনকালের হিন্দুদের যে সমুদয় সদ্‌গুণ ছিল তাহার ক্রমশঃ লোপ হইতেছে।

বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাহাদিগকে ভক্তি করা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং যাহারা এরূপ কাজ করেন তাহারাই একটী সৎশিক্ষা পাইয়াছেন ইহা বলিতে হইবে।

ধাঁধা

গত মার্চ্চ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। ৮, ১২, ৫, ২০।

নূতন ধাঁধা।

১। এমন একটী তিন অক্ষরের কথা বল যাহার আদ্য অক্ষর ছাড়িলে সকল লোকেরই খাদ্য হয়; মাঝের অক্ষর ছাড়িলে তাহা দ্বারা সকলকেই সন্তুষ্ট করা যায় এবং শেষ অক্ষর ছাড়িলে তাহা হইতে সকলেই ভয় পায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

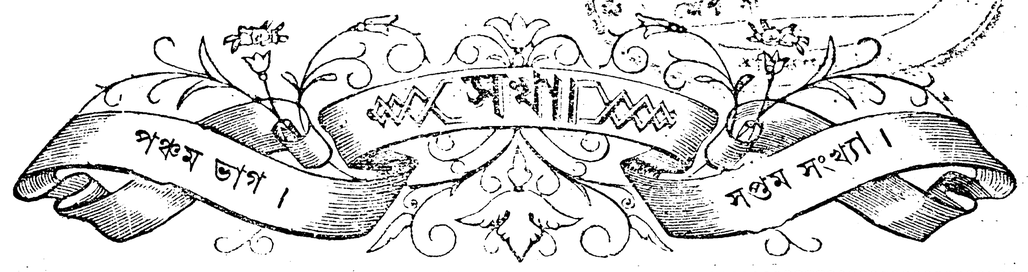

জুলাই, ১৮৮৭।

ভারতের অসভ্যজাতি।

খার পাঠক পাঠিকা! এই যে ভাল ভাল কাগজে পরিষ্কার অক্ষরে ছাপান নানা প্রকার বই পড়িতেছ, সুন্দর সুন্দর জামা, কাপড়, জুতা, ছাতা ব্যবহার করিতেছ, কত প্রকার সুমিষ্ট খাদ্য আহার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছ; আবার দীর্ঘকালের জন্য বিদ্যালয় সকল বন্ধ হইলে বাড়ী যাইবার সময় রেলের গাড়ি কিম্বা কলের জাহাজে চড়িয়া পনর দিনের পথ এক দিনেই যাইতেছ, তোমরা কি মনে কর পৃথিবীতে চিরকালই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে? না, তা নয়, আমরা যে সকল সুবিধা এখন ভোগ করিতেছি তাহা চিরকালও ছিল না কিম্বা হঠাৎ এক দিন কিম্বা এক সময়েও হয় নাই; এ সকল মানুষের শিক্ষা এবং জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে হইয়াছে। তোমরা যত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিবে তত জানিতে পারিবে যে, পৃথিবীর অবস্থা ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বেশি দিনের কথা নয়, আমরা যখন তোমাদিগের মত বালক ছিলাম তখন সখার মত এমন এক খানি ভাল কাগজ ছিল না যাহা পাঠ করিয়া আমরা সৎশিক্ষা পাইতাম। এখন কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরে গ্যাসের আলো এবং কলের জল হইয়া মানুষের কত সুবিধা হইয়াছে, কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এ সকল কিছুই ছিল না; পরিষ্কার জলের অভাবে কলিকাতার মত বড় বড় সহরে লোকের যে কি কষ্ট হয় তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। কলিকাতা হইতে ঢাকা কিম্বা মুরশিদাবাদ এখন এক দিনেই যাওয়া যায়, কিন্তু আগে যখন রেলের গাড়ি এবং কলের জাহাজ হয় নাই তখন অনেক দিন লাগিত। কেবল যে যাইতে বিলম্ব হইত তাহা নয়, যাওয়া আসা অতি বিপদজনক ছিল; স্থলপথে চোর ডাকাইতের ভয়,জল পথের ত কথাই নাই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় বড় বড় নদী বাহিয়া প্রাণটি হাতে করিয়া যাইতে হইত। কেবল যে আমাদিগের দেশেই এইরূপ নানা প্রকার সুবিধা জনক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নয়, অন্যান্য দেশেও হইয়াছে। তোমরা শুনিয়া থাকিবে আগে বিলাত হইতে এ দেশে আসিতে ছয় মাস আবার এদেশ হইতে বিলাতে যাইতে ছয় মাস লাগিত, এখন সেই ছয় মাসের পথ একুশ বাইশ দিনের হইয়াছে। এই চব্বিশ সপ্তাহের পথকে তিন সপ্তাহের করিতে যে কত সময় কত বিদ্যাবুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং কত লোকের সাহায্য লাগিয়াছে তা আর

তোমাদিগকে কি বলিব। দেখিলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইযাছে! একশত দেড় শত বৎসরের মধ্যে যদি এত উন্নতি হইতে পারে তাহা হইলে একবার মনে করিয়া দেখ দুই তিন হাজার বৎসরে মানুষের অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব! আর বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে। যে ইংলণ্ড আজ এত পরাক্রমশালী, এত উন্নত দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই ইংলণ্ডের অবস্থা কি ছিল তোমরা জান কি? সেই সময়ে যে সকল লোক ঐ দেশে বাস করিত তাহাদিগের ঘর বাড়ী ছিল না; তাহারা চাষ করিয়া শস্যাদি উৎপন্ন করিতে জানিত না; পর্ব্বতগুহায় কিম্বা বড় বড় গাছের কোটরে বনে জঙ্গলে বাস করিত; বনের পশু মারিয়া আহার করিত, পশুর ছাল গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করিত। তখন তাহারা অসভ্য ছিল। সেই দেশ এখন কি হইয়াছে! এখন বোধ হয় তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে না যে, এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ মাত্রেই অসভ্য ছিল, অর্থাৎ তখন কাহারও ঘর বাড়ী ছিল না, পরিচ্ছদ ছিল না, অস্ত্র শস্ত্র ছিল না, পশু পক্ষীরা যেমন ইচ্ছামত ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, ক্ষুধা হইলে আহার অন্বেষণ করে, ভবিষ্যতের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিতে জানে না, তখনকার মানুষও ঠিক তাই ছিল। মানুষের এই অবস্থাকেই প্রকৃত অসভ্য অবস্থা বলে, কত কাল পূর্ব্বে যে, মানুষ মাত্রেরই অবস্থা এরূপ ছিল তাহা বলিয়া দেওয়া কঠিন, তোমরা যত শিক্ষা লাভ করিবে, পুরাতত্ত্ব ভূতত্ত্ব প্রভৃতি পাঠ করিবে ততই জানিতে পারিবে যে, এ সকল কত প্রাচীন কালের কথা।

বর্ত্তমান কালেও পৃথিবীর অনেক স্থানে অসভ্য-জাতীয় মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়; আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আসিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ সকলের স্থানে স্থানে নানা জাতীয় অসভ্য মনুষ্য বাস করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে সকল অসভ্য জাতি বাস করে যাহাতে তাহাদিগের বিষয় তোমরা কিছু জানিতে পার সেই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লেখা হইতেছে।

ইতিহাসে পড়িয়া থাকিবে যে, প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে হিন্দুরাই প্রধান ছিলেন, পরে মুসলমানেরা আসিয়া হিন্দুদিগকে পরাজয় করিয়া আপনাদিগের অধিকার স্থাপন করেন। মুসলমানেরা অনেক দিন রাজত্ব করার পর এখন ইংরেজরা এদেশের রাজা হইয়াছেন। এই সকল ঘটনার বহুকাল পূর্ব্বে,—এত পূর্ব্বে যে এখন ঠিক করিয়া সময় নিরূপণ করা কঠিন, ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসী অসভ্য ছিল; কালক্রমে মধ্য আসিয়ার পশ্চিম প্রদেশ হইতে এক দল মনুষ্য আসিয়া ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগের আধিপত্য স্থাপন করেন এবং আপনাদিগকে "আর্য্য" অর্থাৎ পূজ্য বা মানব কুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন। আদিম অধিবাসীরা আর্য্যগণকে যে সহজে ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তার করিতে দিয়াছিলেন তাহা নয়; তাহারা অনেক বিবাদ অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সংখ্যাতে অল্প হইলেও আর্য্যদিগের বল, বুদ্ধি, কৌশল, সাহস ও একতা আদিম অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বেশি ছিল বলিয়া অবশেষে আদিম অধিবাসীরা পরাজিত হয়। পরাজিত হইয়া কেহ কেহ আর্য্যদিগের দাসত্ব স্বীকার করে এবং কালক্রমে তাঁহাদিগের সহিত মিশিয়া যায়; কিন্তু যাহারা

অপেক্ষাকৃত বীর্য্যবান এবং স্বাধীনতাপ্রিয় তাহারা দাসত্ব স্বীকার না করিয়া এমন সকল দুর্গম জঙ্গলময় পাহাড়ে গিয়া বাস করে যেখানে মানুষে সহজে যাইতে পারে না। ভীল, কোল, চুয়াড়, ধাঙ্গড়, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল অসভ্য জাতি এখন আমরা দেখিতে পাই তাহারাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগের বংশধর। ইহারা যে প্রকৃত অসভ্য তা বলা যায় না, কারণ যাহারা কেবল পশু পক্ষী মৎস্য শীকার করিয়াই আহার করে, চাষ বাস করে না তাহারাই প্রকৃত অসভ্য, কিন্তু যে সকল জাতির বৃত্তান্ত বলা হইতেছে ইহারা যদিও আহারের নিমিত্ত পশু পক্ষী শিকার করে তথাপি ইহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ধান গম প্রভৃতির চাষ করিয়া থাকে এবং সকলেই অন্ততঃ এক খানি কৌপিন পরে, একবারে উলঙ্গ কেহই থাকে না। প্রকৃত অসভ্য না হউক ইহারা অসভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কত দেশের কত অসভ্যজাতি সভ্য হইয়া গিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগের অবস্থা এখনও কেন এত হীন? ইহার কারণ আছে, অন্যান্য অসভ্য জাতির মত ইহারাও অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত, সহজে কাহারও সহিত মিশিতে চায় না, মিশিবার আবশ্যকও হয় না, কারণ ইহাদিগের জীবনে অভাব অতি কম, আর ইহারা যে সকল স্থানে বাস করে সে সকল স্থান প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর এবং দুর্গম বলিয়া অপর লোক কেহ সেখানে যায় না এবং যাইবার বড় একটা আবশ্যকও হয় না। ইহারা মান্ধাতার আমল হইতে এক রকম কাজ করিয়া আসিতেছে, এক রকম গৃহে বাস করিতেছে, এক রকম খাদ্য আহার করিতেছে, কিছুরই পরিবর্ত্তন নাই, কিছুরই উন্নতি নাই। পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি হইবেই বা কোথা হইতে? যে সকল কারণে জাতীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় ইহাদিগের মধ্যে তাহার কিছুই নাই; শিক্ষা কাহাকে বলে জানে না, নীতি কাহাকে বলে জানে না, প্রতিদ্বন্দীতা একবারে নাই, উন্নত অবস্থার লোকের সঙ্গে মিশে না, কি করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে? ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠজাতিরা হাজার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম এবং উদারতার গৌরব করুন, তাঁহারা এই সকল আদিম অধিবাসীদিগকে বরাবর ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছেন, কখন তাহাদিগের উন্নতির চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তোমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে যে, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা করেন নাই কিম্বা আমরাও যাহা কখন কল্পনা করি নাই, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকেরা সাত সমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়া তাহা করিতেছেন এবং ঈশ্বর ইচ্ছায় অনেকটা পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। পাদ্রি সাহেবেরা এখন এই সকল অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং তাহাদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যে উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহারা কাজ করিতেছেন তাহাতে বোধ হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সকল অসভ্য জাতিরা শিক্ষিত ও সভ্য হইয়া উঠিবে।

যাহাতে তোমরা সহজে বুঝিতে পার কোন্ অসভ্য জাতি ভারতবর্ষের কোন্ অংশে বাস করে এই উদ্দেশে একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্র (Map) দেওয়া হইল; ইহাতে অসভ্য জাতির নামগুলি স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। এবারে ধাঙ্গড়দিগের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, রাঁচি, সম্বলপুর প্রভৃতি প্রদেশ সকলের পাহাড় ও জঙ্গলে ধাঙ্গড় দিগের বাস। আমরা যদিও ইহাদিগকে ধাঙ্গড় বলিয়া থাকি কিন্তু এই জাতির প্রকৃত নাম "ওরাঁও"। কতকাল হইতে যে ইহারা এই সকল স্থানে বাস করিয়া আসিতেছে তাহা বলা যায় না, বোধ হয় তিন চারি হাজার বৎসরের কম নয়, ইহাদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে, ইহারা প্রথমে কুনকাল দেশ হইতে আসিয়া রোথায় বসতি করে, পরে একদল ছোটনাগপুরের দিকে আর একদল রাজমহলের দিকে যায়, যে দল রাজমহল পাহাড়ে গিয়া বাস করে তাহারা "পাহাড়ী" নামে পরিচিত (ইহাদের বৃত্তান্তও পরে জানিতে পারিবে)।

তোমরা বোধ হয় অনেকেই ধাঙ্গড় দেখিয়াছ, বিশেষতঃ যাহারা কলিকাতায় থাক, কারণ এখানে গৃহস্থের বাড়ীর নর্দ্দমা প্রভৃতি অপরিষ্কার হইলে ইহারাই প্রায় পরিষ্কার করিয়া দিয়া যায়। অধিকাংশ অসভ্যজাতির মত ধাঙ্গড় দেখিতে কদাকার, রং সকলেরই কাল, পেট মোটা, কপাল ছোট, চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং ভাব শূন্য, কিন্তু দুই এক জনের আকার অবয়ব সুন্দর না হউক বেশ সুগঠন। ইহারা মাথায় লম্বা লম্বা চুল রাখে এবং সে গুলিকে জড়াইয়া মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক দিগের মত খোঁপা বাঁধে, অর্থাৎ আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মত খোঁপাটি উচু করিয়া না রাখিয়া চুলের নিচে গুঁজিয়া রাখে। ইহাদিগের পরিচ্ছদ অতি সামান্য একখানি কৌপিন মাত্র, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অনেক ভাল, কারণ স্ত্রীলোকেরা সাড়ীর মত কিছু কোমরে জড়ায় আবার কখন কখন চাদরও ব্যবহার করিয়া থাকে। আকারে আর পরিচ্ছদে যাহাই হউক ইহারা বেশ প্রফুল্লচিত্ত এবং কর্ম্মিষ্ঠ। কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতির স্ত্রীলোকেই অলঙ্কার ভাল বাসে, সভ্য এবং ধনী লোকেরা না হয় সোণা রূপা, হীরা, মুক্তা নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া আপন আপন শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন, গরিব অসভ্য বেচারিরা এ সকল বহুমূল্য দ্রব্য কোথায় পাইবে, তাহারা শঙ্খ, প্রবাল, পাখীর পালক, পুতির মালা দিয়া শরীর সজ্জিত করে। এই সকল ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা আবার প্রায় সর্ব্বাঙ্গেই উল্কি পরিয়া থাকে। উল্কি পরা কাহাকে বলে বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। অনেক জাতীয় অসভ্যের মধ্যে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই উল্কি পরে, কিন্তু ধাঙ্গড় দিগের পুরুষের গায়ে বড় একটা উল্কির দাগ দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে যুবা পুরুষেরা অনেক সময়ে সাধ করিয়া বাহুতে উল্কি পরে। স্ত্রীলোকদিগের মাথায় যদি চুল কম হয় তাহা হইলে ইহারা পরচুলা ব্যবহার করিয়া থাকে, এ বিষয়ে আর ইহাদিগকে অসভ্য বলিবার যো নাই, কারণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি সুসভ্য দেশের মহিলারা প্রায়ই পরচুলা পরিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে বালিকা কিম্বা যুবতীদিগের মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা জন্মিলে যেমন "সই" পাতানের প্রথা আছে ধাঙ্গড় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও সেই রূপ আছে, তবে ইহারা "সই" না বলিয়া "গুই" বলিয়া থাকে।

ধাঙ্গড়দিগের ঘর বাড়ী অতি সামান্য, অপরিষ্কার এবং বিশৃঙ্খল; মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, সুকর, মুরগি সকলের এক যায়গায় বাস। ঘর বাড়ীর এইরূপ অভাব এবং দুর্দ্দশা বলিয়া প্রত্যেক গ্রামে এক একখানি নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে, যেখানে গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত যুবা পুরুষেরা রাত্রিতে

শয়ন করিয়া থাকে, এবং এই ঘরের সম্মুখের উঠানে দিনের বেলায় গ্রামের যুবক যুবতীরা একত্রিত হইয়া নাচে, গায় এবং আমোদ করে। ধাঙ্গড়দিগের মধ্যে যদিও বাল্যবিবাহ নাই, কিন্তু হিন্দুদিগের দৃষ্টান্তে অনেক পরিবারের মধ্যে এখন এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যেমন পিতা মাতা কিম্বা অন্য আত্মীয়েরা বর কন্যা মনোনীত করিয়া থাকেন, ধাঙ্গড়দিগের মধ্যে তাহা নাই, ইহাদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিবে তাহারাই আপন আপন স্ত্রী পুরুষ মনোনীত করিয়া লয়। বিবাহের দিন স্থির হইলে বর আপন আত্মীয় বন্ধুগণকে সঙ্গে করিয়া বিবাহ করিতে যায়। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত বরের একবার ভান যুদ্ধ হয়, তাহার মানে এই, যে কন্যার পক্ষের লোকেরা যেন কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে চায় না আর বর যেন কন্যাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে চায়। এই ভান যুদ্ধ অতি প্রাচীনকালের প্রকৃত অসভ্য দিগের আচার ব্যবহারের চিহ্ন স্বরূপ। কৃত্রিম যুদ্ধ শীঘ্রই মিটিয়া যায় এবং তখন নৃত্য গীত আরম্ভ হয়, এই নৃত্য গীতে বর কন্যাও যোগ দেয়। ধাঙ্গড়দিগের বিবাহে কোন মন্ত্রাদি নাই, কেবল হরিদ্রা মাখা এবং সিন্দুর পরা হইলেই বিবাহ হইয়া গেল। হলুদ মাখার সময় বর কন্যাকে একখানি হলুদ বাটা শীলের উপর দাঁড়াইতে হয়; তাহাদিগের আত্মীয় বন্ধু চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায় এবং একখানি চাদর দিয়া কন্যা পাত্রের সমস্ত শরীর ঢাকিয়া দেয়, এই ঢাকার মধ্যে থাকিয়া বর কন্যাকে এবং কন্যা বরকে হলুদ মাখাইয়া দেয়; ইহার পর বর কন্যা স্নান করিয়া আসে, তখন বর কন্যাকে সিন্দুর পরাইয়া দেয়। এই সিন্দুর পরানকে ধাঙ্গড়েরা "সিন্দুর" দান বলে। বুদ্ধিমান ধাঙ্গড় দিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রত্যেক বিবাহ যে ঠিক এই প্রণালী অনুসারে হয় এরূপ বোধ হয় না। ধাঙ্গড়দিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই।

ধাঙ্গড়েরা বেশ পরিশ্রমপটু; ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে, পরিশ্রম করিবার নিমিত্তই তাহারা জন্মিয়াছে। ধাঙ্গড়দিগের খাদ্যের মধ্যে ভাত আর দাল প্রধান; সাক, তরকারি কচিৎ আহার করে, তবে পশু পক্ষী মারিয়া প্রায়ই খাইয়া থাকে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর সূর্য্যতেই সপ্রকাশ, ইহারা উপাসনার প্রয়োজন বোধ করে না, কারণ ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর কখন অনিষ্ট করেন না। অন্যান্য অসভ্য জাতির মত ইহারাও ভূত, প্রেত, বিশ্বাস করে, এবং এই সকল উপদেবতাগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত পূজাদিও করিয়া থাকে। পরকাল সম্বন্ধে ধাঙ্গড়দিগের কিছুই জ্ঞান নাই, মানুষ মরিয়া গেলে তাহার কি হয় তাহা কিছুই জানে না, তবে অপমৃত্যু হইলে ভূত হয় বলিয়া বিশ্বাস করে; বিশেষতঃ বাঘে যে মানুষকে মারিয়া ফেলে সে মানুষ যে বাঘ হয় এটি ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। ইহাদিগের মধ্যে শব দাহ প্রথা প্রচলিত আছে, মৃত ব্যক্তির শরীর পুড়িয়া গেলে, ছাই এবং পোড়া অস্থিগুলি একত্র করিয়া কলসিতে করিয়া মৃত ব্যক্তির ঘরের নিকটে ঝুলাইয়া রাখে, এবং আগামী শীতকালে ফেলিয়া দেয়। যেখানে সেখানেই যে ফেলিয়া দেয় তাহা নয়, এই মৃত ব্যক্তির পূর্ব্ব পুরুষদিগের অস্থি সকল যেখানে ফেলা হইয়াছে সেইখানেই ফেলিয়া দেয়।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দুর্গাপুর প্রভৃতি গ্রামে

অনেকগুলি ধাঙ্গড় ঘর বাড়ী বাঁধিয়া বাস করিতেছে, আপন দেশ অপেক্ষা কলিকাতায় বেশি উপার্জ্জন করিতে পারে বলিয়াই ইহারা এখানে আছে। কলিকাতার ময়দানে মিউনিসিপালিটির অধীনে এবং বড় বড় বাগানে এই সকল ধাঙ্গড়কে খাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহারা বেশ পরিশ্রম পটু, তবে এদেশে কিছু দিন থাকিলে, এদেশের লোকের সঙ্গে মিসিলে ইহারাও কপটতা শিক্ষা করে। আপন আপন দেশে যখন যথেষ্ট শস্য জন্মে তখন অনেকে আবার এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, আবার শস্যাদি ফুরাইলে এদেশে চলিয়া আসে। পাদ্রি সাহেবেরা এখন ধাঙ্গড়দিগকে শিক্ষা দিতেছেন, ধাঙ্গড়দিগের দেশে অনেক স্থানে তাঁহারা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন, অনেক ধাঙ্গড় খ্রীষ্ট ধর্ম্মও অবলম্বন করিয়াছে।

ক্রমশঃ

বালক কলবার্ট।

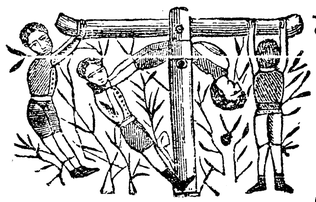

ন কাজের ফল ভাল হইলেই যে তাহা সাধুকার্য্য হইল, তাহা নহে। অভিপ্রায় দেখিয়া সাধুতা অসাধুতার বিচার করা হয়। মনে কর কোন দরিদ্রবালক অনাহারে ক্রন্দন করিতেছে; তাহার কষ্ট দেখিয়া তোমার প্রাণে দয়া হইল; তোমার সঙ্গে কিছু নাই, কেবল তোমার জলখাবার দুইটী কি তিনটী পয়সামাত্র আছে। তুমি তোমার নিজের কষ্টের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাকে ঐ পয়সাগুলি দিলে। সে তোমাকে চিনে না, অন্য কোন লোকও সেখানে নাই; সুতরাং তোমার এ কার্য্যের জন্য প্রশংসালাভের সম্ভাবনা নাই, তুমি সে প্রত্যাশাও রাখ না। এরূপ অবস্থায় তোমার ঐ কার্য্য অতি যৎসামান্য হইলেও তাহাকে সাধুকার্য্য বলিব।

আবার মনে কর কোন ধনশালী জমিদার সংবাদ পত্রে নিজের সুখ্যাতি প্রচারের ইচ্ছায় অথবা রাজ কর্ম্মচারীদিগের নিকট রায় বাহাদুর বা রাজাবাহাদুর উপাধিলাভের প্রত্যাশায় সাধারণের হিতকর কোন কার্য্যে দশ হাজার টাকা দান করিলেন। তাঁহার হয়ত প্রকৃত পরহিতৈষণা নাই, তাঁহার দরিদ্র প্রজাবর্গ হয় ত তাঁহার উৎপীড়নে অস্থির। এরূপ স্থলে তাঁহার এই দানকে সাধুকার্য্য বলিতে পারি না। শুদ্ধ সত্যনিষ্ঠা, দয়া, কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া যে কার্য্য করা যায় তাহাই প্রকৃত সাধুকার্য্য নামের যোগ্য। তাহাতেই মানুষের হৃদয় উন্নত হয়। আর কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে যে কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা সাধুকার্য্য নহে, তাহাতে মানুষের অন্তঃকরণ উন্নত হয় না।

সৎকার্য্যের প্রতি অনুরাগ ও অসৎকার্য্যের প্রতি ঘৃণা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে বহু দিন অসৎ পথে থাকিয়া যাহাদের প্রাণ অসার হইয়া গিয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। অসৎপথে থাকিয়া সুখভোগ করা অপেক্ষা সৎপথে

থাকিয়া কষ্ট পাওয়াও ভাল, ইহাই মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থার ভাব। এই জন্যেই যখন আমরা দেখিতে পাই যে, কোন ব্যক্তি প্রবল প্রলোভন সত্ত্বেও কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা তাঁহার সৎসাহস দেখিয়া আনন্দিত হই এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, সে অবস্থায় নীচ স্বার্থের অধীন না হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুসরণ করাই যথার্থ মহত্ত্ব। নিম্নলিখিত ঘটনা ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল।

ব্যাপ্টিষ্টি কল্‌বার্টের বয়স যখন পনর বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে একজন বস্ত্রব্যবসায়ীর অধীনে কর্ম্মশিক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দেন। এক দিন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের চারি প্রকারের বস্ত্রসহ এক ধনী বণিকের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাঁর একটী গৃহের পরদা প্রস্তুত করিবার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। তিনি নিজের মনোমত বস্ত্র পছন্দ করিয়া লইবেন এই অভিপ্রায়ে বস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁহার নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বস্ত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বণিক্ বস্ত্র মনোনীত করিয়া তাহার ত্রিশ গজ ক্রয় করিলেন। মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে কল্‌বার্ট ভ্রমক্রমে বলিলেন, ইহার প্রতি গজের মূল্য 'পনর ক্রাউন।' কিন্তু ইহার প্রকৃত মূল্য গজ প্রতি আট ক্রাউন। বণিক তাহা জানিতেন না। তিনি কলবার্টের কথানুসারে সমস্ত মূল্য চুকাইয়া দিলেন।

দোকানে ফিরিয়া আসিলে পর বৃদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ীর কথায় কল্‌বার্ট নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

কিন্তু লোভী বৃদ্ধের ইচ্ছা ঐ সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করে। বৃদ্ধ বলিতে লাগিল,—"বেশ, বেশ! তুমি বড় সুছেলে। এক দিন তোমা হইতে তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। পনর ক্রাউন! আমার ইচ্ছা করিতেছে আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠি। যাহার দাম ছয় ক্রাউনও নয়, তাহা বেচিয়া পনর ক্রাউন! আট ক্রাউনের বদলে পনর ক্রাউন দরে ত্রিশ গজ কাপড়! প্রতি গজে সাত ক্রাউন অধিক লাভ! আজ আমার কি শুভক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।"

ব্যাপ্টিষ্টি বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি একটু পশ্চাতে সরিয়া গিয়া বলিলেন, "মহাশয়! বলেন কি? আমার একটা ভুল হইয়া গিয়াছে বলিয়া কি আপনি তাহা হইতে অন্যায় রূপে লাভ করিতে চান না কি?"

অর্থ লোলুপ বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ! বুঝিয়াছি, তুমি ইহার কিছু অংশ চাও, না? অবশ্য তোমাকেও ইহা হইতে কিছু দিব।"

বালক কল্‌বার্ট ধীর ভাবে নিজের টুপিটী হস্তে লইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি এরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে পারিব না। আমি এখনি ঐ ভদ্রলোকটীর কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিব এবং তিনি অতিরিক্ত যে টাকা দিয়াছেন তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিব।"

মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে কল্‌বার্ট এক লম্ফে দোকানের বাহিরে উপস্থিত হইয়া ঐ বণিকের নিকট চলিলেন। অসাধু বস্ত্রব্যবসায়ী হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল।

বণিকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া কল্‌বার্ট বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। দ্বারবান্ প্রথমে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিল না, বলিল, তাহার প্রভু এখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।

কিন্তু কল্‌বার্টের আগ্রহ ও অনুনয় দেখিয়া সে অবশেষে তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল। কল্‌বার্ট তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দ্বারবান্ বণিকের গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিলে, বণিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?"

দ্বারবান্ বলিল, "আজ্ঞা, সেই কাপড়ের দোকানের ছেলেটী আসিয়াছে; সে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।"

বণিক বলিলেন, "তাহাকে বল, এখন দেখা হইবে না।"

কল্‌বার্ট বাহির হইতে মিনতি করিয়া বলিলেন, "আমি একটী কথামাত্র নিবেদন করিব।"

বণিক্ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আবার তুমি কেন অসিয়াছ? তুমি কি চাও? আমি ত তোমার কাপড়ের দাম চুকাইয়া দিয়াছি? তবে আবার কি? আমার কাজ আছে। তুমি যাও"

বণিকের কথায় ব্যাপ্টিষ্টির একটুও ভয় হইল না। তিনি মনে মনে জানিতেন তিনি কোন অন্যায় কার্য্য করিতে আসেন নাই। তবে ভয় পাইবেন কেন? চলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, তিনি একেবারে বণিকের গৃহের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বণিক মনে করিতেছিলেন দ্বারবান্‌কে হুকুম দিবেন যে, কল্‌বার্টকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাহার সাহস দেখিয়া তিনি মুহূর্ত্তেকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

কলবার্ট বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার সহিত অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি; যদিও আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ করি নাই, তথাপি তাহাতে আপনার ক্ষতি হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া বণিক্ আরও বিস্মিত হইলেন। কল্‌বার্টও সুবিধা বুঝিয়া গৃহের মধ্যে আরও একটু অগ্রসর হইলেন, এবং জামার পকেট হইতে কতকগুলি মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমাকে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যে চারিশত পঞ্চাশ ক্রাউন দিয়াছিলেন তাহা এই। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই টাকা লইয়া আমার প্রদত্ত রসীদ খানি ফিরাইয়া দিন। আমি আপনার নিকট যে কাপড় বিক্রয় করিয়াছি তাহার মূল্য পোনর ক্রাউন হিসাবে না হইয়া আট ক্রাউন হিসাবে হইবে। তাহা হইলে আমি আপনার দুইশত চল্লিশ ক্রাউন পাইব, বাকী দুইশত দশ ক্রাউন আপনি ফিরাইয়া পাইবেন। আমি ঐ টেবিলের উপর সমস্ত রাখিয়াছি।"

এই সকল কথা শুনিয়া বণিকের ক্রোধ চলিয়া গেল। তিনি মিষ্টবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক ত? তুমি কি ঠিক জান ইহাতে কোন ভুল হয় নাই।"

কল্‌বার্ট উত্তর করিলেন, "না মহাশয়! আমি যাহা বলিলাম ইহাতে কোন ভুল নাই। আপনার কাজের সময় আপনাকে বিরক্ত করিলাম বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু আমি স্বয়ং আমার ভুল বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বে যদি আপনি তাহা জানিতে পারিতেন তাহা হইলে আমার আক্ষেপ রাখিবার স্থান থাকিত না। আমি এখন বিদায় হই।"

বণিক বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর, তুমি কি জান যে, আমি কাপড়ের দর দামের বিষয় কিছু জানি না, সুতরাং তুমি ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত টাকা নিজে লইতে পারিতে?"

"সে কথা আমার মনেই আসে নাই।"

"কিন্তু যদি ইহা তোমার মনে হইত, তাহা হইলে কি করিতে?"

"এরূপ ইচ্ছা আমার মনে আসা অসম্ভব।"

"তুমি সাধুতার অনুরোধ এই যে টাকা আমাকে

ফিরাইয়া দিলে, ইহা যদি আমি তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করি?"

ব্যাপ্টিষ্ট কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া বলিলেন, "আমার ঐ টাকাতে কি অধিকার আছে? এবং আপনিই বা উহা আমাকে দিবেন কেন? আমি কখনই উহা লইব না।"

বণিক্ ব্যাপ্টিষ্টির হস্ত নিজের হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।" বণিকের এক একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল কল্‌বার্টকে ঐ টাকা গ্রহণ করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। কিন্তু পাছে তাঁহার মনে ক্লেশ হয় এই আশঙ্কায় তাহা হইতে নিরস্ত হইয়া মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

ব্যাপ্টিষ্ট সত্বর বণিকের বাটী হইতে বাহির হইয়া যেমন রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন, অমনি কে সজোরে তাঁহার জামার কলার ধরিল। ব্যাপ্টিষ্ট দেখিলেন তাঁহার প্রভু বৃদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী। কলবার্ট টাকা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট গালি বর্ষণ পূর্ব্বক বলিল, "যা, আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যা। আর তোকে আমার কাজ করিতে হইবে না। আমাকে যেন আর কখনও তোর মুখ দেখিতে না হয়।"

* * *

সেই দিন সন্ধ্যাকালে ব্যাপ্টিষ্টির পিতামাতা আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় বালক কলবার্ট অপ্রতিভ ও দুঃখিত ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমার মনিব আমাকে কর্ম্ম হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছেন।"

বৃদ্ধ কলবার্ট একটু রুষ্ট ভাবে বলিলেন, "তবে বোধ হয় তুমি কোন অন্যায় কাজ করিয়াছিলে?"

তখন ব্যাপ্টিষ্ট সমস্ত ঘটনা সরলভাবে যথাযথ বর্ণন করিলেন। তিনি কোনও কথা বাড়াইয়া বলিলেন না, তাঁহার প্রভুর চরিত্রের কোন প্রকার নিন্দাও করিলেন না। তাঁহার কথা শেষ হইলে তাঁহার পিতা সগর্ব্বে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র বটে, তুমি বেশ কাজ করিয়াছ।"

তাঁহার মাতাও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, ব্যাপ্টিষ্ট, তুমি ঠিক কাজ করিয়াছ।"

ভিখারিণীর প্রার্থনা।

(১)

"দ্যাখো বাবা একবার চেয়ে,
দুয়ারে যে আছিগো দাঁড়ায়ে,
পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়
ম'রে যাই ক্ষুধার জ্বালায়
চরণও ত চলে নাকো আর
চাও বাবা চাও এক বার।

(২)

"এক মুঠো অন্ন সুধু চাই
তাও কি এ পোড়া ভাগ্যে নাই?
কচি কচি শিশু দুটী আছে
অন্ন বিনে শুকিয়ে যে গেছে
কি নিয়ে তাদের মুখে দেবো
কোন্ প্রাণে ঘরে ফিরে যাব?

(৩)

"তোমাদের এ ধন থাকিতে
আমরা কি পাব না খাইতে?

ঈশ্বরের রাজ্যের ভিতরে
মোরা কি মরিব অনাহারে?
সুখ ইচ্ছা অন্য কিছু নাই
এক মুঠো অন্ন সুধু চাই!

(৪)

"চাও তবে একবার চাও
এক মুঠো অন্ন সুধু দাও
তোমাদের "জয় জয়" হবে
এক গুণে দশ গুণ পাবে।
কাঙালেরে এক মুঠো দিলে
শত মুষ্টি মেলে পরকালে।"

মেরী কার্পেণ্টার।

স্নেহ, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি গুণে স্ত্রীজাতীর হৃদয় পরিপূর্ণ। স্ত্রীজাতীর হৃদয়ে যদি এই সকল প্রবৃত্তিগুলি না থাকিত, যদি তাঁহাদিগের হৃদয় পুরুষের মত কঠিন হইত, অন্যের দুঃখ কষ্টে যদি তাঁহাদিগের হৃদয় ব্যথিত না হইত, অন্যের চক্ষে জল দেখিলে যদি ইহাঁদিগের চক্ষের জল না পড়িত, তাহা হইলে আর মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকিত না। মাতার স্নেহ, ভগ্নীর ভালবাসা,—এই সকল আছে বলিয়া আমরা কত দুঃখ কষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি, কত শোক যন্ত্রণা ভুলিতেছি, কত সুখে সুখী হইতেছি। যদি ইহাঁদিগের হৃদয়ে এই স্বর্গীয় প্রবৃত্তিগুলি না থাকিত, যদি স্ত্রীজাতীর হৃদয় কোমল না হইয়া কঠিন হইত, স্নেহ মমতা প্রভৃতি না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট অনেক বাড়িয়া যাইত। স্ত্রীজাতীর হৃদয়ে স্নেহ, মমতা, দয়া ও পরোপকারের প্রবৃত্তি আছে বলিয়া পৃথিবীর অনেক দুঃখ কষ্ট কমিয়া গিয়াছে। রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখ কষ্টে ও ক্লেশ যন্ত্রণায় সহানুভূতি, এমন আর কে করিতে পারে? সংসারের সহস্র কার্য্যের মধ্যেও তাঁহাদিগের এই প্রবৃত্তি কার্য্য করিতেছে। আবার এমন কতগুলি রমণী আছেন, যাঁহারা সংসারের আর সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরোপকার ব্রতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি কখন দৃক্‌পাতও করেন নাই। অন্যের দুঃখ, অন্যের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য, অন্যের চক্ষের জল মুছাইবার জন্য, তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। মানুষের মধ্যে ইহাঁরা দেবী। আমরা ক্রমে ইহাঁদিগের এক একটি চিত্র সখার পাঠিকাদিগের সম্মুখে ধরিব। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশে এ প্রকার দৃষ্টান্ত থাকিলেও তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন; সুতরাং হয়ত অনেক সময় আমাদিগকে বিদেশীয় দৃষ্টান্ত পাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।

পরোপকার ব্রতে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, মেরী কার্পেণ্টারের নাম, তাঁহাদিগের মধ্যে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। ইহাঁর দয়া, ইহাঁর পরোপকারের প্রবৃত্তি, কেবল আত্মীয় বা স্বদেশীয়দিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, কিন্তু এই দূরদেশ, ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইনি বাল্যে এই পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং আজীবন ইহাতেই নিযুক্ত ছিলেন।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী একস্কিটার নামক স্থানে ডাক্তার ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার নামে একজন অতি সদাশয় এবং পরহিতৈষী ধর্ম্ম-যাজক বাস করি-

তেন। ১৮০৭ সালে ৩রা এপ্রিল তাঁহার একটী কন্যা জন্মে; এই কন্যাই মেরী কার্পেণ্টার। ডাক্তার কার্পেণ্টারের আরও দুটী কন্যা এবং দুটী পুত্র জন্মে। বাল্য কালেই মেরীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি এবং অত্যন্ত কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যে জ্ঞান ও ধর্ম্মে তাঁহার জীবন উজ্জ্বল হইয়াছিল, মেরী বাল্য বয়সেই ধার্ম্মিক পিতার নিকট তাহার উপদেশ পাইয়াছিলেন; এবং যে পরোপকার ব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সদাশয় পরহিতৈষী পিতার দৃষ্টান্তে, এই বাল্য বয়সেই তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ১৮১৭ সালে ডাক্তার কার্পেণ্টার ব্রিষ্টলে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ব্রিষ্টলে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া ব্যতীত ছাত্র-

দিগকে বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, এবং নীতি ও ধর্ম্ম বিষয় উপদেশ দিবার জন্য, একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মেরীর জ্ঞানতৃষ্ণা অতিশয় প্রবল ছিল; তিনি পিতার নিকট বালকদিগের সহিত শিক্ষা লাভে প্রবৃত্ত হইলেন, পিতাও কন্যার শিক্ষা লাভের ইচ্ছা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া যত্নের সহিত ক্রমে উচ্চ উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। মেরীও পিতার যত্নে ও উপদেশে, এবং আপনার পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে গ্রীক, লাটিন, গণিত, সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠিন কঠিন বিষয়ে অল্প বয়সেই বিশেষ সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে বালিকারা যে পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিত মেরী তদপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা লাভ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কার্য্য করিবার ইচ্ছা মেরীর বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত অধিক ছিল। ক্রমে মেরী তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্ম প্রচার, শিক্ষাদান, পুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতি নানা কার্য্যে ডাক্তার কার্পেণ্টার ব্যাপৃত ছিলেন। মেরী পিতাকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বয়স এই সময় সতের বৎসর মাত্র; কুমারী কার্পেণ্টার মাতা ও ভগ্নীর সাহায্যে বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিলেন; এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত বালকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কুমারী কার্পেণ্টার অনেক দিন হইতে বালিকাদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন; ক্রমে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া রীতিমত বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৩১ সালে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ভারও তিনি গ্রহণ করিলেন; এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা দান ব্যতীত ছাত্রদিগের বাড়ীতে যাইয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সময় তাঁহার আর এক দিকে দৃষ্টি পড়িল। বিলাতের নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, ইহারা যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করে তাহা প্রায় সমস্তই সুরাপানে ব্যয় করে, স্ত্রী পুত্র কিম্বা পরিবারের অন্য সকলকে নিতান্ত কষ্টে, এমন কি অনেক সময় অনাহারে দিনপাত করিতে হয়। অনেক সময় এমনও ঘটে যে, স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া পিতা মাতা সন্তানদিগকে পথে পরিত্যাগ করিয়া যায়। কুমারী কার্পেণ্টার যখন ছাত্রদিগের বাড়ীতে যাইতেন, তখন এই সকল শোক দুঃখের ছবি তাহার চক্ষে পড়িত; এই সকল দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইত; ইহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং কি উপায়ে এই নিরাশ্রয় নিরন্ন লোকদিগের দুঃখ ক্লেশ দূর করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে, পরোপকার ব্রতে কুমারী কার্পেণ্টার নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই ব্রিষ্টল নগরে তাহার সূত্রপাত হইল। কিছুকাল চিন্তার পর তিনি জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ব্রত সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন, কিছুতেই তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। এই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তিনি ক্রমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং ঈশ্বরের নিকট বল ও সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একটী ঘটনাতে তিনি অভিষ্ট বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইলেন। ১৮৩৩ সালে দুই মহাত্মা তাঁহাদিগের গৃহে অতিথি

হন; এই দুই মহাত্মার ধর্ম্মপরায়ণতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সকল প্রকার হিতজনক কার্য্যে একাগ্রতা দেখিয়া কুমারী কার্পেণ্টার অনেক শিক্ষা লাভ করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে একজন, মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়, আর একজন আমেরিকার বোষ্টন নগর নিবাসী ডাক্তার জোসেফ টুকারম্যান্। রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার যশ সেখানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তাঁহার উদার শিক্ষায় কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডে ও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মান পাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ডাক্তার কার্পেণ্টারের পরম বন্ধু ছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার ষ্টেপল্টন্ গ্রোভ নামক স্থানে প্রতিদিন এই উদার প্রশস্ত-হৃদয় অতিথির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহার নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই রাজা রামমোহন রায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন, ক্রমে রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিল, রোগের হাত হইতে তিনি আর রক্ষা পাইলেন না; ২৭ এ সেপ্টেম্বর অপরিচিত স্থানে ভারতের গৌরব-রবি অস্তমিত হইলেন। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুতে কুমারী কার্পেণ্টার, তাঁহার একজন পরম বন্ধু হারাইলেন। রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তিনি একান্ত মনে রাজার সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে যে করুণার ধারা নিসৃত হইয়া, শত সহস্র দুঃখী সন্তানদিগকে শান্তি প্রদান করিয়াছিল, রাজা রামমোহন রায়ের রোগ শয্যায় তাহার প্রথম বিকাশ হয়। এই মহাত্মার মৃত্যুতে কুমারী কার্পেণ্টার অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হন। রামমোহন রায়ের মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি বুঝিলেন, যে পৃথিবীর সকলই দুদিনের জন্য; সামান্য সুখের জন্য অনন্ত কালের সুখ পরিত্যাগ করা উচিত নহে; পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই মহত্ত্ব, আত্মসুখে যাহারা ব্যস্ত, তাহাদের বৃথা জীবন। এই রূপে মৃত রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তিনি তাঁহার জীবনের মহত্ত্বের কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে মহৎ ও সাধু ইচ্ছা সকল জাগিয়া উঠিতে লাগিল, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী হইল।

ডাক্তার টুকার্ম্যানের নিকটেও কুমারী কার্পেণ্টার অনেক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অতিশয় দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; বোষ্টন নগর নিবাসী দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচনের জন্য ইনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। এতদিন পরে কুমারী কার্পেণ্টারের আশা পূর্ণ হইল। ১৮৩৫ সালে দরিদ্রদিগের অবস্থা ও কার্য্য পরিদর্শনের জন্য একটি সভা স্থাপিত হয়। বিশ বৎসরেরও অধিককাল তিনি এই সভার সম্পাদক ছিলেন, এবং তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে এই সভা দ্বারা অনেক কার্য্য হইয়াছিল। অনেক দুর্দ্দশাগ্রস্থ পরিবারে সুখ শান্তি বিস্তারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহকারীদিগের উৎসাহ ও কার্য্য তৎপরতার অভাবে, তাঁহার উদ্দেশ্য এই সভা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল না। তিনি ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম কিছুই কমিল না; কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমেরিকা হইতে ডাক্তার গ্যানেট্ নামক আর একজন দরিদ্র-হিতৈষী পুরুষ ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

———

পম্পীয়াই।

আমরা অনেক সময় মানুষের খেয়াল্‌ই বুঝিতে পারি না, প্রকৃতির খেয়াল্ কেমন করিয়া বুঝিব! প্রকৃতির অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইয়া থাকিতে হয়; মানুষের সামান্য বুদ্ধিতে তখন আর কুলায় না; মানুষ অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, আর ভাবে এ কি হইল! ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণবায়ু, সমুদ্র জলের উচ্ছ্বাস প্রভৃতিতে কত কত ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যে সুন্দর অট্টালিকায় সুখে বাস করিতেছ, আমোদ প্রমোদে মাতিয়া সময় কাটাইতেছ; যে নানাবিধ ফুল ফলে সুশোভিত উদ্যানে বিচরণ করিয়া কত সুখী হইতেছ, যে পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছ; তোমার সে সুন্দর গৃহ সে সুন্দর উদ্যান, সে সুদৃঢ় পর্ব্বত,—কিছুই নিরাপদ নয়। প্রকৃতির খেয়াল্ হইলে তোমার সুন্দর গৃহ মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, ধূলা হইয়া যাইতে পারে, তোমার সুন্দর উদ্যান মরুভূমিতে পরিণত হইতে পারে, যেখানে ঐ পর্ব্বৎ মাথা উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেখানে সমুদ্র তরঙ্গ খেলিতে পারে। ভাবিয়া দেখিতে হইলে, আমরা মৃত্যুরই হাতের মধ্যে রহিয়াছি; কখন প্রকৃতির কি খেয়াল্ হইবে, আর নিমেষে প্রকৃতির এ লীলাক্ষেত্র হইতে আমাদিগকে কি জানি কোথায় লইয়া যাইবে!

কিন্তু সে কথা থাক্, প্রকৃতির একটী খেয়ালে ইটালী দেশের পম্পীয়াই নগরের যে দশা হইয়াছিল, তাহাই আজ বলিব। ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাৎ, এদুটীই বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ, এবং এ দুয়েরই মধ্যে খুব সম্বন্ধও আছে। এই দুয়ের দ্বারা যে কত সর্ব্বনাশ, কত কি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ১৭৫৫ সালের ১লা নভেম্বর এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া লিসবন্ নগর একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। বিপদ প্রায় একা আসে না। একদিকে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে নগরের সমস্ত অট্টালিকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল, এ দিকে চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, ভূতল হইতে ভয়ঙ্কর গন্ধকের বাষ্প উত্থিত হইয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। যাহারা কোনমতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা সমুদ্র তীরে গিয়া আশ্রয় লইল; কিন্তু সেখানেও আর এক বিপদ উপস্থিত হইল, সমুদ্র জল পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া তীরের দিকে আসিতে লাগিল; জলস্রোত আসিয়াই তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, এবং কত জীবন সেই সঙ্গে ভাসিয়া গেল। কতকগুলি লোক নিরাপদ ভাবিয়া এক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রের গ্রাস হইতে তাহারাও রক্ষা পায় নাই; সেই স্থানটী একেবারে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ভূমিকম্প এত প্রবল হইয়াছিল যে, জাহাজের যে সকল নঙ্গর নদীগর্ভে ফেলা ছিল, সে গুলি একেবারে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। এবং নদীর জল একেবারে ১৪।১৫ হাত স্ফীত হইয়া আবার মুহূর্ত্তে পূর্ব্বের মত হইয়া গেল। কথিত আছে সহস্রেরও অধিক লোক এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে প্রাণ ত্যাগ করে।

১৮১৫ সালে সম্বরীপে যে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাৎ হইয়াছিল, তাহাতে বার হাজার লোকের মধ্যে কেবল মাত্র ছাব্বিস জন জীবিত ছিল। এই

সময় আর একটী ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হয়, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবায়ু উত্থিত হইয়া, মানুষ গরু ঘোড়া প্রভৃতি সমস্ত আকাশের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল; বৃক্ষ সকল উন্মূলিত করিয়া সমুদ্র ছাইয়া ফেলিল।

১৬৬৯ সালে এট্না হইতে যে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহাতে চৌদ্দখানি নগর ও গ্রাম ধ্বংস হইয়া যায়। এবং যে ৫৪ দিন পর্য্যন্ত অগ্ন্যুৎপাত হইতে ছিল, তাহাতে সূর্য্য বা চন্দ্র কেহ দেখিতে পায় নাই; ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতির কোনটীই সামান্য নহে। ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এক ভয়ানক ঘটনা হয়; দৌলতখাঁর ঝড় অনেকের মনে থাকিতে পারে। এই ভয়ঙ্কর ঝড়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালার যে কত লোকের প্রাণ নাশ হয়, তাহার সংখ্যা নাই। ঝড় বলিয়া সেটী বিখ্যাত, কিন্তু বাস্তবিক ঝড় না বলিয়া সেটীকে জলপ্লাবন বলাই উচিত। আমরা শুনিয়াছি, যে দিন এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হইয়াছিল, সেদিন কিছু পূর্ব্বেও কেহ কিছু বুঝিতে পারে নাই; অকস্মাৎ এই ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হয়। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অনেক গুলি নদীর জল প্রায় শুকাইয়া যায়, সেই সমস্ত জল একত্রিত হইয়া দৌলতখাঁ প্লাবিত করিয়া দেয়।

এখন মূল প্রস্তাবের বিষয় বলা যাউক। বেলা অপরাহ্ণ, আকাশ বেশ নির্ম্মল, বেশ শীতল বাতাস বহিতেছে। পম্পীয়াই নগরবাসীগণ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এমন সময় অকস্মাৎ বিসুভিয়স পর্ব্বত হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সেই ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, অমাবস্যার ন্যায় অন্ধকারে সমস্ত নগর পূর্ণ হইল। ক্রমে সেই ধূম রাশির সহিত ভস্ম, উত্তপ্ত প্রস্তর খণ্ড, এবং গন্ধকের বাষ্প উত্থিত হইতে লাগিল। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ভস্ম ও প্রস্তর দুই তিন হাত উচ্চ হইয়া জমিয়া গেল। ক্রমে নদীতে বাণ আসিবার সময় যে প্রকার শব্দ হয়, সেই প্রকার শব্দ হইতে লাগিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল যে, কৃষ্ণ বর্ণের কাদার এক প্রকাণ্ড স্রোত দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই কর্দ্দম স্রোতে নগরের সমস্ত রাজপথ এবং গৃহ প্রভৃতি পূর্ণ হইয়া গেল। যে, যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় এই স্রোতে প্রোথিত হইল; যাহারা গৃহের মধ্যে ছিল, তাহারা সেখানেই এই কর্দ্দমে আবৃত রহিল, যাহারা পলায়ন করিতেছিল, তাহারাও কতক প্রস্তর বৃষ্টিতে আহত হইয়া পতিত হইল, কেহ বা গন্ধকের গন্ধে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল, কেহ বা কর্দ্দম স্রোতে প্রোথিত হইয়া রহিল। তিন দিন তিন রাত্র ক্রমাগত এই ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল; এবং এ তিন দিনে সমস্ত নগরটী একেবারে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে আর কোন উপদ্রব ছিল না; তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে; ভস্ম ও প্রস্তর বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে, কর্দ্দম স্রোত নিবারিত হইয়াছে, গন্ধকের বাষ্প আর উঠিতেছে না। নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে, চারিদিক স্থির—ধীর; কিন্তু মহাসমৃদ্ধশালী সে পম্পীয়াই নগর আর নাই—নগরের চিহ্ন মাত্রও নাই। যেখানে পম্পীয়াই নগরের রাজপ্রাসাদ, মন্দির ও অন্যান্য সহস্র সহস্র অট্টালিকা ছিল, সেখানে কেবলমাত্র ভস্ম ও কর্দ্দমের স্তূপ দেখা গেল। পম্পীয়াইর সঙ্গে হর্কুলেনিয়মও প্রোথিত হয়। প্রায় সতের শত বৎসর এই দুই নগর ভস্ম ও কর্দ্দমের নীচে প্রোথিত থাকে। এই সময়ের মধ্যে ইহার উপর মাটি জমিয়াছিল, এবং কৃষকগণ কৃষিকার্য্যও আরম্ভ করিয়াছিল।

পরে একদিন কৃষকগণ খনন করিতে করিতে মাটির নীচে অট্টালিকার চিহ্ন দেখিতে পাইল। তখন ইহার বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হইল; নেপল্‌সের রাজা উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিলেন; এবং খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। ক্রমে পম্পীয়াইয়ের রাজপথ এবং অট্টালিকা সকল বাহির হইতে লাগিল। কোন স্থানে ঝাড়, লণ্ঠন, ছবি প্রভৃতি নানাপ্রকার আসবাব সজ্জিত অট্টালিকা বাহির হইল; কোন স্থানে নানাবিধ দ্রব্য পূর্ণ দোকান দেখা গেল, কোথায়ও মিষ্টান্ন পূর্ণ ময়রার দোকান বাহির হইল; একটী দোকান খনন করিয়া দেখা গেল, যে দোকানী রুটী, পেয়াজ ও মাছের চচ্চড়ী বিক্রয় করিতেছিল, সেই অবস্থায়ই প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। একটা খুব বড় বাড়ী দেখা গেল, নানাপ্রকার গৃহ সজ্জায় বাড়িটী সজ্জিত রহিয়াছে, কিন্তু একটীও লোক নাই; পরে দেখা গেল নীচের একটা ঘরে সতেরটী মানুষের কঙ্কাল রহিয়াছে; দেখিয়া বোধ হইল যে, যখন কর্দ্দম স্রোত গৃহে প্রবেশ করে, তখন গৃহস্বামী তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেই ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মাটিতে তাঁহাদের শরীরের এবং বস্ত্রাদি ও অলঙ্কারের অবিকল ছাঁচ রহিয়াছে। সেই ছাঁচ দেখিয়া সমস্তই বেশ বোঝা যায়; ঐ সতের জনের মধ্যে একজন সেই বাড়ীর কর্ত্রী; তাঁহার সূক্ষ্ম রেশমের বস্ত্র পরিধানে ছিল, এবং হাতে একখানি রুমালে কতকগুলি চাবি বাঁধা ছিল, আর এক হাতে একটী ছেলেকে ধরিয়া ছিলেন। তাঁহার পাশে একটী যুবতী কন্যা, এবং দুটী ছোট ছেলে ভয়ে বসিয়া পড়িয়াছে। আর এক স্থানে দেখা গেল একজন স্ত্রীলোক অলঙ্কারের বাক্স লইয়া পলায়ন করিতেছিল, এমন সময় কর্দ্দম স্রোতে তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের উপর বড় মমতা, মরিবার সময়ও ঐ স্ত্রীলোক তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, দেখা গেল বুকে করিয়া মাটির মধ্যে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। দুই জন চোর একটা ধাতুনির্ম্মিত পুতুল লইয়া পলাইতেছিল, তাহারা সেই অবস্থায়ই প্রোথিত রহিয়াছে। এই প্রকার নানাবিধ অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়াছিল; সমস্ত লিখিতে হইলে অনেক হইয়া পড়িবে।

আমরা পম্পীয়াইয়ের কথা লিখিতে গিয়া প্রকৃতির অনেক খেয়ালের কথা লিখিয়া ফেলিয়াছি। বাস্তবিক কেন এ সকল ঘটনা ঘটে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কি কারণে ঘটে তাহাও অনেক সময় মানুষের বুদ্ধিতে কিনারা হয় না। অথচ এই সকল অদ্ভুত ঘটনা যে কেবল প্রকৃতির খেয়াল্, তাহাও নহে। ইহার যে কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা নহে; তবে সকল আমরা বুঝিতে পারি না। যেখানে সমতল ভূমি ছিল সেখানে হয়ত পর্ব্বত মালা শোভা পাইতেছে, যেখানে সুন্দর উদ্যান ছিল, সেখানে হয়ত আজ মরুভূমি, যেখানে মহাসমৃদ্ধশালী নগর ছিল, সেখানে হয়ত আজ সমুদ্র তরঙ্গ খেলিতেছে! কেন?—তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহার যে কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা নহে। এক একটী ঘটনায় হয়ত লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন যাইতেছে; কত শত গ্রাম, কত শত সমৃদ্ধ নগর ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; তবু ও ইহার যে কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা নহে। সকলেরই উদ্দেশ্য আছে—প্রকৃতির খেয়ালেরও উদ্দেশ্য আছে; আমাদিগকে লইয়াও প্রকৃতি খেলা করিতেছে; প্রকৃতির কখন কি খেয়াল্ হইবে, তাহাতে কে কোথায় ভাসিয়া যাইব—কে জানে?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

আগষ্ট, ১৮৮৭।

মেরী কার্পেণ্টার।

(১০৯ পৃষ্ঠার পর।)

ডাক্তার গ্যানেটের আগমন উপলক্ষে কার্পেণ্টারের যত্নে, ব্রিষ্টলে একটী সভা হয়। ডাক্তার গ্যানেটের মুখে আমেরিকার দরিদ্রদিগের উন্নতির বিবরণ শুনিয়া, আপনাদিগের মধ্যেও সেই প্রকার প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ জন্মে। মেরী কার্পেণ্টারও ইহার উপর তাঁহার সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়া, আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত ব্রত পালন করিতে উদ্যোগী হন। তিনি দরিদ্র ও নিরাশ্রয়দিগের বাড়ী যাইয়া, তাহাদিগকে রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে সাহায্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে দুঃখ বিষাদ ও দুর্দ্দশার ছবি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখে বিচলিত হইত। কিন্তু তাহাতে তিনি এক দিনের জন্যও কাতর বা নিরুৎসাহ হন নাই। তাঁহার মুখ সকল সময়ই প্রসন্ন থাকিত, হৃদয় সকল সময়ই প্রফুল্ল থাকিত; তাই তিনি দুঃখের মধ্যে সুখ, বিষাদের মধ্যে প্রসন্নতা আনিতে পারিয়াছিলেন। দীন, দুঃখী, দুর্দ্দশাগ্রস্থ লোকেরা তাঁহার অসীম স্নেহে, তাহাদিগের সকল দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়াছিল।

এই সময় একটী গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইল; কুমারী কার্পেণ্টার পিতৃহারা হইলেন। কার্পেণ্টারের স্বভাবতঃ কোমল হৃদয়, এই শোকে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কিন্তু ধীরতার সহিত নিজ শোক চাপিয়া রাখিয়া, শোক সন্তপ্ত মাতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি ৬.. সময়ে কয়েকটী কবিতা রচনা করেন, তাঁহার হৃদয়ের গভীর শোক এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছিল। শাস্ত্র আলোচনায় এবং শাস্ত্র চিন্তায় তিনি অত্যন্ত সুখী হইতেন; এবং এই শোক সন্তাপের সময়, তাহা দ্বারা তিনি আপনাকে অনেক সময় প্রসন্ন রাখিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কত বালক বালিকা পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া,—আশ্রয়শূন্য হইয়া, রাজপথে কান্দিয়া কান্দিয়া বেড়ায় তাহার সংখ্যা নাই। এই হতভাগাদিগকে আশ্রয় দান, বা ইহাদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য পূর্ব্বে কেহ কোন চেষ্টা করেন নাই। ইহারা একটু আশ্রয়ের জন্য, এক মুঠা অন্নের জন্য, লালায়িত হইয়া বেড়াইত, কিন্তু ইহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া কেহ তাহা মোচন করিবার জন্য অগ্রসর হন নাই। ক্রমে কুসঙ্গে এবং প্রলোভনে পড়িয়া

ইহাদিগের চরিত্র দূষিত হইয়া উঠিত; ইহারা চুরী করিতে শিখিত, দস্যুবৃত্তি শিখিত, এবং নানাপ্রকার অসৎকার্য্যে জীবন কাটাইত। আবার এমন কতকগুলি লোক ছিল, যাহারা এই সকল বালক বালিকাদিগকে রীতিমত এই সকল দুষ্কার্য্য শিক্ষা দিত। মেরী কার্পেণ্টারের হৃদয়, এই সকল বালক বালিকাদিগের অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল; এই অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। কি উপায়ে ইহাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে অতি সামান্য লোকের দ্বারাও কত সময় কত মহৎ কার্য্যের সূচনা হয়। যে র‍্যাগেড স্কুলের (Ragged School) দ্বারা এখন ইংলণ্ডের এত উপকার হইতেছে, একজন সামান্য চর্ম্মকারের দ্বারা তাহার সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডে পোর্টসমাউথ নামক স্থানে জন্ পাউণ্ডস্ নামে একজন চর্ম্মকার ছিলেন। সদাশয় সাধু প্রকৃতি জন পাউণ্ডস্ দুঃখী অনাথ বালক বালিকাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য অগ্রসর হন। ইনি নিজের জুতার দোকানে অনাথ বালক বালিকাদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা ও সদুপদেশ দিতেন। তাঁহার যত্নে ও উপদেশে অনেক বালক বালিকা, দুঃখ দুর্দ্দশা, পাপ ও অসৎ কার্য্যের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। জন্ পাউণ্ডসের দৃষ্টান্তে অনেক হিতৈষী ব্যক্তি এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন; র‍্যাগেড্ স্কুল স্থাপিত হইল।

কার্পেণ্টার অনেক দিন ধরিয়া, অনাথ বালক বালিকাদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, র‍্যাগেড্ স্কুলের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া, তাঁহার আশার সঞ্চার হইল। ১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট লিউইন্‌স্ মিড্ নামক স্থানে তিনি একটী র‍্যাগেড্ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত, ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তাঁহার চেষ্টা ও আশা ফলবতী হইল। অন্যান্য বিষয়ের সহিত বালক বালিকারা, যাহাতে নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া, উন্নতমনা ও উন্নতচরিত্র হয়, সে দিকে কার্পেণ্টারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পূর্ব্বে যাহারা আশ্রয়-শূন্য সহায়-শূন্য হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত; সৎ উপদেশ এবং সৎসঙ্গের অভাবে যাহারা প্রলোভন ও কুসঙ্গে পড়িয়া, নানাবিধ দুষ্কার্য্যে দিন কাটাইত, মেরী কার্পেণ্টারের আন্তরিক যত্ন ও অক্লান্ত চেষ্টায়, তাহারা ক্রমে সুচরিত্র হইতে লাগিল; অসৎ প্রকৃতি সংশোধিত হইয়া, সাধু প্রবৃত্তি সকল ক্রমে তাহাদিগের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মেরী কার্পেণ্টার জীবনের এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন; কিন্তু তখন আর এক দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণও চুরী প্রভৃতি অপরাধে রাজবিধি অনুসারে দণ্ড পাইয়া থাকে। এই সকল অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ কারাগারে প্রবেশ করিলে, ইহাদিগের স্বভাব সংশোধিত হওয়া দূরে থাক্, কারাগারের অসৎ-প্রকৃতি লোকদিগের সংসর্গে, ইহাদিগের চরিত্র আরও দূষিত হইয়া উঠে, দুষ্কার্য্যে আরও অনুরক্ত হইয়া পড়ে, এবং মুক্তিলাভ করিয়া আবার দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হয়, ও দণ্ড পাইয়া আবার কারাগারে প্রেরিত হয়। একবার কারাগারে প্রবেশ করিলে, আর কেহ, —এমন কি আত্মীয় স্বজনেরাও, আর ইহাদিগকে আশ্রয় দিতে চাহে না; সুতরাং চুরী প্রভৃতি অসৎ কার্য্যের দ্বারাই ইহারা দিনপাত করিতে বাধ্য হয়। এপর্য্যন্ত আর কেহ এই হতভাগ্যদিগের উদ্ধারের

জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। কিন্তু মেরী কার্পেণ্টারের পরদুঃখ-কাতর হৃদয়, ইহাদিগের দশা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। তিনি বালঅপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য, সংস্কার-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। এবং এই সংকল্প সাধন উদ্দেশে ১৮৫১ সালে সংস্কার-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া, একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন্। এই পুস্তক প্রকাশ করা ভিন্ন, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইল; ১৮৫৪ সালে তাঁহার চেষ্টায়, এ সম্বন্ধে এক আইন বিধিবদ্ধ হইল, এবং এই সময় হইতে অনেকে এ বিষয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। সাধারণের এই আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখিয়া, কুমারী কার্পেণ্টারও উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন; এবং ১৮৫২ সালে কিংস-উড্ নামক স্থানে সংস্কার-বিদ্যালয় খোলা হইল; —মেরী কার্পেণ্টারের জীবনের আর একটী মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তিনি আন্তরিক যত্ন, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার সহিত, এই বিদ্যালয়ের জন্য খাটিতে লাগিলেন; অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার চেষ্টার সুফল ফলিতে লাগিল। কুমারী কার্পেণ্টারের আর একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, বালক ও বালিকা দিগকে এক বিদ্যালয়ে রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে; ইহাতে বালিকাদিগের পাঠের বিশেষ বিঘ্ন হয়। এজন্য তিনি বালকদিগের জন্য, একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। কবি বায়রণের পত্নী, মেরী কার্পেণ্টারের বিশেষ বন্ধু ছিলেন; তিনি নিজ ব্যয়ে ব্রিষ্টল নগরে "রেড্-লজ্" নামক একটী বড় বাড়ী কিনিয়া দিলেন। ১৮৫৩ সালে ১০ই অক্টোবর, এই বাড়ীতে বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় খোলা হইল। কুমারী কার্পেণ্টার এই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার লইলেন। তাঁহার আন্তরিক যত্নে, তাঁহার শিক্ষায়, তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে, বালিকাদিগের চরিত্র সংশোধিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে তাহাদিগের হৃদয়ের সাধু বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। যাহারা এক সময়ে, সমাজ এবং আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, চুরী প্রভৃতি নানা প্রকার অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া জীবন কাটাইত; বার বার কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, সমাজকে যাহারা আপনাদিগের শত্রু মনে করিত, এবং যথাসাধ্য শত্রুতা সাধনের চেষ্টা করিত; মেরী কার্পেণ্টারের যত্নে ও শিক্ষায়, উপদেশে ও দৃষ্টান্তে, তাহারাই আজ সংসারে সৎপথ অবলম্বন করিয়া সুখে জীবন কাটাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, ইহাদিগের মধ্যে অনেকে আবার অন্যকে সংশোধন করিবার জন্য যত্নবতী হইয়াছেন। বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিক্ষার সঙ্গে, সৎপথে থাকিয়া যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এ প্রকার নানা কার্য্য ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। "রেড্-লজ্" বিদ্যালয়ের সুফল দেখিয়া, অন্যান্য স্থানেও এই প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পৃথিবীর প্রধান ব্যক্তিরা যাহা করিতে পারেন নাই, একটী অবলা সেই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। এই জন্যই একটী কথা প্রচলিত আছে;—"সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।"

যাঁহাদিগের হৃদয়ে দয়া অধিক—সৎকর্ম্মের দিকে যাঁহাদিগের ইচ্ছা প্রবল, তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন না। কারাগারে কয়েদীগণ ভয়ঙ্কর

ক্লেশ যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য কারাগারে পাঠান হয়; কিন্তু দেখা যায় যে, চরিত্র সংশোধন হওয়া দূরে থাক্, কারাগারের অত্যাচারে এবং যন্ত্রণায়, ইহাদিগের চরিত্র আরও দূষিত হইয়া উঠে। সংস্কার-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, মেরী কার্পেণ্টার আশানুরূপ ফল পাইয়াছিলেন। এখন কারাবাসিদিগের দুর্দ্দশা যাহাতে দূর হয়, তাহারা যাহাতে শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি যত্নবতী হইলেন। ১৮৬৪ সালে "আমাদের কারাবাসী" (our convicts) নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে কারাগারের দূষিত কার্য্য প্রণালীতে, কয়েদীগণের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন; এবং যাহাতে কারাগারের অবস্থার উন্নতি এবং কয়েদীগণের শিক্ষা ও সংশোধনের উপায় হয়, তাহার জন্য কতগুলি সৎপরামর্শ দেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয় নাই; এই পুস্তক প্রকাশের পর এ সম্বন্ধে খুব আন্দোলন উপস্থিত হয়; এবং ইংলণ্ডের কারাগারগুলির সংশোধন ও উন্নতির সূত্রপাত হয়।

মেরী কার্পেণ্টারের বয়স এখন ষাইট বৎসর হইয়াছে। তিনি এক প্রকার বৃদ্ধ দশায় উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সেই যৌবনের উৎসাহ উদ্যম বর্ত্তমান। স্বদেশে তাঁহার কার্য্য এইখানেই এক প্রকার শেষ হইল। কিন্তু এখন আবার এই দূরদেশ,—ভারতবর্ষের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তাঁহার পরমবন্ধু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষবাসী ছিলেন, এই জন্য ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে। এদেশীয় রমণীদিগের সুশিক্ষার কোন প্রকার ভাল বন্দোবস্ত নাই বলিয়া, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন; এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি এদেশে আসিবার জন্য ব্যগ্র হন। এই বয়সে স্বদেশ ছাড়িয়া দূরদেশে যাইতে লোকের কত আশঙ্কা হয়, কিন্তু মেরী কার্পেণ্টারের পরহিতৈষী হৃদয়ে কোন আশঙ্কা উপস্থিত হইল না। ১৮৬৬ সালে তিনি প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন। স্বদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি বালিকাদিগের জন্য একটী শ্রমিক-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আজ পর্য্যন্ত সে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে, এদেশে বালিকাদিগের ভাল শিক্ষা হইতেছে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; এবং উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য, "ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল" স্থাপন করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। মেরী কার্পেণ্টার প্রথমে বম্বে পদার্পণ করেন। বম্বে স্ত্রীশিক্ষা এবং কারাগারের সংস্করণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তার পর বম্বে হইতে কলিকাতা আসিবার পথে, মান্দ্রাজে কয়েকদিন সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী পরিদর্শন করেন। ২০শে নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। মেরী কার্পেণ্টার এদেশীয় মহিলাদিগের মঙ্গল উদ্দেশ্য করিয়া এই দূরদেশে আসিয়াছেন, এ কথা বঙ্গ মহিলারা বিস্মৃত হন নাই। বঙ্গ মহিলারা এই সময়ে তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি,দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। মেরী কার্পেণ্টারও ইহাঁদিগের বিনয় ও নম্রতাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া, কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া শিক্ষা প্রণালী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন; এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে বম্বে ও কলিকাতায় দুইটী সামাজিক বিজ্ঞান সভাও স্থাপিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির চেষ্টা এবং বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন ভিন্ন, মেরী কার্পেণ্টার কারাগার এবং কারখানা প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। কারখানা গুলিতে অনেক দরিদ্র ও নিরন্ন লোক প্রতিপালিত হইতেছে দেখিয়া, পর-দুঃখ-কাতর কার্পেণ্টার একান্ত সুখী হন। তিনটী প্রধানউদ্দেশ্য লইয়া পরহিতৈষী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। প্রথম—স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি; দ্বিতীয়—ইংলণ্ডে যে প্রণালীতে সংস্কার-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই প্রণালীতে সংস্কার-বিদ্যালয় স্থাপন, তৃতীয়—কারাগার সংস্কার। গভর্ণর জেনারেলের নিকট এই তিনটী বিষয়ে, মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; এবং যাহাতে এই উদ্দেশ্য ফলবতী হয়, যথাসাধ্য তাহার চেষ্টাও করেন। সময়ে তাঁহার উদ্দেশ্য ফলবতী হইয়াছিল। ২০শে মার্চ্চ মেরী কার্পেণ্টার ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ভারতবর্ষে আসিয়া যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে ছয়মাস অবস্থান" নামক এক পুস্তকে সে সমস্ত প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে বালকদিগের শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা, শ্রমিক-বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, কারা-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে, তাঁহার অভিপ্রায় এবং অনেক সৎপরামর্শ লিপিবদ্ধ করেন। এই পরহিতৈষী অবলার হৃদয় কতখানি মহৎ ভাবে পরিপূর্ণ ছিল, ইহাতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি অন্য কোনভাবে পরিচালিত হইয়া নিজের মত প্রকাশ করি নাই, ভারতবর্ষের জন্য কার্য্য করা, এবং ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন করাই, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।" প্রসংশা বা সম্মান লাভের আকাঙ্খায়, সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি এদেশে আসেন নাই। নিস্বার্থ পরোপকার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাই তাঁহার আশা—তাঁহার উদ্যম ফলবতী হইয়াছিল।

কার্পেণ্টার দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে অসিয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে মহিলাদিগের জন্য নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করেন; এবার শারীরিক অসুস্থতার জন্য কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই; বম্বে হইতেই তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হয়। এইবার দেশে ফিরিয়া গিয়া, এদেশীয়দিগের সহিত ইংলণ্ডের লোকের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, এবং ভারতবর্ষের সামাজিক উন্নতির জন্য, "জাতীয় ভারত সভা" স্থাপন করেন। ১৮৬৯ সালে মেরী কার্পেণ্টার তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার চেষ্টার সুফল ফলিতেছে, তাঁহার আশা ফলবতী হইতেছে, দেখিয়া তিনি একান্ত সুখী হন; এবং ক্রমে তাঁহার সংকল্প সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া, স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১৮৭৩ সালে এই পরহিতৈষী মহিলা বৃদ্ধ বয়সে কারাগারের অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য, আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৮৭৫ সালে মেরী কার্পেণ্টার শেষবার এদেশে আসেন; বম্বে, পূনা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয়, কারাগার প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া মান্দ্রাজে গমন করেন। সেখানে চিকিৎসালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করেন; এবং মহিলাদিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে দেখিয়া বিশেষ সুখী হন। মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় ও পরে ঢাকায় গমন করেন। ইহার পর বরদা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান পরিদর্শন করিয়া, দেশে ফিরিয়া যান। মেরী কার্পেণ্টার সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই মিশিতেন। তিনি শেষবার যখন কলিকাতায় আসেন, তখন বরাহনগরের শ্রম-

জীবিদিগের প্রত্যেকের বাড়ীতে যাইয়া, তাহাদিগের অবস্থার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের উপরই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, ইহারাই তাঁহার সন্তান তুল্য ছিল; ইহাদিগের জন্যই এই পরহিতৈষী মহিলা, আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

কার্পেণ্টারের ভারতবর্ষে আগমনের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার অক্লান্ত যত্নে, চেষ্টায় ও অধ্যবসায় গুণে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অনেক উন্নতি হইয়াছিল, কারাগারের অবস্থার সংস্কার হইয়াছিল, বিশেষতঃ স্ত্রী-কয়েদীদিগের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন, ও সংস্কার-বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে রাজ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। দেশের লোক যাহা করিতে পারেন নাই, দেশের লোকের যে দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, একটী বিদেশীয় অবলা, বৃদ্ধ বয়সে এই দূরদেশে আসিয়া, সেই সকল মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

মেরী কার্পেণ্টারের বয়স সত্তর বৎসর হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তি কমিয়াছে বটে, হৃদয়ের উৎসাহ, উদ্যম কমে নাই। এই বৃদ্ধ বয়সেও অনেক প্রকার হিতকর কার্য্য করিবার কল্পনা করিতেছেন; এমন সময়ে তাঁহার শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল! যে পরহিতৈষী অবলার হৃদয় হইতে করুণাধারা নিস্থত হইয়া, শত সহস্র দুঃখী সন্তপ্ত দিগকে শান্তি বিতরণ করিতেছিল, ধীরে ধীরে মৃত্যু তাঁহাকে এ জগৎ হইতে লইয়া গেল। রোগ যন্ত্রণা বা মৃত্যুযন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই; মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। ১৪ই জুন নিয়মিত কাজ করিলেন; সন্ধ্যার সময় একজন বন্ধুর সহিত অনেক হিতকর বিষয় কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রিতে একটী প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়া নিদ্রা গেলেন; এই নিদ্রাই তাঁহার চিরনিদ্রা হইল; কুমারী কার্পেণ্টার চিরশান্তি লাভ করিলেন। তাঁহার পালিতা কন্যা শয়নালয়ে গিয়া দেখিল, কুমারী কার্পেণ্টারের প্রাণশূন্য দেহ শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। ১৯এ জুন করুণার প্রতিমূর্ত্তি,—এই পরহিতৈষী অবলার দেহ "আর্নোস্‌ভেল' নামক স্থানে সমাহিত হয়। যে সকল বালক বালিকাদিগকে তিনি সুশিক্ষিত ও সংসারের উপযুক্ত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহারা আজ মাতৃহারা হইয়া, শোক পরিচ্ছদ পরিয়া, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে সমাধিভূমিতে উপস্থিত হইল। ধনী দরিদ্র সকলেই আজ এই মহিলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন। মেরী কার্পেণ্টারের জীবন পরোপকার ব্রতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া, নিজের জীবন কেবল পরোপকারের জন্যই উৎসর্গ করিয়াছিলেন, নিজের সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। গরিব দিগকে দয়া বিতরণ করিয়া, দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়া, রোগীর সেবা করিয়া, সন্তপ্তকে সান্ত্বনা দিয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করিয়া, তিনি যে সুখ পাইতেন; অন্য সুখ তাঁহার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ। এদেশের লোক তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী, বিশেষতঃ এদেশের রমণীগণ কখনও তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না। নিস্বার্থভাবে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি জীবনের ব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার দ্বারা এত মঙ্গলকর কার্য্য হইতে পারিয়াছে। বড় বড় লোকে যাহা করিতে পারেন নাই, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া একটী অবলা তাহা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই লোকে বলে,—"সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।"

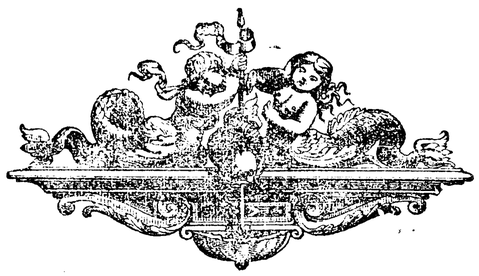

গণ্ডার।

মনুষের মধ্যে যেমন সভ্য ও অসভ্য আছে, জন্তুদিগের মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ থাকিবার সম্ভাবনা। শ্বেতাঙ্গেরা যেমন কৃষ্ণকায় দিগকে "কালা আদ্‌মি" বলিয়া উপহাস করে—অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করে, জন্তুদের মধ্যেও সেরূপ প্রথা আছে কিনা জানি না। কিন্তু কতকগুলি জন্তু দেখিতে একটু পরিষ্কার, একটু ভদ্র, একটু সভ্য বলিয়া বোধ হয়। আর কতকগুলি দেখিতে কদাকার ও অসভ্য এবং চলা ফেরাতে অভদ্র বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ আপনাদের বন্য-স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের দাসত্ব স্বীকার করে ও অল্প দিনেই অর্দ্ধসভ্য বলিয়া পরিচিত হয় কিন্তু কতকগুলি এমন গোঁয়ার যে কিছুতেই পোষ মানে না সুতরাং তাহারা চিরকালই জানোয়ার হইয়া থাকে।

গণ্ডার এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। ইহারা দেখিতে অতিশয় কদাকার এবং অত্যন্ত অসভ্যের ন্যায় বাস করে। আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে যেমন ধাঙ্গড় জন্তুদের মধ্যে সেইরূপ গণ্ডার। আমি যেখানে যেখানে গণ্ডার দেখিয়াছি সেইখানেই দেখিয়াছি যে, তাহারা পচাজল, নানারূপ আবর্জ্জনা ও কর্দ্দমের মধ্যে রহিয়াছে। সকল গায়ে কাদা লেপা, তাতেই তাদের মহা আনন্দ!! বোধ হয় আমাদের গায়ে চন্দন দিলেও আমরা এত খুসী হই না।

এইত গেল ইহাদের আচার ব্যবহার; আকৃতিও সেইরূপ। ছবিতে দেখিতে পাইবে শরীরখানা কেমন সুবৃহৎ! জন্তুদের মধ্যে যাহাদের সিং আছে তাহাদের সকলেরই মাথার উপর; যেমন গরু, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি। কিন্তু ইহাদের সিং নাকের উপর। দেখিতে কেমন সুশ্রী!! নাকের উপর যেন একটা দাঁত উঠিয়াছে। আমি ভাবি, গণ্ডার যদি কোন দিন আয়নায় মুখ দেখিতে পাইত তবে হয়ত লজ্জায় এতদিন গলায় দড়ী বেঁধে মরিত।

গণ্ডার যে অসভ্য তাহার একটী প্রমাণ এই যে, ইহাদের বাসস্থান অসভ্য এসিয়া ও আফ্রিকা-দেশে। সভ্য ইউরোপে গণ্ডার নাই। অতি প্রাচীনকালে রোম নগরে দুইবার গণ্ডার প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আধুনিক ইউরোপে গণ্ডার দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে পর্টুগালের রাজার জন্য একটী গণ্ডার প্রেরিত হয়; ইহা লইয়া ইউরোপে তখন মহা ধুম পড়িয়াছিল; নানাস্থানে ইহার চিত্র প্রেরিত হইয়াছিল এবং অনেকে নানারূপ হাস্যজনক বিবরণ লিখিয়াছিলেন। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে

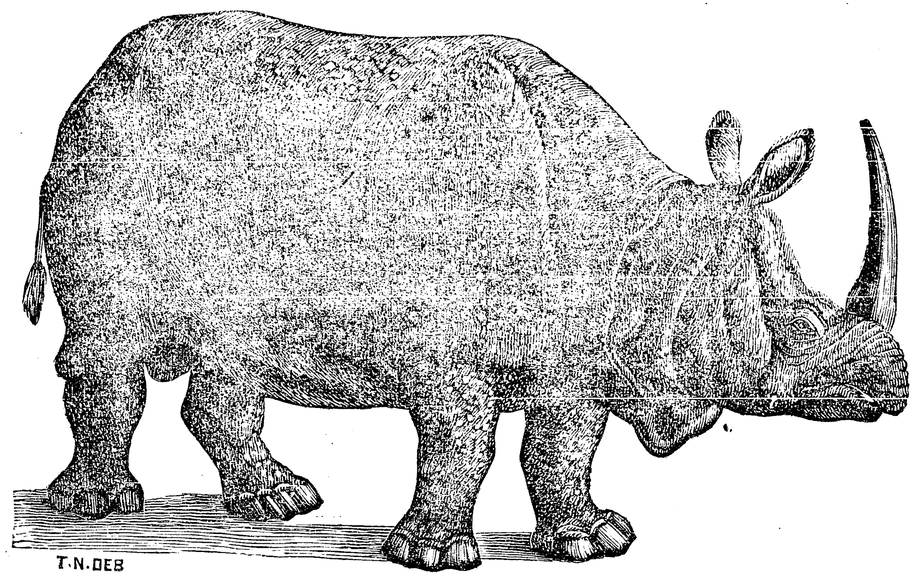

ইংলণ্ডে একটী গণ্ডার আনীত হয়; ইহার পর ১৭৩৯ ও ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে দুইটী গণ্ডার ইউরোপের অনেক স্থানে প্রদর্শিত হয়। ক্রমে দুই একটী করিয়া ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৭টী গণ্ডার ইউরোপে প্রেরিত হয়। এই সপ্তমটী জর্ম্মনির রাজার পশুশালার জন্য ক্রীত হইয়াছিল; কিন্তু লণ্ডন পর্য্যন্ত যাইয়াই ইনি লীলা সম্বরণ করেন। ইহার কিছুদিন পর আর একটী জর্ম্মনরাজের পশুশালার জন্য আনীত হয়। আজকাল ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক পশুশালায়ই গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিলাতে "রেজেণ্ট পার্ক" নামক স্থানে পাঁচ রকমের গণ্ডার আছে।

পৃথিবীতে মোট কত প্রকারের গণ্ডার আছে তাহার নিশ্চয় বিবরণ পাওয়া যায় না। এসিয়াতে চারি প্রকার এবং আফ্রিকায় চারি প্রকার দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন আফ্রিকায় পাঁচ রকমের গণ্ডার আছে। আফ্রিকার গণ্ডারের নাকের উপর দুইদুইটী সিং আছে। আগেরটী বড় এবং পাছেরটী ছোট; কিন্তু এক রকম গণ্ডারের দুইটী সিংই সমান উচু হয়। আফ্রিকাবাসী গণ্ডারের নাকের উপরিস্থিত সম্মুখের সিং ২০ ইঞ্চি হইতে ৪ফুট অর্থাৎ আড়াই হাতেরও উপর উচু হইয়া থাকে কিন্তু পাছেরটী ১০ হইতে ২০ ইঞ্চির অধিক কখন ও বড় হয় না।

আমরা ছেলেবেলা "শিশুশিক্ষা"য় পড়িয়াছি যে গণ্ডারের চামড়া এতদূর শক্ত যে বন্দুকের গোলা গুলিতে বিদ্ধ হয় না। কিন্তু জানিতে পারা গিয়াছে যে, সে কথা সত্য নহে। আফ্রিকা দেশে ইউরোপের ভ্রমণকারীরা অনেক গণ্ডার শীকার করিয়াছেন। হাড়গিলার ন্যায় একরকম পাখী আছে তাহাদিগকে, যেখানে গণ্ডার থাকে সেই খানেই দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই গণ্ডারের পৃষ্ঠের উপর চড়িয়া থাকে। এই জন্য এই পাখী দিগের নাম "গণ্ডার পাখী" হইয়াছে।

শীকারীরা এই পাখী দেখিয়াই অনেক সময়ে গণ্ডার শীকার করিবার সুবিধা পায়। বেকার সাহেব নামক একজন ভ্রমণকারী গণ্ডার শীকার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। একদিন তিনি এবং কয়েকজন আফ্রিকাবাসী শীকার করিতে গিয়াছিলেন। এক নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দেখিলেন দুইটী গণ্ডার মহাসুখে নিদ্রা যাইতেছে। সাহেব একাকী দুইটী বন্দুক হাতে করিয়া অগ্রসর হইলেন; সাহেব ৬০ হাত দূরে থাকিতেই হঠাৎ তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং একটা গণ্ডার তীব্রবেগে সাহেবকে আক্রমণ করিল। সাহেবও ক্ষিপ্রহস্তে গণ্ডারের গলদেশে বন্দুকের গুলি করিলেন। তখন গণ্ডারেরা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল; সাহেবও তাহার দলবল লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পাছে পাছে ছুটিলেন। একজন তরবারি দ্বারা একটা গণ্ডারের পশ্চাদ্দেশে আঘাত করিয়াছিল বটে কিন্তু অবশেষে গণ্ডার দুটী এমন নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিল যে, সেখানে যাওয়া তাদের সাধ্য হইল না। আর একদিন এই সাহেব শীকার করিতে যাইয়া গণ্ডারের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন।

এসিয়াতে চারি প্রকারের গণ্ডার আছে। ইহার মধ্যে দুই রকমের গণ্ডারের দুই দুইটী সিং আছে; এবং অন্য দুই রকমের কেবল মাত্র একটী সিং আছে। (ছবি দেখ) ইহার মধ্যে "ভারতীয় গণ্ডার" নামে এক রকমই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা আকৃতিতে ৪।৫ ফুটের অধিক কখনও উচু হয় না।

আর এক রকমের গণ্ডার আছে তাহাদের কাণের উপর বড় বড় লোম হয়। বিলাতে রেজেণ্ট পার্কে এইরূপ একটী গণ্ডার ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম হইতে নীত হইয়াছিল। এই গণ্ডারটী এক নদীতীরে কাদার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, এবং উঠিতে চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারে নাই। সেখানকার প্রায় ২০০ দুইশত লোক ইহার গলায় দুইগাছি দড়ী বাঁধিয়া টানিতে থাকে এবং অবশেষে অতি কষ্টে উঠাইয়া এক গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। পরদিন যখন লোকেরা দেখিল যে, গণ্ডার দেখিতে খুব সবল হইয়াছে এবং দড়ী ছিঁড়িয়া যাইতে পারে তখন তাহারা ভয়ে চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কাপ্তেন হুড্ আটটি হাতী সঙ্গে করিয়া সেখানে গমন করেন। এবং বহুকষ্টে গণ্ডারের পাছের পায়ে দড়ী বাঁধিয়া এবং চারিদিকে হাতীর পাহাড়া রাখিয়া চট্টগ্রামে আনয়ন করেন। এই গণ্ডারটীর নাম "বেগম"। ইহা বিলাতে ১২৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৬০০০ টাকায় বিক্রীত হয়। এখন ইহা অনেকটা শান্ত হইয়াছে এবং রেজেণ্ট পার্কে অবস্থিতি করিতেছে।

গণ্ডার সমস্তদিন আলস্যে কাটায়। প্রায়ই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে শুইয়া থাকে এবং নিদ্রা যায়। রাত্রিতে অনেক পথ চলিয়া থাকে। এবং পথের সম্মুখে যাহা পড়ে তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। গণ্ডার মাংস আহার করে না। ইহারা নিরামিষ ভোজন করে। ইহারা কোন "নিরামিষ ভোজন বিধায়িণী" সভার সভ্য আছে কিনা আমি জানিনা; তবে জন্তুদিগের মধ্যে এইরূপ কোন সভা হইলে ইহারা সভাপতি কিংবা সম্পাদক হইবার যোগ্য ইহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। হাতীরা এত বড় জানোয়ার হইলেও গণ্ডারকে ভয় করে। গণ্ডার হাতীর পেট চিরিতে বড় ভালবাসে, হাতীরা এজন্য

ইহাদিকে বড় ভয় করে। গণ্ডারের সিংএর নিকট হাতীর দাঁত পরাস্ত।

গণ্ডার হাতীর ন্যায় পোষ না মানিলেও বাঘের ন্যায় হিংস্র নহে; কিন্তু জন্তুর মধ্যে এমন গোঁয়ার আর একটী আছে বলিয়া বোধ হয় না।

অনাথা বালিকা।

১

শ্রাবণের আধাঁর রজনী;
অবিরল বরষার ধারা;
ঘন ঘন চমকে বিজলী
জন প্রাণী নাহি দেয় সাড়া।

২

ক্ষুদ্র এক কুটীরের মাঝে
মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিছে;
দেখ ওই বিছানার পাশে
বালিকাটী বসিয়ে রয়েছে।

৩

পরাণের সোদর তাহার
শুয়ে আজি মরণ শয্যায়!
ঔষধের কারণে জননী
অভাগিনী গিয়েছে কোথায়!

৪

"মা মা" বলে থেকে থেকে ভাই,
ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিছে
সযতনে ভগিনী কেমনে
আগুলিয়ে ভাইকে রেখেছে!

৫

অই শুন! আকাশ বিদারি
'কড়' 'কড়' ভয়ঙ্কর রবে,
বজ্রপাত হইল ধরায়
যেন আজি বিনাশিতে সবে।

৬

"মা! মা! ধর ধর" বলি ভাই
সশঙ্কিতে করিল চীৎকার
বুকে চেপে ধরিল ভগিনী
কিন্তু তারে রাখে সাধ্য কার?

৭

চলে গেছে চিরদিন তরে
আত্মা সেই ক্ষুদ্রদেহ ছাড়ি
জ্ঞান-হারা অবোধ বালিকা
মরা ভাই আছে বুকে ধরি।

৮

অভাগিণী জননী কোথায়?
ঔষধ লইয়ে তাড়াতাড়ি
সেই ঘোর নিশীথ সময়ে
পাগলিনী ফিরিছেন বাড়ী।

৯

ঘরে ফিরে কি দেখিবে সেথা
এই ভাবি আকুল নয়ান,
"এত দুঃখে হায় অন্তর্য্যামী!
কেন মোর রয়েছে পরাণ?"

১০

এই কথা বলিতে বলিতে
গৃহদ্বারে উঠিবে যেমনি
দুঃখিনীর দুঃখ বিনাশিতে
বজ্রপাত হইল তখনি।

১১

পরদিন প্রভাত বেলায়,
প্রতিবেশী সকলে আসিল;
গৃহদ্বারে দাঁড়ায়ে জননী
দেখি সবে বিস্ময় মানিল।

১২

বহুযত্নে—বহুক্ষণ পরে
বালিকার চেতন হইল।
কিন্তু তার জননী সোদর
এজনমে আর না জাগিল!

ভারতের অসভ্যজাতি।

(১০২ পৃষ্ঠার পর।)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ধাঙ্গড় জাতি রোথা হইতে এক দল ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করে আর এক দল রাজমহল পাহাড়ের দিকে যায়। যে দল রাজমহল পাহাড়ে গিয়া বাস করে তাহাদিগকেই "পাহাড়ী" বলে, এই পাহাড়ীদিগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

"পাহাড়ী" জাতি যদিও আজ কালি অনেকটা শান্ত ও সভ্য হইয়াছে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালে ইহারা অতিশয় কলহপ্রিয় এবং নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিল; এমন কি মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেও ইহাদিগের দৌরাত্মে নিকটবর্ত্তী প্রজাগণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। পরে জানিতে পারিবে যে, রাজমহল পাহাড়ের উপত্যকায় অনেক সাঁওতাল বাস করে, এই সকল সাঁওতাল এবং রাজমহল প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার এবং প্রজাগণ এই পাহাড়ীদিগকে আপদ বালাই মনে করিত—কখন আসিয়া মারিয়া ধরিয়া লুট পাট করিয়া লয় এই ভয়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইত। আজ কালি ইংরাজদিগের সুশাসনে বড় বড় জমিদারদিগের মধ্যে বড় একটা মারামারি, লাঠালাঠি দেখিতে পাওয়া যায় না—অবশ্য একেবারে যে নাই তা বলিতেছি না, তবে পূর্ব্বকালের মত আর নাই। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময় জমিদারদিগের মধ্যে প্রায়ই মারামারি কাটাকাটি হইত, ঐ সময় রাজমহল প্রদেশবাসী জমিদারগণ এই সকল পাহাড়ীদিগের দস্যুবৃত্তির সুবিধা লইয়া তাহাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত। পাহাড়ীরা ক্রমে এতই নির্ভীক এবং লুণ্ঠনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, ঐ সকল প্রদেশের পথে ঘাটে লোকজনের চলাফেরা প্রায় বন্ধ হইয়াছিল, কখন কখন তাহারা গভর্ণমেণ্টের ডাক হরকরাকেও মেরে ধরে ডাকের থলেটি লইয়া পলায়ন করিত। তাহাদিগকে সাজা দিবার নিমিত্ত কখন কখন দলে দলে পুলিস সৈন্য পাঠান হইত, কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিত না, কারণ গোলমাল হইতে দেখিলেই তাহারা পাহাড়ের উপর উঠিয়া এমন সকল দুর্গম জঙ্গলে লুকাইত যেখানে আর অপর লোকের প্রবেশের সাধ্য থাকিত না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন,—বলে যাহা হয় নাই কলে কৌশলে তাহা হইয়াছে। কিছুতেই আর যখন তাহারা জব্দ হয় না তখন গভর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগের দুজন সুচতুর কর্ম্মচারী এক দিন পাহাড়ীদিগের প্রধান প্রধান মণ্ডল এবং তাহাদের অধীনস্থ লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং বিদায় কালে তাহাদিগকে নানা প্রকার বস্ত্রাদি দিয়া বিদায় করেন। পাহাড়ীরা দেখিল এত বড় মজা, তাহারা ক্রমেই ঐ সৈনিক পুরুষদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে আরম্ভ করিল এবং তাঁহাদিগের সংব্যবহারগুণে এবং উপঢৌকণের লোভে ক্রমে

বশ হইয়া পড়িল। এখন পাহাড়ীরা আর সেরূপ দস্যু প্রকৃতি লুণ্ঠনপ্রিয় নাই, অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছে, চাস বাস করিতেছে। পাহাড়ীদিগের আকৃতি খাট, মোটা শরীর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহারা অত্যন্ত সাহসী। অন্য অন্য অসভ্য জাতির মত ইহাদিগের রং নিতান্ত কাল নয়, কিন্তু নাক, চোক, কপাল অনেকটা ধাঙ্গড় দিগের মত। পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী না হউক দেখিতে বেশ সুশ্রী। পুরুষেরা বাবুগিরী করিতে বড় ভাল বাসে, চুল গুলিকে সর্ব্বদাই আঁচড়ে খোঁপার মত ক'রে বেঁধে রাখে এবং প্রায় সদা সর্ব্বদাই এক খানি লাল কাপড়ের পাগড়ি বাঁধিয়া রাখে, অন্য পরিচ্ছদের মধ্যে এক খানি খাটধুতি কোমরে জড়ান থাকে। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অনেক ভাল। ইহারা সাদা থান কাপড়ের কোর্ত্তা পরে এবং তাহার উপর একখান রং চং তসরের কাপড় আসামী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় জড়াইয়া রাখে, দেখিতে মন্দ দেখায় না। অলঙ্কারের মধ্যে পলার কাঠমালা এবং ধাতু নির্ম্মিত আংটি পরে।

পাহাড়ীরা তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা; মল্লর, মাল এবং কুমার। প্রথমোক্ত শ্রেণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাদিগের মধ্যেই পাহাড়ীদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বভাব চরিত্রের চিহ্ন অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয়। ইহারা শেষোক্ত শ্রেণীদ্বয় অপেক্ষা গম্ভীর প্রকৃতি এবং অপেক্ষাকৃত কম আমোদপ্রিয়, আহারাদি সম্বন্ধেও ইহারা অনেকটা হিন্দু দিগের মত বাছিয়া গুছিয়া খায়; গো মাংস একেবারেই খায় না এবং আপন শ্রেণী ভিন্ন অন্যের রাঁধা দ্রব্যও খায় না। ভুট্টা, মাকাই, সিম প্রভৃতিই পাহাড়ীদিগের প্রধান খাদ্য। পাহাড়ের ঢালু জমিতে এই সকল শস্য উৎপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন আর আর আবশ্যকীয় বস্তুই ইহাদিগকে স্থানান্তর হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাদিগের কিন্তু পয়সা কড়ি নাই, বাঁস, কাট, ঘাস পাহাড়ে যথেষ্ট জন্মে, পাহাড়ীরা এই সকল বাঁস, কাট কাটিয়া লইয়া পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের বাজারে যায়, এবং সেখান হইতে ঐ সকল বাঁস এবং কাঠের বিনিময়ে লবণ, তেল, কাপড় প্রভৃতি লইয়া আসে। চাস বাসের ভার স্ত্রীলোকদিগের উপরই। চাসের প্রণালীও অতি সামান্য, একখানি খুন্তি দ্বারা পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহাতেই বীজ বপন করা হয়। পুরুষেরা যে স্ত্রীলোকদিগের উপরে চাস বাসের ভার দিয়া মজা করিয়া বসিয়া থাকে তা নয়। তাহারাও জাতীয় রীতি এবং আপন আপন সংস্কার অনুসারে যথেষ্ট পরিশ্রম করে। একটী হরিণ কিম্বা ময়ুর শীকার করিবার নিমিত্ত এমন পরিশ্রম বা কষ্ট নাই যা তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়; একটি মৌমাছির চাকের অনুসন্ধানে চারি পাঁচ ক্রোশ অনায়াসে হাঁটিয়া বেড়ায়; তাহাদিগের গৃহের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য নিজহাতে প্রস্তুত করে; কাঠ, কয়লা, বাঁস, তুলা প্রভৃতি দ্রব্য সকল মাথায় করিয়া বাজারে যায়, এবং আরও কত পরিশ্রম করে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাস করিতে হইলেই পুরুষ পাহাড়ীদিগের মহা মুস্কিল হয়, একাজটি আর তাদের দ্বারা হ'বার যো নাই; কাযে কাযেই স্ত্রীলোকদিগকে করিতে হয়।

পাহাড়ীদের গ্রামগুলি ধাঙ্গড়দের মত অপরিষ্কার নয়, প্রায় প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকেই চাস বাসের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও

পাহাড়ীরা নিজে অপরিষ্কার, কিন্তু ইহাদিগের বাড়ী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ধাঙ্গড়দের মত দুর্গন্ধময় নয়। ঘরগুলি বাঁসের বেড়ার, কাদার দেয়াল প্রায়ই নাই; ধাঙ্গড়দের মত ইহাদিগের গরু, ভেড়া, মুরগি, মানুষ সব এক ঘরে থাকে না, গৃহপালিত পশু পক্ষী এবং আহারীয় শস্যাদির ঘর স্বতন্ত্র। ধাঙ্গড়দিগের মত পাহাড়ীদেরও অবিবাহিত যুবকেরা গ্রামের এক খানি নির্দ্দিষ্ট ঘরে রাত্রি বাস করে; কিন্তু যুবক যুবতীরা অন্য সময় বেশ মুক্তভাবে মিশিয়া থাকে এবং যদিও পরস্পর সদা সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে সময় কাটায় তথাপি ইহাদিগের মধ্যে কোন অন্যায় ব্যবহার দেখা যায় না। পাহাড়ীদিগের বিবাহ প্রণালী অতি সহজ; যুবক যুবতীর পরস্পর বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইলে, যদি অন্য কোন আপত্তি উপস্থিত না হয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের পর বর ও কন্যা উভয় পক্ষের লোকই বরকে একটী আশ্চর্য্য রকম অনুরোধ করে; তাহার মর্ম্ম এই যে, বর যেন কন্যাকে হত্যা না করেন। বহুবিবাহ এবং বিধবা বিবাহ পাহাড়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে, এক ভাইয়ের মৃত্যু হইলে অপর ভাই মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীগণকে বিবাহ করিতে পারে।

ধাঙ্গড়দিগের মত পাহাড়ীরা শব দাহ করে না—পুতিয়া ফেলে। ধাঙ্গড়দিগের মত পাহাড়ীরাও এক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, ইহাদিগের প্রত্যেক পল্লিতে এক একটি করিয়া গ্রাম্য দেবতা আছে, সেই সকল গ্রাম্য দেবতাগণকে তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত ইহারা সময় সময় পূজাদি করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস যে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর এই পৃথিবী শাসন করিবার নিমিত্ত প্রথমে সাতজন মানুষ সৃষ্টি করেন এবং ইহারা তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের বংশধর। যদি তোমরা কখন পাহাড়ীদিগের গ্রামে যাও তাহা হইলে দেখিবে যে, প্রত্যেক ঘরের বাহিরে এক একখানি লম্বা বাঁস পোতা; ইহার অর্থ এই যে, এই বাঁস পোতা থাকিলে ভূত প্রেতের কুদৃষ্টি তাহাদিগের উপর পড়িবে না। হাজার অসভ্য হউক, নিষ্ঠুর হউক, আর দুর্দ্দান্ত হউক, পাহাড়ীদিগের একটী মহৎ গুণ আছে; ইহারা প্রায়ই মিথ্যাকথা বলে না। কোন বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইতে হইলে ইহারা তীর ছুঁইয়া সপথ করে যে সকলেই সত্য কথা কহিবে।

পাদ্রি সাহেবেরা অসভ্য জাতিদিগকে যেমন শিক্ষা দিতেছেন পাহাড়ীদিগকেও সেইরূপ দিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই জাতির মধ্যেও অত্যন্ত মাতলামি ঢুকিয়াছে, আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা যখন এই জাতিকে উন্নত করিয়াছেন, আর যেন ইহাদিগের অবনতির পথ পরিষ্কার করিয়া না দেন।

ক্রমশঃ

যেমন রোগ তেমনি ব্যবস্থা।

নন্দদুলাল মাথায় রুমাল বাঁধিয়া, তাকিয়া ঠেসান দিয়া, মাথায় হাত দিয়া, বসিয়া পড়িয়াছেন। বড় মাথা ধরিয়াছে। সম্মুখে বই পড়িয়া রহিয়াছে; ওদিকে

দশটাও বাজিয়া গেল;—ইস্কুলে যাবারও সময় যায়। কিন্তু এমনি মাথা ধরিয়াছে যে মাথা আর তুলিতে পারিতেছেন না। নন্দদুলালের মা আসিয়া দেখেন, নন্দদুলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বুঝি তাঁর নন্দদুলাল ইস্কুলে গিয়াছে। নন্দদুলালকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা নন্দদুলাল, আজও কি তোমার মাথা ধরিয়াছে?" এইখানে বলিয়া রাখি, আমাদের নন্দদুলালের এ রোগ নূতন নহে। কি যে হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে অনেক দিন হইতেই এ রোগ তাঁহাকে ধরিয়াছে; প্রায়ই নটা দশটার সময় তাঁর মাথা ধরে, দু তিন ঘণ্টা এমনি মাথা ধরা থাকে, যে নন্দদুলাল আর মাথা তুলিতে পারেন না। নন্দদুলাল মা বাপের বড় আদরের ছেলে; মা বলিলেন, "থাক্ বাবা, তবে আর তোমার আজ ইস্কুলে গিয়া কাজ নাই, কি যে হ'ল, কেন আমার নন্দদুলালকে এমন রোগে ধরিল; আজই আমি ডাক্তার আনাইয়া, যাহা হয় এর একটা ব্যবস্থা করিব।" নন্দদুলাল বই লইয়া, মার সঙ্গে গিয়া ঘরে শুইলেন। ডাক্তারের বাড়ী খবর গেল, এদিকে নন্দদুলালের মাথা ক্রমে ছাড়িয়া গেল,—দু তিন ঘণ্টার বেশী মাথা ধরা থাকিত না। এমন সময় ডাক্তার আসিলেন। ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, নন্দদুলাল আর শুইয়া নাই; উঠিয়া এদিক ওদিক করিতেছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া নন্দদুলালের মুখ—কেন জানি না একটু বিমর্ষ হইল। যাহাই হ'ক ডাক্তার আসিবামাত্র নন্দদুলালের মা, বাপ, ভারি ব্যস্ততার সহিত, নন্দদুলালের এই উৎকট ব্যারামের কথা বলিলেন। তাঁহাদিগকে ভারি চিন্তিত দেখিয়া, ডাক্তারও একটু চিন্তিত হইলেন। এবং ব্যারামের আদ্যোপান্ত বিবরণ মনোযোগের সহিত শুনিয়া, ডাক্তার নন্দদুলালকে কাছে

ডাকিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষা করিয়া সুচতুর ডাক্তার সমুদায় বুঝিতে পারিলেন। সে দিন কিছু না বলিয়া, নন্দদুলাল যে ইস্কুলে পড়িতেন, ডাক্তার সেই ইস্কুলে একটু অনুসন্ধান লইলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, যে নন্দদুলাল, ক্লাসে কিছুই করে না, পড়া শুনাতে একেবারেই মন নাই, প্রতিদিনই পড়া শুনার জন্য শাস্তি পায়। ডাক্তার বুঝিলেন রোগ কি? তখন যেমন রোগ তেমনি ব্যবস্থা হইল। ইস্কুলের ভয়ে যে তার মাথা ধরে, তাহা নন্দদুলালের মা বাপ এতদিন বুঝিতে পারেন নাই। ডাক্তার পর দিন যাইয়া ব্যবস্থা করিলেন,—যখন মাথা ধরিবে, তখন আদ ঘণ্টা অন্তর পাঁচ বেত। নন্দদুলালের মুখ শুকাইয়া গেল; এতদিন মা বাপকে ফাঁকি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ডাক্তারকে আর ফাকি দিতে পারিলেন না। যাই হ'ক, শুনিয়াছি, তার পরদিন থেকে আর একদিনের জন্যও নন্দদুলালের মাথা ধরে নাই। ব্যবস্থা শুনিয়াই রোগ পলাইয়াছে। আমরা জানি না নন্দদুলালের মত রোগ আমাদের কোন পাঠক পাঠিকার আছে কি না; যদি থাকে তবে যেন এ কথা মনে থাকে;—যে যেমন রোগ তার তেমন ব্যবস্থাও আছে।

কোহিনুর।

লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা। মানুষের কত আয়াস, চিরদিন লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া রাখিবে! কিন্তু লক্ষ্মী কাহারও ঘরে চিরদিন বাঁধা থাকেন না। আজ যাহার লক্ষ্মী-শ্রী আছে, কাল হয়ত দেখিবে সে লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গিয়াছে। এমনিতর চিরদিন প্রায় কাহারও সমান যায় না। কিন্তু সে কথা থাক্; আমরা কোহিনুরের কথা বলিতেছি। কোহিনুরও লক্ষ্মীর ন্যায় বড় চঞ্চল; পৃথিবীর কত বড় বড় রাজারা, শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও, এই কোহিনুরকে কেহ চিরদিন বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না। আমরা দেখিয়াছি, পৃথিবীতে যে রাজার ক্ষমতা যখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে, কোহিনুর তখনই তাঁহার আশ্রয় লইয়াছে। চিরদিন কাহারও হাতে ইহা থাকে নাই, এবং বোধ হয় থাকিবেও না। ভারতবর্ষ রত্নগর্ভা নামে খ্যাত; কিন্তু ভারতভূমির সমুদায় রত্নের মধ্যে, এই কোহিনুর নামক হীরক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। খৃষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে, এই অপূর্ব্ব হীরক মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্পত্তি ছিল, বিক্রমাদিত্যের তখন অতুল প্রভাব। তারপর যখন দিল্লীর সম্রাটগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন, তখন—খৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কোহিনুর তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। এই হীরকের ওজন এই সময় ১৬ তোলা ছিল। সম্রাট সাজাহান একজন ভিনিসীয় রত্নকারকে কোহিনুর পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল করিবার ভার দেন; রত্নকার চাঁচিতে চাঁচিতে রত্নটিকে এত হাল্কা করিয়া ফেলে যে, কোহিনুরের ওজন একেবারে ৪॥ তোলা হইয়া যায়। সাজাহান রত্নকারের যথেষ্ট দণ্ড করেন, কিন্তু সে যে ক্ষতি করিয়াছিল তাহার আর পূরণ হইল না। সাজাহানের মৃত্যুর পর দিল্লীর সম্রাটগণের হস্তেই কোহিনুর থাকে; কিন্তু নাদির সাহের নিকট, যখন মহম্মদ সাহ পরাজিত হইলেন, এবং মোগল সম্রাটগণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল, তখন কোহিনুর আবার নাদীর সাহের আশ্রয় হইল। নাদীর সাহ এই রত্নটিকে কোহিনুর নাম দেন; কোহিনুর অর্থে—জ্যোতির

পর্ব্বত। নাদীরের মৃত্যুর পর কোহিনুর কাবুল অধিপতি আমেদ খার হস্তগত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত কাবুলের আমিরগণের ক্ষমতা প্রবল ছিল, কোহিনুর ততদিন তাঁহাদিগেরই হস্তে থাকে। পরে যখন সা সুজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, কাবুল পরিত্যাগ করিয়া, ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন তাঁহার সহিত কোহিনুর আর একবার ভারতে ফিরিয়া আসিল। সা সুজা এক প্রকার বন্দীভাবে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রণজিতের তখন প্রবল প্রতাপ। কোহিনুর নিঃস্ব সা সুজার হস্তে আর কেমন করিয়া থাকিবে?—যিনি তখন মহা প্রতাপশালী, তাঁহারই আশ্রয় লইল—কোহিনুর রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইল। রণজিৎ কোহিনুর পাইয়া, কাবুলপতি সা সুজাকে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং এই মহারত্ন লাভ উপলক্ষে রাজ্য মধ্যে এক মহোৎসব করিলেন। রণজিতের মৃত্যুর পর, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তে কোহিনুর থাকে। কিন্তু কোহিনুর চিরদিন কাহারও হস্তে থাকিবার নয়। ভারতে ইংরাজের প্রতাপ বিস্তারিত হইতে লাগিল; ভারত ইংরাজের পদানত হইল। ইংরাজের নিকট রণজিতের বংশধর পরাস্ত হইলেন; পাঞ্জাব হতবল হইল—অপ্রাপ্ত বয়স্ক দলীপ সিংহের অন্যান্য ধন সম্পত্তির সহিত কোহিনুর ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণে অর্পিত হইল। কিন্তু যিনি যখন মহাপ্রতাপশালী, কোহিনুর তখন তাঁহারই। ইংরাজ এখন মহাপ্রতাপশালী, সুতরাং কোহিনুর আর কতদিন রণজিতের হতভাগ্য বংশধর দলীপের হস্তে থাকিবে? লর্ড ডালহৌসী কোহিনুর মহারাণীকে উপঢৌকন দিতে মনস্থ করিলেন। দুইজন ইংরেজ কর্ম্মচারী এই মহারত্নের ভার লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন,—কোহিনুর ভারত পরিত্যাগ করিয়া গেল। ১৮৫০ সালের ৩রা জুন মহারাণীকে এই অত্যুজ্জ্বল মহারত্ন উপঢৌকন দেওয়া হয়। পূর্ব্বে কোহিনুর দেখিতে একটি অর্দ্ধ ডিম্ববৎ ছিল; এখন একটী আদ্‌ফোটা গোলাপের ন্যায় হইয়াছে; এখনও ইহার ওজন চারি তোলার কম হইবে না। ভারত হতবল হইয়াছে; আজ ৩৭ বৎসর কোহিনুর ভারত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—ভারত হতশ্রী হইয়াছে; আর কি কোহিনুর কখনও ভারতে ফিরিয়া আসিবে?

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। বিছানা।

নূতন।

তিনবর্ণে নাম, চিরদুঃখী আমি
বিদিত ভুবন মাঝে,
শির না কাটিলে পারিনা কখনো
রত হ'তে কোন কাজে।
পদশূন্য হয়ে আছি আমি সদা
পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে,
কটী মম আছে সলিল মাঝারে
জান কি এহেন জনে?
আছে মোর কত দুর্ব্বল সন্তান
অকৃতজ্ঞ নরাধম,
মাঝখান রেখে করে চিরকাল
শরীর ভক্ষণ মম।

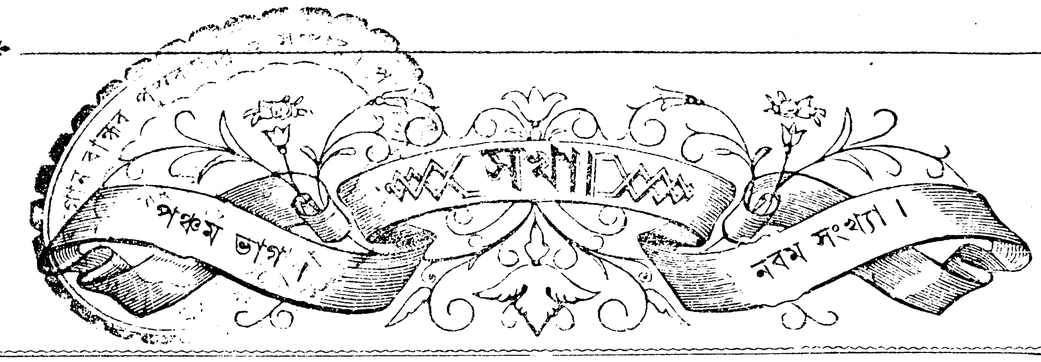

সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭।

ফুলের সাজি।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজদণ্ড।

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

—:—

গরবাসীগণ মনোরমার অদৃষ্টে কখন কি হয় তাহারই জন্য যেন উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতে ছিল। যাহারা তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাহাদের হৃদয়ে এক বিষম শঙ্কা উপস্থিত হইল, পাছে মনোরমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। কারণ সে সময়ে সামান্য চুরী অপরাধেও লোকের প্রাণ দণ্ড হইবার নিয়ম ছিল। মনোরমা নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণ হয় রাজার নিজেরও এই মনোগত অভিলাষ। সেই জন্য তিনি বিচারের সমস্ত কাগজপত্র বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্য্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বিচারকের সহিত নানাপ্রকার পরামর্শ করিলেন, কিন্তু কোন মতে মনোরমার নির্দ্দোষের প্রমাণের সুযোগ পাইলেন না। আর যে কেহ এ কার্য্য করিয়াছে তাহা বোধ হইল না।

রাজমহিষী, রাজকুমারী হেমলতা, মনোরমার প্রাণ রক্ষার জন্য অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাজ সমীপে আবেদন করিলেন। ওদিকে বৃদ্ধ দীননাথ কারাগারে বসিয়া ভগবানের নিকট ঐকান্তিক অন্তরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেন মনোরমার সাধুতার প্রমাণ হয়, "হা হরি! কি করিলে, কি কারণে বালিকাকে এ বিষম পরীক্ষা করিতেছ? হরি! তুমিত জান মনোরমার কোন দোষ নাই—দেখ যেন তাহার অকারণে প্রাণদণ্ড না হয়।" এক এক বার যখন দীননাথ মনোরমার প্রাণ দণ্ডের কথা চিন্তা করে তখন তাহার ধমনী দিয়া রক্ত প্রবাহ বেগে ছুটিতে থাকে। আবার কতক্ষণ পরে যখন মন স্থির হয় তখন ভাবে, না, না, পরম ন্যায়বান হরি কি এরূপ অকারণে বালিকার প্রাণ দণ্ড করাইবেন। অবশ্য আমাদের বিশেষ কোন অপরাধ ছিল তাহার জন্য এই মনোকষ্ট ও যাতনা ভোগ করিতেছি। কিন্তু কাহারও দ্রব্য গ্রহণ দূরে থাকুক আমরা কখন পরদ্রব্যে লোভ পর্য্যন্ত করি নাই। ভগবান তোমার মনে যাহা আছে তাহাই হউক।

মনোরমা সেই কারাগৃহে; সে কখন ক্রন্দন করিতেছে, কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। কখন একটু শব্দ শুনিয়াই চমকিয় উঠিতেছে; সকল সময়েই মনে আশঙ্কা, এখনি প্রহরী আসিয়া আমায় বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবে। নিজে এই

শোচনীয় দশায় পড়িয়া মনোরমা পিতার চিন্তায় সর্ব্বদা আকুল। আমার প্রাণদণ্ড হইলে বৃদ্ধ পিতার কি দশা হইবে এই চিন্তায় সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

এক দিন মায়া কোথায় যাইতে যাইতে সম্মুখে জল্লাদকে বধ্যভূমি পরিষ্কার করিতে দেখিতে পাইল। জল্লাদকে বধ্যভূমিতে দেখিয়া মায়ার মনে মনোরমা সংক্রান্ত আমূল বৃত্তান্ত উদয় হইল। তৎক্ষণাৎ যেন তাহার মনে শত বৃশ্চিক এক কালে দংশন করিল—সে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া মনোরমার মৃত্যু আনয়ন করিতেছে তাহা সে বেশ বুঝিল। এই চিন্তায় মায়ার মুখ ম্লান ও হাস্য-বিহীন হইল—সে দিন সে আহার করিতে বসিল মাত্র, আহার করিতে পারিল না। রাজ অন্তঃপুরস্থ অন্য দাসদাসী মায়ার মনের এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল, কিন্তু ইহার কারণ জানিতে সমর্থ হইল না—অন্তর্য্যামী ভগবান ভিন্ন জীবের হৃদয়ের ভাব আর কে বুঝিবে? সে রাত্রিতে মায়ার নিদ্রা হইল না, শয্যা যেন বিষ—একবার মাত্র একটু তন্দ্রা আসিল, তন্দ্রার সময়ে মায়া স্বপ্ন দেখিল মনোরমার রক্তাক্ত ছিন্ন মস্তক তাহার কাছে পড়িয়া রহিয়াছে, মনোরমার রক্তে আপনার হস্ত ভিজিয়া গিয়াছে। আতঙ্কে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, জাগিয়া দেখে ঘোর অন্ধকার। আর নিদ্রা হইল না। মায়ার এই ঘোর যাতনা হইল বটে, কিন্তু তাহার এত সাহস হইল না যে বিচারকের কাছে আত্মদোষ বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে অনেক কষ্টে মনকে একরূপ বুঝাইয়া রাখিল।

পরিশেষে বিচারপতি তাঁহার বিচারের মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মন্তব্যের মর্ম্ম এই—যে মনোরমা ভিন্ন অন্য কেহ আংটী লইতে পারে না এটী প্রকৃত কথা। মনোরমা একে চৌর্য্য দোষে দোষী, তাহাতে অপরাধ স্বীকার না করাতে সে যথার্থ প্রাণদণ্ডের যোগ্য। কিন্তু তাহার বয়স অতি কম এবং এতাবৎ কাল সকলেই তাহার চরিত্রের সুখ্যাতি করিত বলিয়া প্রাণ দণ্ড না হইয়া তাহাকে কারাগারে জন্মের মত আবদ্ধ করা হইবে। তাহার পিতা বৃদ্ধ দীননাথ এই চৌর্য্যকার্য্যে লিপ্ত বলিয়া বোধ হওয়াতে তাহাকেও জন্মভূমি হইতে চিরদিনের মত বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার সমুদয় সম্পত্তি রাজভাণ্ডারসাৎ হইবে। রাজা বিচারপতিকে বলিয়া দণ্ডাজ্ঞার এই পরিবর্ত্তন করিলেন যে, মনোরমাও দীননাথের সহিত জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইবে। কিন্তু বিচার পতির অন্যান্য দণ্ডাজ্ঞা সমান রহিল।

আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, দুই দিনের শেষে যদি কেহ মনোরমা ও তাহার পিতাকে প্রসাদপুরের মধ্যে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের প্রাণ দণ্ড হইবে।

নগরময় দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। পরদিন যখন প্রভাতে মনোরমা ও তাহার পশ্চাতে তাহার হস্ত ধরিয়া বৃদ্ধ দীননাথ নগর হইতে বাহির হইল তখন তাহাদের পূর্ব্ব পরিচিত অনেক লোক তাহাদিগকে দেখিতে আসিল, অনেকে তাহাদের দুঃখের দশা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল, অনেকে মনোরমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল। দীননাথ ও মনোরমা সকলের সহিত যথাযোগ্য কথাবার্ত্তা প্রণামাদি করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তাহারা অল্পদূর না যাইতে যাইতে মায়া তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমার নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া মায়ার পূর্ব্বের অনুতাপ সম্পূর্ণ দূর হইয়া আবার তাহার মনোরমার প্রতি পূর্ব্বের মত ভাব

হইয়াছিল। সুতরাং মনোরমার নির্ব্বাসন তাহার আহ্লাদেরই বিষয় হইল। রাজকন্যার ভালবাসা ও অনুগ্রহ পাত্রী আপনি হইব এই তাহার ইচ্ছা। মনোরমা সে স্থান লইতেছিল বলিয়া তাহার প্রতি তাহার ঈর্ষা জন্মিয়াছিল। আর মনোরমা তাহার কণ্টক হইতে পারিবে না এই তাহার মহা আনন্দ। বাস্তবিক সে মনোরমাকে যে নষ্ট করিতেই চাহে তাহা নহে।

রাজকুমারী হেমলতা যখন মনোরমার বিচার হইতেছিল তখন এক দিন মায়াকে মনোরমাদত্ত সাজিটী তাঁহার ঘর হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে কহিয়াছিলেন। ঐ সাজি দেখিলেই হেমলতার মনোরমার কথা মনে হইয়া অন্তরে বড় ক্লেশ হইত বলিয়া ঐরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন। মায়া মনে করিল রাজকুমারী মনোরমা দত্ত সাজি গ্রহণ করিবেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যখন মনোরমা ও তাহার পিতা নগর হইতে বাহির হইতেছিল তখন মায়া তাহাদের কাছে উপস্থিত হইল। তাহার হাতে সেই সাজি, মায়া বলিল, "মনোরমা এই সেই তোর সাজি, রাজকুমারী চোরের উপহার লন না" এই বলিয়া মায়া সাজি মনোমার চরণ তলে ফেলিয়া ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে সাজি লইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। মনে করিল সাজি, তোমারই জন্য আমাদের এই দশা! সত্যইত রাজকুমারী গরিবের দত্ত সাজি লইবেন কেন?

দীননাথের হাতের লাঠিগাছটীও রাজ পুরুষেরা লইয়াছেন এই সাজিটী মাত্র তাহাদের পার্থিব সম্বল।

যতক্ষণ দেখা যায় মনোরমা চলিতে চলিতে প্রসাদপুরের দিকে চাহিতে লাগিল—হায় এত সাধের বাড়ী, এত যত্নের বাগান আজ কোথায় রহিল। ক্রমে ক্রমে প্রসাদপুর তাহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। এবং একটী অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ দীননাথ আর চলিতে পারিল না, শোকে ও পরিশ্রমে তাহার চলিবার শক্তি রোধ হইল। মনোরমা পিতাকে ধরিয়া একটী প্রাচীন বট বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসাইল।

দীননাথ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া কতক শান্ত হইয়া কন্যাকে কহিল, মনোরমে এস সর্ব্বাগ্রে আমরা ভগবানের চরণ বন্দনা করি। তিনি কৃপা করিয়া আজ আমাদের প্রাণ রক্ষা করিলেন, ধন্য তাঁহার কৃপা! বৃদ্ধ হাত যোড় করিয়া আনন্দ অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে কহিল, "হরি! তুমি বৃদ্ধের একমাত্র সম্বল, তোমার কৃপায় আবার আমরা স্বাধীন ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, তোমার কৃপাবলে আজ আবার মনোরমাকে লাভ করিয়াছি।"

"হরি! তুমি দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, ভগবান! যাহারা দুঃখে পড়িয়া তোমায় ডাকে, তুমি তাহাদের দুঃখ মোচন কর, তুমি অভয়দাতা পিতা, তুমিই স্নেহময়ী মাতা, তুমিই বিপদের কাণ্ডারী, যখন বিপদে পড়িয়া আমরা তোমায় মা, মা, বলিয়া ডাকি, তখন তুমি হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান কর। মা, আমরা নিরাশ্রয় সম্বলহীন, তুমি মাত্র আমাদের ভরসা। আজ তুমি আমাদের জন্য কোন উপায় বিধান কর। তুমি সহায় হইয়া আমাদিগকে দেশান্তরে লইয়া যাও" বলিতে বলিতে দীননাথের শ্বেতশ্মশ্রু বহিয়া অবিরল ধারে চক্ষের জল পতিত হইতে লাগিল। গণ্ডস্থল দিয়া আনন্দ ধারা ও প্রেম ধারা বহিয়া মনোরমার বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। আজ পিতা ও কন্যার হৃদয়ে একই ভাবের—একই ভক্তির, একই প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। ধরাতলে ইহাই স্বর্গ শোভা।

ক্রমশঃ।

প্রতিশোধ।

(গল্প।)

একদিন ছিল যখন এদেশে কেহ মদ খাইত না। প্রাচীনকালে সুরাপান মহা পাপ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। ইংরেজ বাহাদুরের কৃপায় মদ খাওয়াটা আজকাল জল খাওয়ার মত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্গোৎসব আসিতেছে এখন কত অর্থ এই মহা অনর্থের জন্য নষ্ট হইবে কে জানে? পূজার মধ্যে মদ একটা অতি আবশ্যকীয় জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সব না হইলে চলে কিন্তু মদ না হইলে চলে না। হয়ত ছেলে মেয়েরা পরিবার কাপড় পায় না, ডাক্তার ও ঔষধ বিনা রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে কিন্তু কর্ত্তার মদ না খাইলেই নয়। আমরা এমন কথাও শুনিয়াছি যে, ঘরের গহনা বিক্রী করিয়াও মাতালের উদর পূর্ণ হইয়া থাকে।

বাড়ীর কর্ত্তারাই যে কেবল এই বিষ পান করেন তাহা নহে। তাহাদের দৃষ্টান্তে অল্পবয়স্ক বালকদিগের মধ্যেও এপ্রথা চলিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে মদের এমনই প্রাদুর্ভাব বাড়িয়াছে যে, ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। মদ খাওয়াটা "ফ্যাসন" হইয়া উঠিয়াছে। মদ না খাইলে ভদ্রলোকের সভায় যাওয়াই মুস্কিল। দেখাদেখি ছেলে বাবুরাও এখন ছোট খাট রকমের "মদের বৈঠক" করেন। কলিকাতায় দুটি ছোকরা বাবু নাকি পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন। আমরা জানি মফস্বলের জেলায় এবং গ্রামেও এরূপ অনেক স্কুলের ছেলে আছেন। আমরা আশা করি আমাদের "সখা"র পাঠকপাঠিকারা কখনও এরূপ দোষে লিপ্ত হইবেন না; কিন্তু পাছে হতভাগ্য লোকদিগের সংসর্গে মিশিয়া কেহ কোন দিন এই নীতি-বাক্যটী ভুলিয়া যান এই ভয়ে আমরা একটী গল্প বলিতেছি।

আরম্ভ।

প্রায় পোনর বছরের কথা; তখন কলিকাতায় স্কুল কালেজের বাজার এত সস্তা ছিল না। গভর্ণমেণ্ট এবং মিশনরি সাহেবেরা দুএকটী স্কুল কালেজ করিয়াছিলেন। লোকেও তখন বড় ইংরেজী শিখিতে চাহিত না। যাহারা একটু বেশী সাংসারিক, টাকাকড়ির প্রতি একটু বেশী মনোযোগী তাহারা টাকার লোভে, কেহ কেহ বা বিদ্যার লোভেও ছেলেদিগকে ইংরেজী পড়াইতেন। কিন্তু একটা কথা, তাহার মধ্যে অনেকেই ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মদ এবং মুরগী খাওয়াটা বিশেষ রূপে শিক্ষা করিতেন। এই সময়ে কলিকাতার কোন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে দুইটী বন্ধু পড়িতেন। একটীর নাম শ্যামলাল এবং অন্যটীর নাম কানাই। ইহাদের দুজনারই অবস্থা বেশ ভাল। শ্যামলালের বাবা এবং কানাইর দাদা দুজনেই সাহেব সওদাগরদের হাউসের বড় চাকুরে ছিলেন। কর্ত্তাদের মধ্যেও যেমন সদ্ভাব ছিল ছেলেদের মধ্যেও তেমনি ভাব ছিল। কর্ত্তারা এক বৈঠকের লোক ছিলেন; একসঙ্গে মদ মাংসটা চলিত। অনেক টাকা পাইতেন বটে, কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ের জন্য কিছুই বাঁচাইতে পারিতেন না। প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পরই মজ্‌লিস হইত; কিন্তু শনিবার রাত্রিতেই আড্ডাটা ভালরূপ জম্‌কাইত। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া শ্যামলাল ও কানাই যে শিক্ষা পাইয়াছেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহারাও কর্ত্তাদের মত আপনাদের বন্ধু বান্ধব লইয়া শনিবার দিন সন্ধ্যার পর ছোটখাট মজ্‌লিস করিতেন। তাহাতে মদ খাওয়া এবং অশ্লীল সংগীত প্রভৃতির আলোচনা হইত।

কয়েকদিন হইল শ্যামলালের বিবাহ হইয়াছে। তাহার বন্ধুরা তাহাকে এক দিন একটা ভোজ দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্যামলালেরও অসম্মতি নাই; ক্লাসের ছেলেদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। আজ কানাই বাবুই এ সভায় সভাপতি। তাহার বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণ; তিনিই সকল যোগাড় করিতেছেন। অবশ্য এ মহাব্যাপারে মদের ত্রুটী হয় নাই। সে যাহা হউক কানাইর আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদের ক্লাসে একটা হতভাগা ছেলে ছিল সে মদ খাইত না; তাহাকে আজ দলে ভর্ত্তি করিতে হইবে। সে গরিবের ছেলে; পড়াশুনা ভাল করিত এজন্য একটী সদাশয় লোক তাহাকে স্কুলের মাইনা, বইর দাম এবং সময়ে সময়ে আন্যান্য সাহায্যও করিতেন। ছেলেটীর নাম সুরেশ; বয়স ১৪ বৎসর। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে কানাই এবং শ্যামলালই ক্লাসের মধ্যে বড়লোকের ছেলে ছিল এবং গায়েও খুব বল ছিল সুতরাং সকলেই তাহাদিগকে ভয় করিত। তাহারাই ক্লাসের সরদার ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা সুরেশকে মদ খাওয়াইতে পারে নাই। তাহারা সুরেশকে, পড়ার খরচ দিবে, স্কুলের মাইনা দিবে, রোজ গাড়ীতে করে বেড়াতে নিয়ে যাবে এবং আরও কত প্রলোভন দেখাইয়াছে তবুও সুরেশ তাহাদের কথায় স্বীকৃত হয় নাই। অনেকে হয়ত মনে করিবে "এটা সুরেশের ভারী অন্যায়; যাহারা তাহার জন্য এত করিতে প্রস্তুত সে তাহাদের কথা শুনিল না।" কিন্তু সুরেশ, তাহা বুঝিত না। সে অন্যরূপ বুঝিত। সে ভাবিত "যিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পড়াইতেছেন তাহার মনে কত কষ্ট হইবে, দুঃখিনী মার দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং মার নিকট শুনিয়াছি মদ খাওয়া যে মহা পাপ তাহা হইতে কেমনে উদ্ধার পাইব?"

আজ সর্ব্ব প্রথমেই কানাই বাবু ছোট একটী গ্লাস এবং সুন্দর একটী বোতল বাহির করিলেন; এক গ্লাস লাল টক্‌টকে মদ ঢালিয়া সুরেশকে বলিলেন "ভাই সুরেশ, অনেক দিন তোমাকে অনুরোধ করিয়াছি তুমি শুন নাই, কিন্তু আজ এ অনন্দের দিনে আর তেমনটী করো না।"

সুরেশ। "তোমরা ত জান, আমি মদ খাই না, আমি মার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি কখনও মদ স্পর্শ করিব না। আমার বাবা এই মদের জন্য অকালে মরিয়াছেন, এই মদের জন্যই আমরা এত দুঃখী; আমি কখনও মদ খাইব না।"

এইরূপ কথা হইতে হইতে কানাই বাবু এবং তাঁহার বন্ধুরা কিছু কিছু উদরস্থ করিলেন। সকলেই সুরেশকে অনুরোধ করিতে লাগিল। কেহ বলিল "তোমার মা ত ইহা জানিবেন না।" কেহ বলিল, "এক গ্লাস খাইলে আর মাতাল হইবে না, মরিয়াও যাইবে না।" আর কেহ বা বলিল "গ্লাসটা নিয়া একটু মুখ দিয়ে দাওনা, তা হইলেই ত সকল গোল চুকে যায়।" কিন্তু সুরেশ তাহা বুঝিল না, সে বুঝিল "এক পাপের জন্য কেন আর এক পাপ করিব? মদ খাইবার জন্য কেন প্রতারণা করিব?"

অবশেষে কানাই গ্লাসটী হাতে করিয়া সুরেশের নিকট গিয়া বসিলেন, প্রথমে হাত ধরে

সাধিল, সুরেশ শুনিল না, গলা ধরে আদর করে কত বলিল কিছুতেই রাজি হইল না। তখন কানাইর রাগ হইল; দাঁড়াইয়া চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন।

"সুরেশ, এখনও বলিতেছি, কথা শুন; না হইলে ভাল হইবে না।"

সুরেশ তেমনি স্থিরভাবে বলিল "আমি কখনও মদ স্পর্শ করিব না।"

"তবে দেখ" বলিয়া কানাই বাঁ হাতে সুরেশকে চেপে ধরিয়া ড'ান হাতে মদের গ্ল্যাস লইয়া ঔষধের মত সুরেশের মুখে ঢালিতে গেল; কিন্তু সুরেশ মুখ খুলিল না। অনেক চেষ্টায়ও কানাইর উদ্দেশ্য সফল হইল না। তখন মাতাল কানাই রাগে অন্ধ; পশুর ন্যায় জ্ঞান শূন্য; কিছু দূরে গিয়া সুরেশের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল এবং হঠাৎ মদপূর্ণ গ্ল্যাস তাহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিল। গ্ল্যাস সুরেশের কপালে লাগিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; সুরেশ অচেতন হইয়া পড়িল; কপাল হইতে শতধারে রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন সকলেই অবাক্। অনেকে ভয়ে প্রস্থান করিল। কানাই বাবু বড় গ্রাহ্য করিলেন না। আর ২।৩ জন জল ঢালিতে লাগিল এবং বাতাস করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই হইল না। অবশেষে নিকটস্থ কোন ডাক্তার ডাকিতে হইল; ডাক্তার বাবুর নিকট কিছুই গোপন রহিল না, তিনি সুরেশকে সুস্থ করিয়া নিজের গাড়ীদ্বারা তাহার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। সেদিন সুরেশের মা কি কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় সুরেশ শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিল। এই অপরাধে স্কুল হইতে কানাই এবং শ্যামলালের নাম কাটা গেল; তাহারা চিরদিনের জন্য স্কুলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

শেষ।

উপরোক্ত ঘটনার বার বৎসর পরে রাত্রি ৮টার সময় দুইটী যুবক লালবাজারের রাস্তার ফুটপথে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। সে দিন মাসের ৩রা তারিখ। তাহারা সেই দিন গত মাসের মাইনা পাইয়াছে এবং সেই টাকার সৎব্যবহারের বিষয়ই চিন্তা হইতেছে। অনেক ক্ষণ পর পরামর্শ স্থির হইল, দুইজন নিকটস্থ শুঁড়ির দোকানে প্রবেশ করিল।

মদের সঙ্গে আরও দোষ আছে। তখন বড় জুয়াখেলা এবং লক্ষ খেলার চলন ছিল; যাহাদের এই ব্যবসা, তাহারা মদের দোকানেই কিছু সুবিধা পাইত। বাবুদের আজ ট্যাকে টাকা; খেলার দিকে মনটা সহজেই ঝুঁকিল। টাকার উপর টাকা যাইতেছে, দৃষ্টি নাই, "এইবারে বুঝি জিতিব" ভাবিয়া ক্রমেই বেশী টাকার বাজী ধরিলেন, কিন্তু সে আশা আর পূর্ণ হইল না। একজন সর্ব্বস্বান্ত হইল;—হাতের আংটী পর্য্যন্ত গেল। আর এক জন প্রায় অর্দ্ধেক টাকা খোয়াইল। তখন অনেক রাত্রি; দোকানদার পাহারাওয়ালার ভয়ে আস্তে আস্তে দোকান হইতে বাবু দুটীকে বাহিরে ছাড়িয়া দিল। দুজনে ঢুলিতে ঢুলিতে আসিয়া রাস্তায় একটা গ্যাসের নিকট দাঁড়াইল; একজন বলিল,

"ভাই আজ তোমার বড়ই দুর্ভাগ্য; সকল বারেই তোমার হার হইল। তা কি করিবে? চিরদিন ত আর সমান যায় না; আমাদেরও একদিন আসিবে; তখন ইহার শোধ উঠাইব। কাল অবশ্য তুমি আফিসে যাইবে? রাত্রি প্রায় ১টা বাজে এখন আসি—"

এই বলিয়া শ্যামলাল বাড়ীর দিকে ফিরিল। কানাই সেইখানেই কিছু ক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল তার পরে গঙ্গার পোলের দিকে চলিল। পাঠক পাঠিকা! এখন বুঝিয়াছ যে ইহারা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত শ্যামলাল ও কানাই। শ্যামলালেরর পিতার মৃত্যু হইয়াছে; তাহাদের অবস্থা এখন বড় খারাপ। কানাইরও সেইরূপ; তাহার দাদা কোন অপরাধ করার জন্য মেয়াদে গিয়াছেন। পূর্ব্বে কর্ত্তারা কেহই টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া যান নাই সুতরাং কানাই ও শ্যামলাল অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে। স্কুল ছাড়িয়া হাউসে কেরাণী গিরি চাকরী লইয়াছে। কিন্তু যেরূপ স্বভাব তাহাতে তাহাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যাহাদের জন্যে উন্নতি হইবে তাহারা এখন নাই। কাজে কাজেই তাহারা অতি সামান্য বেতনে চাকরী করিত। শ্যামলালের বিধবা মাতা, স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে এবং অন্য দুই একটী অনাথাও তাহার স্কন্ধে পড়িয়াছে। কানাইর পরিবার আরও বৃহৎ; নিজেদের বাড়ী ভাড়া দিয়া হাবড়ায় একটী সামান্য বাড়ী ভাড়া করিয়াছে; বৃদ্ধা মাতা, দাদার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদিগের ভরণ পোষণের ভার তাহার উপর; নিজেও বিবাহ করিয়াছে এবং দুইটী ছেলে হইয়াছে। এই বৃহৎ পরিবার তাহার দিকে চাহিয়া আছে। আজ মাইনা পাইবার দিন, এতরাত্রে এখনও কানাই বাড়ী ফিরিল না; মা পথের দিকে চাহিয়া আছেন; ছেলেরা "বাবা" "বাবা" করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; স্ত্রী বুঝিতে পারিয়াছেন 'কি কাণ্ড হইয়াছে'; এবং তখনও বসিয়া কাঁদিতেছেন।

এদিকে কানাই কি ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গার ধারে আসিল, তখন লোক জন নাই, আলো গুলি গঙ্গার জলে পড়িয়াছে। কানাই পোলের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছে গঙ্গার জল কেমনে যাইতেছে। শীতল বাতাসে মদের নেশা কমিতেছে—ক্রমে কানাইর বাড়ীর কথা মনে পড়িল। মা, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সকলের কথা মনে পড়িল—মনে হইল; 'আজ মাইনা পেয়েছি' টাকা না হইলে কাল খাওয়া ঘটিবে না; পকেটে হাত দিল টাকা নাই। হাতের দিকে দৃষ্টি পড়িল আংটী নাই তখন সকল কথা মনে হইল—মদ খাওয়া এবং জুয়াখেলার ফল কি হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিল। এই একমাস কেমনে চলিবে?—কিছুই উপায় নাই—চারিদিক অন্ধকার—কানাইর মাথা ঘুরিয়া গেল। নীচের দিকে চাহিয়া দেখিল গঙ্গার জল—বোধ হইল বড়ই শীতল। কানাইর মনে হইল "এই জলে ডুবিয়া সকল ভাবনা ভুলি না কেন?" তখন বাড়ীর দিকে একবার চাহিল—চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, জীবনের সকল পাপ ও দুষ্কর্ম্মের কথা মনে হইল। কানাই ভাবিল "আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। যাহারা রহিল ঈশ্বর তাহাদের উপায় করিবেন।" অনেক দিন পরে কানাইর মনে হইল ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন। বিপদে না পড়িলে অনেকেই সে কথা ভুলিয়া যায়।

কানাই তখন উঠিয়া পোলের শেষ প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল; একবার আকাশের দিকে চাহিল—দেখিল, গম্ভীর নিস্তব্ধ নীলবর্ণের আকাশে নক্ষত্র ভিন্ন কিছুই নাই। গঙ্গার জলের দিকে চাহিল তাহার মধ্যে দেখিল আলো। বাড়ীর দিকে আর একবার চাহিল; গঙ্গার জলে ডুবিয়া চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইবে ঠিক করিল। পাছে সাঁতরাইয়া তীরে উঠিতে ইচ্ছা হয় এই ভয়ে

আবশ্যক হইবে না, তারের পরিবর্ত্তে আলোকঊর্ম্মি শব্দ বহন করিবে।

আর একটী উদাহরণ দিয়া আমরা এই নিরস প্রবন্ধ শেষ করিব। বর্ণভেদ আলোকবাহী ঈথারঊর্ম্মির আয়তন ভেদ মাত্র। নয়নের ছায়াপটে বিভিন্ন আয়তনের ঊর্ম্মি প্রতিফলিত হইলে আমরা বিভিন্ন বর্ণ দর্শন করি। বৃহদায়তন ঊর্ম্মি লোহিত, ক্ষুদ্র নীল-লোহিত এবং মধ্যাকার নীল ও শ্যামল ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদন করে। এই সূত্রই উক্ত শ্বেত আলোক বিশ্লেষণে অনেক পরিমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। আকাশের বর্ণ নীলাভ সুতরাং বৃহদায়তন আলোক ঊর্ম্মির অভাব বলিয়া বোধ হয়। আকাশ নীল বলিলেই মনে সন্দেহ উদয় হয় যে, "ঘন বায়ুস্তর নীল বলিয়া কি আকাশ নীল দেখা যায় না?" কিন্তু বায়ুর বর্ণ নীল হইলে, সূর্য্যকিরণ উদয় ও অস্ত কালে পীত, স্বর্ণ ও লোহিত বর্ণ দেখাইত না। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে বায়ুর বর্ণ নীল নহে, পশ্চাৎ-নিক্ষিপ্ত (reflected) আলোক নীল, তাহার উদাহরণ জলের উপরে সাবান বা তৈলের ফেণা। বুদ্‌বুদের উপর পতিত আলোক নীল, কিন্তু বুদ্‌বুদ ভেদ করিয়া যে আলোক আসে তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে অতি সূক্ষ্ম পরমাণুনিচয় সর্ব্বক্ষণ শূন্যে ভাসমান রহিয়াছে। এই মতের অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত সার জন হার্সেল এক মহাবিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে ধূমকেতু আপনার পুচ্ছ দ্বারা আমাদের পৃথিবীর মত শত শত পৃথিবী আচ্ছাদন করিতে পারে, তাহার পুচ্ছের বিক্ষিপ্ত জ্যোতির্ম্ময় পরমাণুচয় যদি ঝাঁট দিয়া জড় করা যায় তাহা হইলে তাহার সমষ্টি এক গাড়ীর অধিক হইবে না। তাহার একটী পরমাণুর আকার কত ছোট তাহা হৃদয়ে ধারণা করা যায় না।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রতিভার।

—০০—

নদেরচাঁদ পাঁচ বৎসরে পদবিক্ষেপ করিলে; শুভদিনে শুভক্ষণে হাতে খড়ি পড়িল। ভক্ত প্রহ্লাদের মত নদেরচাঁদ "ক" দেখিয়াই কাঁদিয়া আকুল। কিন্তু কৃষ্ণনাম মনে হইয়াছিল কিনা, ইতিহাসে তা লেখে না। তবে লোকে বলে পরিণত বয়সে সে যে কাগজ বাহির করিয়াছিল, তাহারই আদি অক্ষর "ক" য়ে ঐরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। "বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ" নাকি বলেন, তাড়িৎ-শক্তিপ্রভাবে পরিণামদর্শনজনিত স্নায়বীয় স্ফুরণে এইরূপ রোদন সম্ভব।

বছর কয়েক বাঙ্গলা পড়িতে পড়িতে দেখা গেল, নদেরচাঁদ রচনায় অদ্ভুত ক্ষমতাশালী। পণ্ডিত মহাশয় একদিন "বিদ্যালয়-বর্ণন" লিখিতে দিলে নদেরচাঁদ সেই রচনার এক স্থানে লিখিয়াছিল, "নারায়ণের হস্তে যেমন সুদর্শন, ব্রহ্মার হস্তে যেমন কমণ্ডলু, মহাদেবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, ইন্দ্রের হস্তে যেমন বজ্র, ভীমের হস্তে যেমন গদা, বানরের হস্তে যেমন খোন্তা, পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তে তেমনই বেত"; এই প্রবন্ধ-পাঠের পর পণ্ডিত মহাশয় নদেরচাঁদের Theoretical বেত-বর্ণন তাহার পৃষ্ঠে কিছু অধিক মাত্রায় Practical এ পরিণত করিলে নদেরচাঁদ বাঙ্গলা স্কুল ত্যাগ করিয়াছিল।

বয়সের পরিমাণ কিছু অধিক হইলেও নদেরচাঁদ ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হইল। "খুদে পিপ্‌ড়ের" দলে "ডেঙ্গে পিপ্‌ড়ের" মত নদেরচাঁদ ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে A. B. C. আরম্ভ করিল। A. B. C. পড়িতে পড়িতে মাষ্টার মহাশয়ের দিকে বই আড়াল দিয়া সে নানারূপ মুখভঙ্গি করিত এবং A. B. C র সহিত মিল করিয়া অনেক প্রকার ছড়া আওড়াইত। শুনিয়া নিরীহ ছেলের দল হাসিয়া বাঁচিত না। নদেরচাঁদ যে রসিকতায় পরিণত বয়সে সুপরিচিত হইয়াছিল, এই হইতেই তাহার সূত্রপাত। ফাষ্ট বুক আরম্ভ করিয়াই P. u. t. put পুট হয়, আর B. u. t. but বাট, এরূপ অযথা বিভিন্নতা কেন হয়, বলিয়া, মাষ্টারের সহিত সে মহাতর্ক বাধাইয়াছিল। সেই অদ্ভুত তর্কে তাহার ন্যায়-শাস্ত্রোপযোগী বুদ্ধির অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, সেই অঙ্কুরের ফলে, না পড়িয়াও

ইহাকে বড় কেহ আদর করিত না, জন নিজেই ইচ্ছা করিয়া ইহার শিক্ষার ভার লইলেন। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া, অনেক কৌশল করিয়া, এই বালকটীকে এক জোড়া জুতা তৈয়ার করিয়া দিলেন; বিকলাঙ্গ বালক সেই জুতা ব্যবহার করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। জন পাউণ্ড্‌স্ তখন তাহার বিদ্যা শিক্ষার দিকে মন দিলেন। তিনি দেখিলেন যে, আরও দুই একটী সঙ্গী হইলে, বালকের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়। একদিন জন দেখিলেন একটী অনাথ বালক, কোনও স্থানে আশ্রয় না পাইয়া একটা বাড়ীর ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। এই নিরাশ্রয় বালককে দেখিয়া, পরদুঃখ-কাতর সদাশয় জন পাউণ্ড্‌সের হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি এই বালককে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। এবং নিজ ভ্রাতপুত্রের সঙ্গে ইহাকেও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। র‍্যাগেড্ স্কুলের এই প্রথম সূচনা হইল। ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে লাগিল; যে সকল অনাথ বালক বালিকা, আশ্রয়শূন্য সহায়-শূন্য হইয়া রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইত, সদাশয় জন পাউণ্ড্‌স্ তাহাদিগকে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়া অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জন এই অনাথ বালক বালিকাদিগকে যে কেবল শিক্ষা দিতেন, তাহা নহে; নিজের সামান্য গৃহে আশ্রয় দিয়া, ইহাদিগকে অন্ন বস্ত্র এ সমস্তই তিনি দিতেন। যাঁহাদিগের ধন আছে, সম্পত্তি আছে, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার যাঁহাদিগের শক্তি আছে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবার যাঁহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা হয়ত এই হতভাগ্যদিগের কথা ভাবিয়াও দেখেন না। কত শত অনাথ— কত শত নিঃসহায়, দুঃখী বালক বালিকা, একটু আশ্রয়ের জন্য, এক মুঠা অন্নের জন্য রাজপথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়, আমরা হয়ত তাহাদিগের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহি না। কিন্তু নিঃসহায় দরিদ্র চর্ম্মকার জন পাউণ্ড্‌স্, জুতা মেরামত করিয়া যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সেই সামান্য অর্থ দ্বারা, কত ক্ষুধিতকে অন্ন—কত দুঃখী অনাথকে আশ্রয় দিয়াছেন, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তিনি কাহারও নিকট কখনও কোন সাহায্য পান নাই; নিজের সামান্য আয়ই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। তিনি চির জীবন অবিবাহিত ছিলেন; এই দীন দুঃখী অনাথ

বালক বালিকারাই তাঁহার পুত্র কন্যা ছিল, ইহাদিগকে লইয়াই তাঁহার সংসার। নিজের সুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। এই দুঃখী অনাথ দিগকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়া, তিনি যে সুখ অনুভব করিতেন, অন্য সুখ তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

জন পাউণ্ড্‌সের জুতা মেরামতের যে সামান্য দোকান খানি ছিল, সেইখানেই এই বালক বালিকাদিগকে তিনি শিক্ষা দিতেন, আর স্বতন্ত্র গৃহ ছিল না। এই গৃহটীও বড় ছিল না; বারো হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত প্রস্থে একটী মাত্র ঘর। জুতা মেরামত করিতে যে সমস্ত যন্ত্র প্রয়োজন, সেই সমস্ত যন্ত্র লইয়া, সদাশয় জন এই গৃহের মধ্যস্থলে একখানি টুলের উপর বসিতেন—বালক বালিকারা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিত। জন জুতা মেরামত করিতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। কেহবা তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া পড়া বলিতেছে, কেহবা শ্রুত-লিখন লিখিতেছে, কেহবা তাঁহাকে অঙ্ক দেখাইতেছে; আবার অনেকে সেই গৃহের মধ্যে যে সামান্য দুই একখানি টুল বা ভগ্ন বাক্স ছিল, তাহার উপর বসিয়া রহিয়াছে,—তাহারাও পড়িবে। জন যখন ইহাদিগকে একত্র করিয়া শিক্ষা দিতে বসিতেন, তখন বাহির হইতে দেখিলে বোধ হইত, যেন বড়ই একটা বিশৃঙ্খলা। কিন্তু জনের এমনি বন্দোবস্ত ছিল, যে কখনও কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত না; সকলেই তাঁহার কাছে সমান শিক্ষা পাইত। ছোট ছোট ছেলে দিগকে শিক্ষা দিবার রীতি বড় অদ্ভুত ছিল। একটী ছেলেকে নিকটে ডাকিয়া জন তাহার হাতখানি ধরিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেন, "এখানা কি?" তারপর তাহাকে বানান করিতে বলিতেন, তারপর হাতে একটী তালি দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "বলত কি করিলাম?" কাহারও বা কানটী ধরিয়া বলিতেন, "বলত এটা কি?" তারপর কানটী মলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "বলত কি করিলাম?" এইরূপে বালকদিগকে কথা এবং সেই সকল কথার অর্থ শিখাইতেন। যেমন শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তেমনি সেই সকল অঙ্গের কি কি কার্য্য, তাহাও শিখাইয়া দিতেন। জন কেবল লেখা পড়া শিখাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। যাহাতে বালক বালিকাগণ নিজে জীবিকা সংস্থান করিতে পারে, এমন শিক্ষাও দিতেন। যাহাতে এই দুঃখী অনাথ বালক বালিকারা ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারে, যাহাতে জীবনে সৎপথে থাকিয়া, নিজ নিজ জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, জনের সেই চিন্তাই প্রধান ছিল; এবং একান্ত যত্নে, সেই প্রকার শিক্ষাই দিতেন। ছুটীর দিনে, জন ইহাদিগকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন, ইহাদিগকে ব্যাট্ বল, ঘুড়ী, প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া দিতেন, এবং নিজে ইহাদিগের সহিত খেলা করিতেন।

রবিবার দিন জন ইহাদিগকে লইয়া উপাসনা করিতে যাইতেন। ছেলে ও মেয়েদের কতকগুলি কাপড় জন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; রবিবার দিন সেইগুলি ছেলে মেয়েদিগকে পরিতে দিতেন; তাহারা তাহাদিগের ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সেই গুলি পরিয়া, মহা আনন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত;—সে দৃশ্য কি সুন্দর!

যে র‍্যাগেড্ স্কুলের দ্বারা এখন ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের এত উপকার হইতেছে, নিঃসহায় দরিদ্র চর্ম্মকার জন পাউণ্ড্‌স্‌ই তাহার মূল।

সদাশয় পরোপকার-পরায়ণ জন পাউণ্ড্‌সের দৃষ্টান্তে ডাক্তার টমাস গথ্রী প্রথম র‍্যাগেড্‌ স্কুল স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন। এক একটী অতি সামান্য কারণে কত সময়, এক একটী মহৎ কার্য্যের সূচনা হয়! ডাক্তার টমাস গথ্রী ঘটনাক্রমে একদিন একটী সরাইএ উপস্থিত হন। সেখানে অনেকগুলি ছবি ছিল; তার মধ্যে একটী ছবির দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন, একটী জুতা মেরামতের দোকানের ছবি; দোকানের মধ্যস্থলে একজন বসিয়া জুতা মেরামত করিতেছে, আর চারিদিকে কতকগুলি দরিদ্র, বালক বালিকা, তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহারা তাঁহার কাছে পাঠ শিক্ষা করিতেছে। ডাক্তার গথ্রী অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, সেটী জন পাউণ্ড্‌স্‌ এবং তাঁহার স্কুলের ছবি। তিনি জন পাউণ্ড্‌সের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, একজন সামান্য দরিদ্র চর্ম্মকারের চেষ্টায়, কত শত নিরাশ্রয় অনাথ বালক বালিকা, দুঃখ দারিদ্র্য—পাপ প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আমরা মেরী কার্পেণ্টারের জীবনীতে বলিয়াছি যে, ইংলণ্ডের নীচশ্রেণীর লোকের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। কত শত অনাথ বালক বালিকা, আশ্রয়শূন্য—সহায়শূন্য হইয়া, রাজপথে ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং অবশেষে উদরান্নের জন্য অসৎ-পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ডাক্তার গথ্রী দেখিলেন, এই পর-হিতৈষী, দরিদ্র, সামান্য চর্ম্ম-কারের চেষ্টায়, এই শ্রেণীর কত শত বালক বালিকার জীবনোপায় হইয়াছে। যাহাদিগের কোথায়ও আশ্রয় ছিল না, সমাজে যাহাদিগের স্থান ছিল না, আপনার বলিবার যাহাদিগের কেহ ছিল না, এই সদাশয় মহাত্মার সামান্য গৃহে, তাহারা আশ্রয় পাইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে; যাহাতে তাহারা জীবনে সৎপথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, সমাজের মধ্যে দশ-জনের একজন হইতে পারে, সদাশয় জন পাউণ্ড্‌স্‌ তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। কখন কখন দেখা যাইত, জন পাউণ্ড্‌স্‌ গরম গরম আলুসিদ্ধ হস্তে লইয়া, এক একটী বালকের পশ্চাতে দৌড়িতেছেন। দুষ্ট বালক-দিগকে তিনি আলু দিয়া ভুলাইয়া আনিতেন। পরের জন্য প্রাণ এত ব্যাকুল কয় জনের হয়; অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য কয় জনে এত করিয়া থাকে? এই দরিদ্র চর্ম্মকারের পরদুঃখ-কাতরতা, নিরাশ্রয় অসহায়দিগের প্রতি তাঁহার অতুলনীয় স্নেহ, দীন দুঃখী অনাথদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা—এই সমস্ত দেখিয়া ডাক্তার গথ্রী বিস্মিত হইলেন; এবং লজ্জিতও হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি র‍্যাগেড্‌ স্কুল স্থাপন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন,—সেইদিন হইতে সেই দরিদ্র চর্ম্মকার জন পাউণ্ড্‌সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, র‍্যাগেড্‌ স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ইংলণ্ডের দরিদ্র অনাথ বালক বালিকাদিগের জীবনোপায় হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জন পাউণ্ড্‌স্‌ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। নিজের সুখের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না; সেদিকে দৃষ্টি থাকিলে, যে মহৎ কাজের সূত্রপাত তিনি করিয়া গিয়া-ছেন, তাহা তাঁহার দ্বারা কখনই হইত না। সামান্য আহার এবং ছিন্ন বসনেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কাহারও নিকট হইতে তিনি কখনও কোন সাহায্য পান নাই; নিজের সামান্য আয়ের উপর

নির্ভর করিয়া, তাঁহাকে এ সমস্ত করিতে হইয়া-ছিল, জীবিত থাকিতে তাঁহার নাম প্রায় কেহ জানিত না;—এবং সেই সামান্য গৃহে যে তিনি কি মহৎ কার্য্যের ভিত্তি গাঁথিতেছিলেন, তাহা তিনি নিজে একবারও ভাবিতেন না। অনাথ নিরাশ্রয়দিগের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত, তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিতেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে যে দেশময় র‍্যাগেড্‌ স্কুল স্থাপিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ হইবে, তাহা তিনি নিজেও জানিতেন না। তিনি যদি শতশত লোকের মস্তক ছেদন করিয়া, একটী দেশ জয় করিতেন, তাহা হইলে হয়ত দেশ বিদেশে তাঁহার নাম ঘোষিত হইত। কিন্তু তিনি যে শত শত অসহায় অনাথ বালক বালিকাকে, দুঃখ দারিদ্র্য এবং পাপ প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে "মানুষ" করিয়া দিয়া-ছিলেন, তাহার মূল্য তখন কেহই বুঝে নাই।

জীবনের শেষ অবস্থায়, প্রায়ই দুই একজন সৈনিক, নাবিক অথবা অন্য কোন ব্যবসাবলম্বী লোক, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদিগকে চিনিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহারা,—আশ্রয় শূন্য সহায় শূন্য হইয়া যখন পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষা ও সদুপদেশেই তাহারা আজ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে,—এই কথা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যখন স্মরণ করাইয়া দিত, তখন তাঁহার কি আনন্দ হইত—কি অতুল সুখেই সুখী হই-তেন! যাহাদিগকে "মানুষ" করিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ তাহারা দশ-জনের একজন হইয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাই-তেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দ ধরিত না।

জন পাউণ্ড্‌সের বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছে, এই বৃদ্ধ বয়েসেও তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই। একজন চিত্রকর তাঁহার স্কুলের একখানি ছবি চিত্র করিয়া দিয়াছিলেন। জন পাউণ্ড্‌স্‌ গৃহে বসিয়া একদিন প্রাতঃকালে, একদৃষ্টে সেই ছবি-খানি দেখিতে ছিলেন। ছবিখানি দেখিতে দেখিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। যে সকল অনাথ বালক বালিকাদিগকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন, আজ তাহারা অনাথ হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মৃত্যুর পরও এই সকল অনাথ বালক বালিকারা কত দিন জন পাউণ্ড্‌সের গৃহদ্বারে আসিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া যাইত!

জন পাউণ্ড্‌সের জীবনী শেষ হইল; আমরা ডাক্তার গথ্রীর শেষ কথা কয়েকটী পাঠক পাঠিকা-দিগকে উপহার দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব;—আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি সেই দিন আসি-তেছে, যেদিন যিনি প্রকৃত সম্মানের উপযুক্ত, তিনিই সম্মান প্রাপ্ত হইবেন;—কবিগণ যাঁহা-দিগের যশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার জন্য কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিবেন, আর এই অপরিচিত দরিদ্র চর্ম্মকার, ঈশ্বরের চরণতলে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবেন।

"আসিবে না ?"

১

আবার শরৎকাল
দেখ মা, এসেছে ফিরে
বরষার জল বৃষ্টি
চলিয়ে গিয়েছে দূরে।

২

আকাশেতে মেঘ নাই
কেবলি গর্জ্জন সার।
প্রফুল্ল পৃথিবি-মুখ
চারি দিক পরিষ্কার

৩

মাঠেতে হরিত বর্ণ
শস্য গুলি মনোহর—
বাতাসে ঢেউর মত
নাবে উঠে থরে থর।

৪

নদী মাঝে কত নৌকা
আসে যায় তুলি পাল
কবে মা আসিবে দিদি ?
এইতো পূজার কাল।

৫

ফুটিয়াছে স্থল পদ্ম
দেখ মা, বাগানে কত
ঝুড়্ ঝুড়্ শেফালিকা
পড়িতেছে অবিরত

৬

কবে মা আসিবে দিদি ?
দুজনে ভোরের বেলা
বাগানে কুড়াব ফুল
আনন্দে গাঁথিব মালা।

৭

কেন মা বলনা কথা
রয়েছ এমন ভাবে ?
আসিবে না দিদি কিগো !
এবার বাড়ীতে তবে ?

৮

না না বাছা ; দিদি তোর
যেদেশে গিয়াছে হায় !
ফেরে না সেখান হ'তে
কেহ কভু পুনরায়।

সুরা-রাক্ষস কোম্পানী.

আন্‌লিমিটেড।

আমাদিগের ব্যবসায় অতি পুরাতন। বহুদিন হইতে আমরা এই ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছি। পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান নাই, যেখানে আমাদিগের কারবার নাই। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আমাদিগের ব্যবসার আজ কাল বড় উন্নতি; আমাদিগের সু-যশ ও সু-নাম কাহারও নিকট অবিদিত নাই। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই নিকট আমরা বিশেষ পরিচিত। সুতরাং আজ আবার নূতন করিয়া আমাদিগের পরিচয় দিবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু আমরা শুনিতেছি, কতকগুলি লোক হিংসা পরবশ হইয়া আমাদিগের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুরাপান নিবারিণী সভা, টেম্পারেন্স এসোসিএসন্, ব্যাণ্ড অব হোপ, প্রভৃতি নাম দিয়া, স্থানে স্থানে ইহারা দুই চারি জন মূর্খ লোককে ভুলাইয়া সভা করিতেছে। ইহাদিগের নিশ্চয়ই কোন একটা মতলব আছে; নিশ্চয়ই কোন স্বার্থ আছে; নতুবা অন্যের ক্ষতি করিবার জন্য ইহারা কেন এত ব্যস্ত হইবে? যাহাই হউক, এই ধূর্ত্ত-হিংসা-পরায়ণ লোকদিগের চেষ্টায় আমরা বিন্দুমাত্রও ভীত নই। আমাদিগের ক্রেতাগণের, বিশেষতঃ দেশের আশা ভরসা—যুবকগণের, আজ কাল আমাদিগের প্রতি যে প্রকার অনুগ্রহ, তাহাতে এই বিদ্বেষ-পরায়ণ লোকেরা আমাদিগের কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। শত সহস্র "ব্যাণ্ড অব হোপ" স্থাপন করিলেও, আমরা দেশময় যে প্রকাণ্ড "ব্যাণ্ড অব ডিস্‌পেয়ার" খাড়া করিয়াছি, তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না।

তবে এস বঙ্গদেশের বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ—তোমাদিগের জন্য অনন্ত নরকের দ্বার আমরা খুলিয়া রাখিয়াছি! এই পূজা উপলক্ষে আমরা তোমাদিগের সর্ব্বনাশের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিতে ত্রুটী করি নাই। মহারাজা, রাজা, জমিদার, ধনী—তোমাদিগের জন্য আমরা বিলাত হইতে খাঁটী হলাহল আমদানী করিয়াছি। দেশের সাধারণ লোক এবং দুঃখী দরিদ্রদিগেরও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমরা তাহাদিগের জন্য এই বঙ্গদেশের প্রায় প্রতি পল্লিতে, এই হলাহল প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। এই বাঙ্গলাদেশে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এবং অনুগ্রহে আমরা ছয় শত সদরভাটি ও তিন হাজার খোলাভাটি খুলিয়াছি। এই খোলাভাঁটিগুলিতে অবিশ্রান্ত হলাহল প্রস্তুত হইতেছে,—হে বঙ্গদেশের দুঃখী দরিদ্রগণ, তোমাদেরই জন্য; সুতরাং তোমরাও নিরাশ হইও না। ক্ষুধার সময় এক মুঠা অন্ন, পিপাসার সময় একবিন্দু জল, রোগের সময় এক-মাত্রা ঔষধ, দারুণ শীতের সময় একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র হয়ত তোমাদের জুটিবে না; কিন্তু তথাপি এই হলাহল পাইতে তোমাদের কোন কষ্টই হইবে না। ক্ষুধার সময় এক মুঠা ভাত খাইতে পাও আর নাই পাও,—খোলাভাঁটির প্রসাদে, আকণ্ঠ পুরিয়া এই হলাহল পান করিতে পাইবে। অতএব তোমাদের আজ কি আনন্দের দিন!

দেখ আমাদের কত দয়া! যেখানে হয়ত চারটী চাল মিলান কঠিন, আমরা তোমাদের জন্য সেখানেও এই খোলাভাঁটি বসাইয়াছি; তোমরা পেটে খাইতে পাও—আর নাই পাও, সুরাহলাহলের জন্য তোমাদিগকে কোন কষ্টই পাইতে হইবে না। নরকের দ্বার—সর্ব্বনাশের পথ দিবারাত্র তোমাদিগের জন্য খোলা রাখিয়াছি। যদি সহজে উচ্ছন্ন যাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে আর বিলম্ব না করিয়া আমাদের কাছে এস;—এমন সহজ পথ আর নাই!

যে যাহা চাহিবে, সে তাহাই পাইবে। এস বালক! তোমার জন্য সুরা হলাহল ঢালিয়া রাখিয়াছি, একবার পান কর—আর ভুলিতে পারিবে না! যত পান করিবে, ততই আরও

পান করিতে ইচ্ছা হইবে; তোমার সুকুমার দেহ, অস্থিসার করিয়া দিব, ফুটন্ত ফুলের মত তোমার সুন্দর পবিত্র মুখ মলিন হইয়া পিশাচের আকৃতি ধরিবে। অল্প বয়সে যদি যমের বাড়ী যাইতে চাও, তাহা হইলে আমাদের কাছে এস,—এমন সহজ পথ আর নাই।

যদি শরীরের স্বাস্থ্য হারাইয়া চিরজীবন রোগগ্রস্ত হইয়া থাকিতে চাও, তবে আমাদের কাছে এস! বিলাত হইতে আনীত ব্রাণ্ডী নামক এক প্রকার রক্তবর্ণ পদার্থ তোমাকে পান করিতে দিব; তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই লিভার নামক পদার্থের আয়তন ক্রমে বাড়িতে থাকিবে, এবং সেই রক্তবর্ণ পদার্থ পানে, রক্তকাশী উপস্থিত হইয়া, তোমাকে ত্বরায় ভব যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবে। বুদ্ধিমান বলিয়া তোমার যদি দুর্নাম থাকে, তবে আমাদিগের সুরা হলাহল পান কর, দেখিবে অল্পদিনেই তোমার সে দুর্নাম ঘুচিবে। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইবে, বুদ্ধিলোপ পাইবে; পাগলা গারদে রাজার মত থাকিতে পাইবে। কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। আমরা ধনীকে দরিদ্র করি, দরিদ্রকে দুঃখ কষ্টে ডুবাইয়া দি; সৎপথে যাহারা চলিতেছে, তাহাদিগকে পাপ-পথে লইয়া যাই; আমাদিগের ক্ষমতা অসীম, যিনি পরমধার্ম্মিক, এই সুরাহলাহল পান করাইয়া তাঁহাকেও আমরা পাপে ডুবাইয়া দি। আমরা পরিবারের সুখ শান্তি নষ্ট করিয়া চির অশান্তির বীজ বপন করি। আমরা পিতাকে পুত্রহীন করি, ভগ্নীর নিকট হইতে ভাইকে কাড়িয়া লই। আমাদের কত প্রতাপ! কত মাতাকে আমরা পুত্রহীন করিয়াছি, কত পুত্র কন্যাকে পিতৃহীন করিয়া, পথের ভিখারী করিয়াছি; কত স্ত্রীকে পতিহীন করিয়া চিরদুঃখে ডুবাইয়া দিয়াছি! আমাদিগের কত ক্ষমতা যদি দেখিতে চাও, তবে একবার বাঙ্গালাদেশের দিকে চাহিয়া দেখ। কত শত পরিবার আমাদিগের কৃপায় উচ্ছন্ন গিয়াছে, এবং কত যাইতেছে একবার চাহিয়া দেখ! গভর্ণমেণ্টের কৃপায় বাঙ্গালাদেশের পল্লিতে পল্লিতে আমরা খোলাভাঁটি খুলিয়াছি; বালকদিগের—গরীব দুঃখীদিগেরও উচ্ছন্ন যাইবার পথ কত সহজ করিয়া দিয়াছি! তোমাদিগের আমরা কত উপকারী! এস তবে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলে এস;—নরকের দ্বার, সর্ব্বনাশের দ্বার তোমাদিগের জন্য খুলিয়া রাখিয়াছি; উচ্ছন্ন যাইবার এমন আর সহজ উপায় নাই। সুরাহলাহলের স্রোতে আমরা দেশকে একেবারে ডুবাইতে চাই; এই পূজার সময় দেশে সুরাস্রোত খুব বহিবে, এমন আশা আমাদিগের আছে। এই স্রোতে কি দেশ তবে এবার ডুবাইতে পারিব!

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। ভারত।

নূতন।

১। শরীর যদিও হয় পৃথিবী আকার,
কিন্তু কোথা নাহি স্থির আবাস আমার।
সংসারে সকলে মোরে অনাদর করে,
সম্মান যে জন করে তার মান বাড়ে।
অবহেলে যেইজন বামে দেয় স্থান,
আমার কারণে তার হয় অপমান।

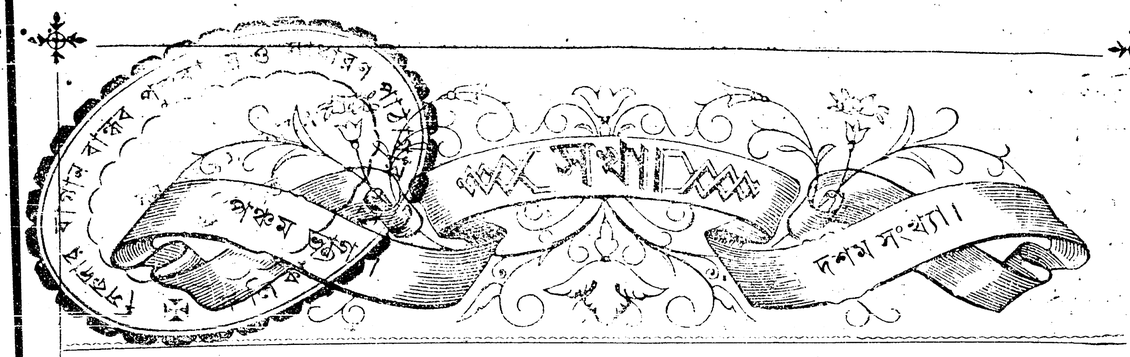

অক্টোবর, ১৮৮৭।

ফুলের সাজি।

অষ্টম অধ্যায়।

বন্ধু সমাগম।

খুল্ল দীননাথ ও তাহার দুহিতা মনোরমা বৃক্ষতলে বসিয়া আছে, দ্বারিকানাথ নামে দীননাথের পূর্ব্ব পরিচিত একজন কাঠুরিয়া বন্ধু তথায় উপস্থিত হইল। দীননাথ ও দ্বারিকা নাথের মধ্যে অনেকদিন সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাহারা পরস্পরকে বিলক্ষণ জানিত। দ্বারিকানাথ প্রাতে কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইল। সে আসিয়াই দীননাথকে কহিল—ভাল ত ভাই, একি তুমি ও মনোরমা এখানে কেন? দূর হইতে আমি তোমার গলার স্বর শুনিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলাম এ কাহার স্বর; অমনি ছুটিয়া আসিলাম।

দীননাথ তাহার নিকট তখন আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা বর্ণন করিল। যতক্ষণ দীননাথ আপনাদের দুঃখের কথা বলিতেছিল সরলহৃদয় দ্বারিকানাথ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। দীননাথের কথা শেষ হইলে দ্বারিকানাথ কহিল—ভাই রাজপুরুষেরা নিরপরাধী তোমাকে এমন করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল! বুড়ো বয়সে তোমার প্রতি অকারণে এরূপ ব্যবহার করা বড় অন্যায় হইয়াছে।

দীননাথ কহিল—ভাই দ্বারিক, সেজন্য দুঃখিত হইও না—পৃথিবীর সকল স্থানেই ভগবানের—তাঁহার সূর্য্য, তাঁহার চন্দ্র সকল স্থানেই উদিত হইয়া মানবের মনে আনন্দ প্রদান করিতেছে ও সকলের বিবিধ উপকার করিতেছে। যেখানেই যাই—সর্ব্বত্র—সর্ব্বত্র তাঁহার রাজত্ব—সর্ব্বত্র তিনি বিদ্যমান—সর্ব্বত্র তাঁহার ভালবাসা—পরমেশ্বরই আমাদের গৃহ।

দ্বারিকানাথ আবার বলিল—তাইত কিরূপে তাহারা তোমার স্বভাব জানিয়াও তোমার প্রতি এরূপ কঠোর ও নির্দ্দয় আচরণ করিল। এক কাপড়ে তুমি কিরূপে বিদেশে যাইবে? হায়! হায়! তোমার দুঃখ দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়।

বিশ্বাসী দীননাথ কহিল—ভাই যিনি বৃক্ষদিগকে ফলপুষ্প শোভিত করেন তিনি আমাদিগকে বস্ত্র প্রদান করিবেন।

দ্বারিকানাথ বলিল—তোমার কাছে পথ খরচ টাকা কি কিছু আছে?

দীননাথ বলিল—আমাদের নির্ম্মল বিবেক এবং আত্মাই আমাদের ধন। শুদ্ধ বিবেক ও আত্মার পরিবর্ত্তে যদি আজ আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিত—এমন কি যে প্রস্তরখানির উপর আমি বসিয়া আছি, এখানি যদি স্বর্ণ হইয়া আমাদের হইত তথাপিও আমরা দরিদ্র থাকিতাম। ধনী তিনি, যাঁহার শুদ্ধ বিবেক ও আত্মা আছে।

দ্বারিক কহিল—যাহা বলিলে তাহা সমুদায় ঠিক, কিন্তু বল দেখি তোমার নিকট কি একটী পয়সাও নাই?

দীননাথ উত্তর করিল—এই সাজিটী আমার সমুদায় সম্পত্তি! তুমি দেখ দেখি ইহার মূল্য কত?

দ্বারিকানাথ বলিল—আট আনার অধিক হইবে না, কিন্তু ইহাতে কি হইবে?

দীননাথ হাসিয়া বলিল—তবে আমাদের অন্নকষ্ট হইবে না—যদি আমার শরীরে ভগবান শক্তি ও স্বাস্থ্য দেন তাহা হইলে আমি বৎসরে এরূপ দুই শত সাজি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিতে পারিব। বৎসর এক শত মুদ্রা হইলে আমাদের দুজনের যথেষ্ট হইবে। আমার পিতা আমাকে যেমন বাগানের কাজ সুচারুরূপে শিখাইয়াছিলেন সেইরূপ সাজি নির্ম্মাণ কার্য্যও শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমি এখন বুঝিতে পারিলাম আমার এই কাজ শিখিয়া কত ভাল হইয়াছে। যদি আমার পিতা আমার জন্য দুই হাজার টাকা রাখিয়া যাইতেন তাহাও আমার আজ কোন কাজে আসিত না, সমুদায় রাজভাণ্ডারে যাইত, কিন্তু এই কর্ম্ম শিখিয়া আমার দুই হাজার মুদ্রা প্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক উপকার হইয়াছে। সুস্থমন ও সুস্থদেহ লইয়া ধর্ম্মে মতি রাখিয়া সামান্য উপার্জ্জন করিলেও মানুষ পরম সুখী হইতে পারে সন্দেহ নাই।

দ্বারিকানাথ আহ্লাদ সহকারে বলিল—পরমেশ্বর ধন্য যে, তিনি তোমার এরূপ বুদ্ধি দিয়াছেন। তোমার যে মত আমারও তাই।

কিন্তু ভাই তুমি কতদূরে যাইতে মানস করিয়াছ?

দীননাথ বলিল,—অনেক দূরে, এমন স্থানে যাইব যেখানে আমাদিগকে কেহ জানে না। পরমেশ্বর আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবেন।

দ্বারিকানাথ বলিল—ভাই এই শক্ত মোটা লাঠীগাছটী লও—ভাগ্যে আমি এই গাছটী সঙ্গে আনিয়াছিলাম—ভাই আর একটী কথা শুন, এই কটী টাকা লও—এই বলিয়া সে একটী টাকার গেঁজে বাহির করিয়া বলিল, আমি খাজনা দিবার জন্য এই কটী টাকা লইয়া যাইতেছিলাম বলিয়া এটী আমার সঙ্গে ছিল।—তোমার যদি ইহাতে কিছু সাহায্য হয় তাহা হইলে আমি সুখী হইব।

দীননাথ বলিল—ভাই দ্বারিক আমি আনন্দ মনে ও বন্ধুতার স্মরণার্থে তোমার এই লাঠী লইলাম। কিন্তু আমি টাকা লইতে পারিব না। ইহা খাজনার টাকা, ইহা আমি লইলে তুমি কিরূপে যথাসময়ে খাজনা দিতে সমর্থ হইবে? খাজনার দিন গত হইলে যদি খাজনা দিতে না পার তাহা হইলে রাজা তোমার সমুদায় ঘর বাড়ী নিলাম করিয়া লইবে।

কাঠুরিয়া দ্বারিকানাথ তখন হাসিতে হাসিতে কহিল—ভাই দীননাথ তোমার সে ভয় করিতে হইবে না। আমি খাজনা দিবার দিনের পূর্ব্বেই এই টাকার দুইগুণ টাকা পাইব। দুই বৎসর পূর্ব্বে একজন দুঃখী চাষার গরু মরিয়া যাওয়াতে সে আমার নিকট হইতে ২০৲ কুড়িটী টাকা ধার

লয়। আমি কখনও তাহার নিকট ঐ টাকা চাই নাই। কাল সকালে তাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। সে আমায় দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল দ্বারিক দাদা ভগবানের ইচ্ছায় ধান বিক্রয় করিয়া এবার আমি দুই পয়সা পাইয়াছি। তোমার জন্যই আমার কিছু হইয়াছে। তুমি আমার বিপদের সময়ে সাহায্য না করিলে আমার লাভ হওয়া দূরে থাকুক আমার কিছুই থাকিত না। দাদা, আগামী রবিবারে তোমার সেই টাকা কটী আমি তোমার বাড়ী দিয়া আসিব। আমি তাহার ভাল অবস্থার কথা শুনিয়া বড় খুসী হইলাম। অতএব তোমায় যদি এই টাকা দি, তাহাতে আমার বিপদে পড়িতে হইবে না, টাকা কটী লও।

দীননাথ তাহার সৌজন্যতাগুণে এত মুগ্ধ হইল যে, সে আর দ্বারিকানাথের কথায় "না" বলিতে পারিল না।

তখন দীননাথ বলিল—আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মনে তোমার এই টাকা গ্রহণ করিলাম; তোমার মত উদার হৃদয় ও দয়ালু লোক দেখি নাই। ভগবান তোমার নিশ্চয়ই মঙ্গল করিবেন। এই বলিয়া—দীননাথ মনোরমার দিকে চাহিয়া কহিল—মনোরমে দেখ ভগবান আমাদের প্রতি কত প্রসন্ন—আমরা বিদেশ যাইবার অগ্রেই তিনি আমাদিগকে কেমন আশ্চর্য্য সাহায্য পাঠাইলেন; তিনিই আমাদের সহায়তার জন্য দ্বারিকানাথকে পাঠাইয়াছেন। এই লাঠী ও এই টাকা তাঁহারই প্রদত্ত। কত শীঘ্র তিনি আমাদের প্রার্থনাপূর্ণ করিলেন! ভগোৎসাহ হইওনা, ভয় করিও না—ঈশ্বর যাহাদের সহায় তাহাদের আবার ভাবনা কি?

দ্বারিকানাথ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—তবে—দীননাথ, মা মনোরমা, আমি বিদায় হই। আমি চিরকাল তোমাদিগকে ভাল বলিয়া জানি, এখনও আমার সেই ভাব নষ্ট হয় নাই। "সাধু যাহার ইচ্ছা, হরি তাহার সহায়" তবে এস, তোমাদের ভয় নাই, তোমাদের কখনই এই দুঃখ চিরদিন রহিবে না। ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের এই দশা দূর করিবেন। তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন।

এই বলিয়া দ্বারিকানাথ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দীননাথকে আলিঙ্গন করিল। দীননাথও তাহাকে দুই হস্তদ্বারা ধারণ করিল—উভয়ের নেত্র জলে উভয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল—জগতে এইরূপ সদ্ভাব যেখানে, সেইখানেই স্বর্গ সুখ। এইভাবে কতক্ষণ গত হইলে দ্বারিকানাথ ধীরে ধীরে দীননাথকে পরিত্যাগ করিল—মনোরমাও দ্বারিকানাথকে নমস্কার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। দ্বারিকানাথ তখন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল, যতদূর দৃষ্টি চলে তাহারা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যখন আর দ্বারিকানাথকে দেখা গেল না, দীননাথ কন্যার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তরদিক ধরিয়া গমন করিল।

ক্রমশঃ।

ভারতের অসভ্যজাতি।

(১২৫ পৃষ্ঠার পর।)

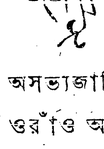

খার পাঠক পাঠিকা! তোমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছ ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ প্রভৃতির জঙ্গলময় পাহাড়ে অনেক অসভ্যজাতি বাস করে; ঐ সকল জাতির মধ্যে ওরাঁও অর্থাৎ ধাঙ্গড়দিগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলা

হইয়াছে। আজ তোমাদিগকে কোল জাতির বিষয় কিছু বলিব। হাজারিবাগের নিকট রামগড়ের জঙ্গল, গঙ্গাপুর, সরগুজা, এবং সিংহভূম প্রভৃতি স্থানে অনেক কোল দেখিতে পাওয়া যায়। কোল মাত্রেই যে এক তাহা মনে করিও না, যেমন আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থদিগের মধ্যে নানা প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে, কোলদিগের মধ্যেও সেইরূপ। ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে যেমন রাঢ়, বারেন্দ্র, বৈদিক, কনোজিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার ব্রাহ্মণ, কোলদিগের মধ্যেও মুণ্ডা, লব্‌কা, হুস্, চুয়াড় এবং ভূম্‌জি প্রভৃতি নানাপ্রকার কোল আছে। কোলেরা যে কোথা হইতে আসিয়া এই সকল প্রদেশে বাস করে তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, কারণ এই জাতির শাখা প্রশাখা ভারতবর্ষের আরও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কে বলিতে পারে এই জাতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে কোথায় বাস করিত? এই সকল প্রদেশে যখন কোল জাতিরা প্রথমে আসিয়া বাস করে তখন অবধি নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত জমিদারেরা তাহাদিগের উপর কতকটা আধিপত্য করিত, কিন্তু সে আধিপত্য অনেকটা কেবল নামেই, কাজে বড় কিছু করিতে পারিত না। বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্ব কালেও কোল জাতিকে অনেক সময়ে অনেক বার ঐ সকল অর্থ পিশাচ জমিদারদিগের নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার অত্যাচারের যেমন একটা সীমা আছে, সহ্য করিবার ক্ষমতারও তেমনই সীমা আছে। কোল জাতি পুরুষ পুরুষানুক্রমে অনেক সহ্য করিয়া আসিয়াছে আর তাহারা জমিদারদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না; সমস্ত কোল জাতি এক হইয়া বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়। সখার পাঠক পাঠিকা! তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, জমিদার এমন কি অত্যাচার করিতে পারে—যাহাতে সমস্ত কোল জাতি ক্ষেপিয়া উঠে? তোমাদিগের এ প্রশ্ন নিতান্ত অসঙ্গত নয়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে এবং জমিদারদিগের মধ্যে কতক পরিমাণে শিক্ষা বিস্তারের গুণে আমাদিগের এ সকল দেশে প্রজাদিগের প্রতি আর তত অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অতি অল্পকাল—এমন কি ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রজাদিগের প্রতি জমিদারেরা যে অত্যাচার করিত তাহার কথা আর কি বলিব! খাজনা আদায়ের নিমিত্ত জমিদারেরা প্রজাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দুর্গন্ধময় অন্ধকার কুঠরিতে দুই তিন দিন অনাহারে কয়েদ করিয়া রাখিত। চৈত্র বৈশাখ মাসের রৌদ্রে মাথায় বোঝা চাপাইয়া সমস্ত দিন দাঁড় করাইয়া রাখিত, পাদুকাঘাত করিত, ধান খাইতে দিত এবং আরও কত যে নিষ্ঠুরাচরণ করিত তাহা আর কি বলিব। কখন কখন আবার প্রজাদের স্ত্রীলোক, বালকদিগের প্রতিও অত্যাচার করিত। এখন বুঝিতে পারিলে, কোলেরা কি সাধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। একটি কথা, তোমরা মনে করিও না যে জমিদারদিগের মধ্যে একজনও ভাল লোক ছিলেন না; অনেকে এত ভাল ছিলেন যে, তাঁহারা প্রজাদিগকে আপন সন্তানের মত দেখিতেন।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিলেন জমিদারদিগের অত্যাচারই কোল বিদ্রোহের প্রধান কারণ; তখন নানা প্রকার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া সে বিদ্রোহ নিবারণ করিলেন। এখন আর কোলদিগের উপর জমিদারদিগের কোন ক্ষমতা নাই; গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে খাজনা আদায় হয়,

এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত হয়। কোলদিগকে অত্যাচারের হাত হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত পাদ্রি সাহেবেরাও যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহাদিগের শুভ অনুষ্ঠানের যথেষ্ট ফলও হইয়াছে।

ধাঙ্গড়, সাঁওতাল প্রভৃতি অন্য অন্য অসভ্য-জাতির মত কোলেরাও দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং কদাকার। কদাকার হইলেও কিন্তু ইহারা বেশ বলিষ্ঠ এবং কর্ম্মপটু। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলের মাথায় লম্বা লম্বা চুল, তবে পুরুষেরা মাথার কতকটা কামায় বলিয়া বিশ্রী দেখায়। কোলদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন তাহারাই ধুতি এবং দোপাটা পরিয়া থাকে, তাহা ভিন্ন কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই কৌপিন পরে। অসভ্যদিগের মধ্যে যে বস্ত্র পরিধানের প্রথা নাই তাহার প্রধান কারণ বস্ত্র প্রস্তুত করার উপায় না থাকা। কালে তাহারা যেমন উন্নত হইতেছে, তেমনি বস্ত্রাদি বুনিতেও শিখিতেছে। তোমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছ অলঙ্কার পরার সাধটা সভ্য অসভ্য সকল জাতিরই আছে, তবে না হয় সুভ্য জাতিরা মূল্যবান অলঙ্কার পরেন আর অসভ্যেরা বহুমুল্য অলঙ্কার কোথা পাইবে? তাহারা গাছের পাতা, পাখীর পালক পরিয়া মনের সাধ মিটায়। কোলেরাও এ নিয়মের বাহিরে নয়। কোন উৎসব হইলে কোল রমণীরা ফুল ও পাতার সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পরে এবং সচরাচর কাঁসার মাকড়ী এবং শঙ্খ এবং পুতির কণ্ঠমালা পরিয়া থাকে। তীর—ধনুক এবং টাঙ্গি কোলদিগের প্রধান অস্ত্র। তীর চালনায় ইহারা বড় পটু। আমাদিগের দেশে যেমন বালক বালিকারা পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইতে পাঠশালায় কিম্বা স্কুলে শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়, কোল বালকেরা সেইরূপ অল্প বয়স হইতেই তীর চালনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে বেশ শিকারী হইয়া উঠে। আজ কাল কোলেরা বেশ চাষ করিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন করিতেছে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহারা যে কেবল শস্য উৎপন্ন করিতে শিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে তাহা নয়; গো, মেষ, মহিষ পুষিয়া ঘৃত, দুগ্ধের ব্যবসাও আরম্ভ করিয়াছে। কোলেরা সর্ব্বভূক বলিলেই হয়, এমন জন্তু কি পাখী নাই যাহা ইহারা খায় না। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই, তবে আহার সম্বন্ধে ইহাদের একটী আশ্চর্য্য কুসংস্কার আছে, আহার করিতে করিতে যদি মানুষের ছায়া আহারীয় পাত্রের উপর পড়ে তবে আর আহার করা হয় না, কিম্বা পানীয় পাত্র অন্য কেহ স্পর্শ করিলে সে পাত্রে আর জলপান করে না।

কোলেরা খুব আমোদ প্রিয়; কোন কোন পল্লিতে যাও দেখিবে নৃত্য, গীত অবিশ্রান্ত চলিয়াছে, বালক বালিকারা পর্য্যন্ত এই নৃত্য গীতে যোগ দিতেছে। কাল নাই, অকাল নাই, কি সন্ধ্যা, কি সকাল আমোদের তরঙ্গ চলিয়াছে। এই প্রফুল্ল চিত্ততা যেমন কোলদের একটা গুণ তেমনি আর কয়েকটি মহৎ দোষে সমস্ত মাটি করিয়াছে। বলিষ্ঠকায় এবং কর্ম্মপটু হইলেও পুরুষেরা প্রায়ই অলস প্রকৃতি; স্ত্রীলোকেরাই অধিকাংশ সাংসারিক কার্য্য করিয়া থাকে। কোন উৎসব কিম্বা বিবাহ উপলক্ষে ইহারা এত সুরাপান করে যে প্রায় সকলেই জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। যতই কেন দোষ থাকুক না কোলদের একটি মহৎ গুণ এই যে, ইহারা অত্যন্ত সৎ এবং সত্যপ্রিয়। এমন সময় ছিল, যখন কোলেরা চুরী

ডাকাতি এবং লুঠ পাট করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তখনও কিন্তু কেহ মিথ্যা কথা কিম্বা প্রবঞ্চনার অভিযোগ ইহাদিগের বিরুদ্ধে করিতে পারে নাই। কোলদিগের যুবক যুবতীরা প্রায়ই মুক্তভাবে মিশিয়া থাকে; কোন যুবক যুবতীর মধ্যে ভালবাসা জন্মিলে এবং তাহাদিগের পিতা মাতা কিম্বা আত্মীয় বন্ধুর বিশেষ কোন আপত্তি না থাকিলে শীঘ্রই বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু যুবতীর পিতা মাতার সম্মতি লইবার পূর্ব্বে যুবককে কন্যার মূল্য স্বরূপ কিছু দিতে হয়: বিবাহ প্রণালী অতি সংক্ষেপ। সমস্ত ঠিক হইলে পর কন্যার পিতা মাতা এবং আত্মীয় বন্ধুগণ কন্যাকে লইয়া পাত্রের বাড়ী যায়; পাত্র কন্যাকে বসিবার আসন দিয়া তাহার মস্তকে তৈল ঢালিয়া দেয় এবং ভাত, মাংস এবং আর আর আহারীয় দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত করে, কন্যা কিঞ্চিৎ আহার করিলেই বিবাহ হইয়া গেল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোলদিগের বিশ্বাস প্রায়ই ধাঙ্গড়-দিগের মত, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সূর্য্যেতে সপ্রকাশ, চন্দ্র তাঁহার স্ত্রী এবং নক্ষত্রগণ তাঁহার কন্যা। কোলেরা কোন দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে না, কিন্তু উপদেবতাগণের প্রীতির নিমিত্ত ছাগ, মেষাদি বলি দিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

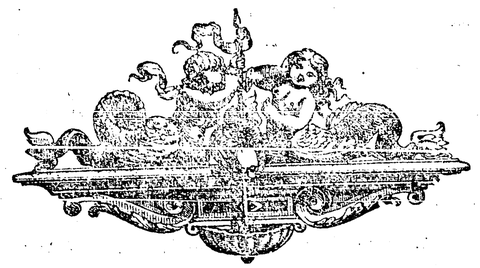

মুক্তি লাভ।

জগদীশ্বর প্রাণীগণের মঙ্গলের জন্য কখন কি ভাবে কাহাকে রক্ষা করেন বুঝা যায় না। কখনও বা কেহ তাঁহার উপাসনা করে এইজন্য শত্রু কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে কখনও বা কেহ তাঁহারই আশীর্ব্বাদে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে। এসকলই যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি বিধান করেন তাহা অবশ্য বলিতে হইবে।

সুইজরলণ্ডের ভড়য় নামক এক সম্প্রদায় ঈশ্বরের উপাসনা করিত এই তাহাদের অপরাধ। এই গুরুতর অপরাধ জন্য অন্যান্য দেশবাসী নাস্তিক সম্প্রদায়েরা ইহাদের উপর খড়্গহস্ত হইল; কিসে এই ধার্ম্মিক সম্প্রদায়কে বিনাশ করিতে পারে এইজন্য তাহারা সকলেই দলবদ্ধ হইল। এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মগুরু পোপ পর্য্যন্তও তাহাদের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া, নিরীহ, ধর্ম্মভীরু, ঈশ্বর ভক্ত ভড়য় সম্প্রদায় আপন দেশ, ঘর, বাড়ী ছাড়িয়া এক পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানেও তাহাদের নিস্তার নাই। শত্রুগণ তাহাদের একেবারে নির্ব্বংশ করিবে এই অভিপ্রায়। যাহাতে এক প্রাণীও না বাঁচে, যাহাতে এক প্রাণীও ভুল ক্রমে ঈশ্বরের নাম না করে এইজন্য শত্রুরা সেই পর্ব্বতে গিয়াও ভড়য়দের পীড়ন করিতে লাগিল। পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে শত্রু পক্ষীয় প্রহরীরা ঘেরিয়া রহিল; রাত্রি হইলেই সকলকে মারিয়া, কাটিয়া, পোড়াইয়া ফেলিবে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিল। অবশিষ্ট সৈন্যেরা অনতিদূরে তাঁবু ফেলিয়া মদ খাইয়া আমোদে সময় কাটাইতে লাগিল, সকলেরই মুখে এক কথা এই যে, এবার দেখিব কেমনে "ঈশ্বর ইহাদের রক্ষা করেন।"

এদিকে ভড়য় সম্প্রদায়স্থ যুবকগণ আসন্ন বিপদ উপস্থিত মনে করিয়া, মহিলা ও বালক দিগকে আরও পর্ব্বতের দূরতম স্থানে প্রেরণ করিবার জন্য তাহাদের দলস্থ বৃদ্ধদের উপর ভার দিল। এবং নিজেরা সকলকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। বারট্রাণ্ড নামে একটি অল্পবয়স্ক বালক তাহার মাতার সঙ্গে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া পথ হারাইয়া গেল। মাতা পুত্রকে সঙ্গে না দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পর্ব্বতের গুহ্যতমস্থানে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে বালক পথ ভুলিয়া গিয়া যে কিছু বিপদাপন্ন হইয়াছে এরূপ মনে করা দূরে থাকুক, বরং সে নানাস্থানের নানাপ্রকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিজের কষ্ট ভুলিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাইতে যাইতে অবশেষে রাত্রি হইল। রাত্রিতে দুই একটী নক্ষত্র মাত্র জ্বলিতেছে: এই ক্ষীণ আলোকে বারট্রাণ্ড হঠাৎ একটী "জয়ঢাক" দেখিতে পাইল; ঢাকের কাঠি ও সাম্‌নে ছিল। জয়ঢাক বাজাইলে শব্দ শুনিয়া তাহার সাহায্যার্থে লোক আসিতে পারে এই জন্যই জয়ঢাক বারট্রাণ্ড বাজাইল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে হঠাৎ জয়ঢাকের শব্দ শুনিয়া নাস্তিক শত্রুপক্ষের প্রহরীদের মধ্যে ভয় উপস্থিত হইল, তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া তাঁবুতে দৌড়িয়া গিয়া দলস্থ সকলের নিকট বলিল যে, "ভড়য়গণ সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আসিতেছে, ঐ শুন তাহাদের জয়ঢাকের শব্দ শুনা যাইতেছে" এই বলিবামাত্র দলস্থ সকলেই জয়ঢাকের শব্দ শুনিতে পাইল।

সকলের মনে ভয় সঞ্চার হইল—যাহা-দিগকে অপদার্থ মনে করিয়া একদণ্ড পরে পদে দলিয়া নিপীড়িত করিবে মনে করিয়াছিল তাহাদের সৈন্য সংগ্রহ করা, যুদ্ধ যাত্রাকরা-একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, অচিন্তনীয় কাণ্ড মনে হওয়ায় ভয়ে নিস্তব্ধ হইল। নাস্তিকদল ঈশ্বর মানিত না বটে, কিন্তু এই হঠাৎ একটীমাত্র শব্দ শুনিয়া মনে করিল যে, ঈশ্বর নিজেই এই ভড়য়দের যুদ্ধ যাত্রা করাইতেছেন; না হইলে কোথা হইতে এই অসহায় সম্প্রদায় এই নিভৃত স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিল? এমন সাহস হইলনা যে, সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করে। তাহাদের মধ্যে একটা হঠাৎ বিপদ উপস্থিত হইল, সৈন্যাধ্যক্ষের মনে স্থিরতা রহিল না, যে যেখানে ছিল দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শত্রু তাম্বুর মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে টের পাইয়া এই সুযোগে ভড়য় যুবকগণ যাহারা শত্রুদের হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছিল তাহারা সকলে একত্র হইয়া অগ্রসর হইল--

যেই অগ্রসর হওয়া সেই "মুক্তিলাভ"। শত্রুগণ ইহাদের দেখিবামাত্র পলায়ন করিল। ভড়য়দের মুক্তিলাভ হইল।

শত্রুদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া ভড়য়গণ নিজ দেশে গিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। এই সত্য ঘটনা যখন দেশময় প্রচারিত হইল তখন যাহারা ঘোর সাংসারিক তাহারাই এই ব্যাপারকে 'আকস্মিক ঘটনা' বলিয়া উল্লেখ করিলেন—কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী, ধর্ম্মভীরু তাহারাই বলিলেন যে, ঈশ্বর বালক বারট্রাণ্ড দ্বারাই এই কার্য্য উদ্ধার করাইলেন। পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি মনে কর?

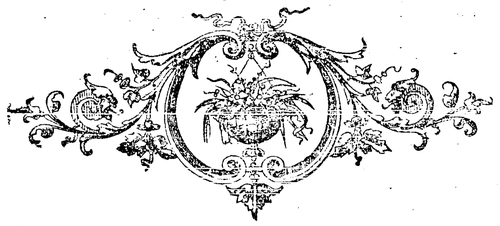

রাখি-বন্ধন।

সেদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইয়া গিয়াছে। ভাইয়ের প্রতি বোনের স্নেহ ভালবাসা দেখাইবার এইটী একটী বিশেষ দিন। ভাই বোনে যতই কেন বিবাদ থাকুনা, এই দিনে সে সমস্ত ভুলিয়া, ভাই বোনের আবার মিলন হয়; সে দৃশ্য বড় সুন্দর! এই দিনে, ভাই—বোনের দোষ ভুলিয়া যান, বোন—ভাইয়ের দোষ ভুলিয়া যান। ভাই বোনের ভালবাসা যেন এই দিনে আবার নূতন হইয়া উঠে। বোন এই দিনে, ভাইকে নূতন কাপড় পরাইয়া, মনের মতন করিয়া সাজাইয়া, ভাইয়ের মঙ্গল কামনায়, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেন; এবং কত ভাল ভাল খাবার জিনিষ তৈয়ায় করিয়া, ভাইকে খাওয়াইয়া কত সুখী হন। ভাইয়ের প্রতি এইদিন বোনের কত স্নেহ, কত আদর! আমাদিগের পাঠিকারাও বোধ হয় এই স্নেহ—এই আদর করিতে ত্রুটি করেন নাই; তাঁহারাও আপন আপন ভাইদিগকে এই দিনে নূতন কাপড়ে সাজাইয়া, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়া, ভাইকে ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াইয়া, কত সুখী হইয়াছেন। এ বড় সুখের জিনিষ,—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ভাই বোনের স্নেহের বড় সুন্দর চিত্র। এই উপলক্ষে ভাইয়ের প্রতি বোনের কতখানি স্নেহ—কতখানি ভালবাসা, তাহাই দেখান হয়, ভাইও বোনের গভীর স্নেহ—গভীর ভালবাসা বুঝিতে পারেন।

আমাদের দেশে যেমন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, রাজপুতনায় তেমনি একটী প্রথা চলিত আছে,—সেটীর নাম "রাখি-বন্ধন।" কোন সময় এবং কি প্রকারে এই প্রথাটী প্রথম প্রচলিত হয়, তাহা জানা যায় না; কিন্তু আমাদিগের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ন্যায় এটীও একটী বড় সুন্দর প্রথা। বসন্তকালে রাখি-উৎসব হইয়া থাকে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সহিত ইহার একটু প্রভেদ আছে; ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে কেবল ভাইকে লইয়া সম্বন্ধ; কিন্তু রাখি-বন্ধন তাহা নহে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ভাইয়ের প্রতি বোনের যে স্নেহ ভালবাসা, তাহাই দেখান হয়; কিন্তু রাখি-বন্ধন শুধু তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বসন্তকালে, এই উৎসব হইয়া থাকে। এই সময়ে রাজপুত মহিলাগণ, যাহাকে ইচ্ছা রাখি-বলয় পাঠাইয়া, ভ্রাতৃত্বে বরণ করেন। আবশ্যক হইলে অন্য সময়ও রাখি প্রেরণের রীতি আছে। যুদ্ধ বিগ্রহের সময়, অথবা অন্য কোন বিপদের সময় রাজপুত মহিলাগণ সহায্যের জন্য যাহার

নিকট ইচ্ছা রাখি প্রেরণ করিতেন; যাঁহার নিকট এই রাখি পাঠান হইত শত্রুতা থাকিলেও তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মভগ্নীর সাহায্যের জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতেন। এই রাখি-বলয় প্রস্তুত করিবার বিশেষ কোন নিয়ম নাই; অবস্থানুসারে কেহ বা স্বর্ণ রত্নদ্বারা এই বলয় প্রস্তুত করিয়া থাকেন,—কেহ বা সামান্য পশমের ডোর, রাখি-বলয় স্বরূপ আপন আপন ধর্ম্মভ্রাতাদিগকে দিয়া থাকেন। সামান্য পশমের হইলেও সুখের যেন তুলনা নাই; ভাই বোনের এই রাখি-বলয় বড় সম্মানের জিনিষ। রাজপুতগণ এবং সেই সময়ের মুসলমান রাজা ও সম্রাটগণও, এই রাখি-বলয় পাইবার জন্য লালায়িত হইতেন, এবং ইহাকে উচ্চপদ অথবা সাম্রাজ্যের ন্যায় মনে করিতেন। যাঁহারা এই বলয় পাইতেন, তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। রাজপুতদিগের মধ্যে কেবল মহিলা এবং ধর্ম্মযাজকগণই এই বলয় বিতরণ করিতে পারিতেন। কখন কখনও রাজপুত কুমারীগণও এই বলয় প্রেরণ করেন। রাখি-বলয় দিয়া যাঁহার সহিত এই পবিত্র ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়, তিনি "ধর্ম্মভ্রাতা" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি এবং বলয় পাইবামাত্র, ধর্ম্মভ্রাতা ধর্ম্মভগ্নীর মঙ্গলের জন্য, তাঁহাকে বিপদকালে রক্ষা করিবার জন্য, নিজ জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। রাজপুত নারীগণ এই বলয় প্রেরণ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা, এই পবিত্র ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে পারিতেন। মোগল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গির, সাজিহান, এবং আরঙ্গজীব পর্য্যন্তও এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। আরঙ্গজীব অত্যন্ত হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন, রাজপুতদিগের প্রতি অত্যন্ত কঠোর অত্যাচার করিতেন; কিন্তু তিনিও পরম আহ্লাদের সহিত উদয়পুরের রাজমাতার নিকট হইতে রাখি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরঙ্গজীব তাঁহাকে যে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে রাজমাতাকে "ধার্ম্মিকা ভগিনী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এই প্রথার মধ্যে একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মভ্রাতা ধর্ম্মভগিনীর জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেও, ধর্ম্মভগিনীর মুখ কখনও দেখিতে পান না। পূর্ব্বে দেখা সাক্ষাৎ থাকিলেও, এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার পর আর দেখা করিবার রীতি নাই। রাখি-বলয় প্রেরণের পর রাজপুত মহিলা আর ধর্ম্মভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন না; কিন্তু তবুও ইহার কি যে এক মোহিনি শক্তি, বড় বড় রাজা সম্রাটগণও ইহার জন্য লালায়িত হইতেন। যাহার সহিত সদ্ভাব আছে, এই রাখি-বলয় প্রেরণের পর সে সদ্ভাব আরও বাড়িত; যে শত্রু এই রাখি-বলয় প্রেরণের পর সে মিত্র হইত। বিপদের সময় রাজপুত মহিলাগণ শত্রুর নিকট এই বলয় পাঠাইতেন, এবং ইহার এমন শক্তি ছিল যে, যে ভয়ঙ্কর শত্রু সেও শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, এই পবিত্র ভ্রাতাভগ্নীর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইত; এবং ভগ্নীর মঙ্গলের জন্য, ভগ্নীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত।

রাখি-বলয়ের এ শক্তি সামান্য শক্তি নহে। কিন্তু এ কি কেবল সেই বলয়ের—কেবল সেই পশমের একটী সামান্য ডোরের শক্তি? এই সামান্য পশমের ডোরের শক্তিতেই কি শত্রু, মিত্র হয়, এবং যে শত্রু ছিল তাহার জন্যই আবার জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়!

না; তাহা নহে। এ স্নেহের শক্তি! এ পশমের ডোরের শক্তি নহে;—স্নেহের ডোরের শক্তি—ভ্রাতা ভগ্নীর পবিত্র সম্বন্ধের শক্তি! "রাখি-বন্ধন" এর পরিবর্ত্তে যদি ইহার নাম "স্নেহ-বন্ধন" হইত তাহা হইলেই উপযুক্ত হইত। যাহাদিগকে রাখি-বলয় দেওয়া হয়, তাহাদিগকে "রাখি-বন্ধন ভাই" বলিয়া থাকে; কিন্তু তাহা না বলিয়া "স্নেহ-বন্ধন ভাই" বলিলেই ঠিক হয়। স্নেহদ্বারা যে সকলকেই বশ করিতে পারা যায়; স্নেহদ্বারা যে শত্রুও মিত্র হয়, "রাখি-বন্ধন" তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। শত্রুতার পরিবর্ত্তে শত্রুতা করিও না, শত্রুতা বৃদ্ধি পাইবে। কঠিন কথার পরিবর্ত্তে কঠিন কথা বলিও না, প্রাণে অধিক ব্যথা পাইবে। যে শত্রুতা করিবে তাহাকে স্নেহ করিও, যে কঠিন কথা বলিবে, তাহাকে মিষ্ট কথা বলিও। একটী স্নেহের কথা—একটী মিষ্ট কথার অভাবে, কত সময় কত বিবাদ বিসম্বাদ হয়, কত মনোব্যথা, কত কষ্ট পাইতে হয়। অথচ একটী মিষ্ট কথা বলিতে আমাদের কিছুই আসে যায় না; আমাদের কিছুই খরচ হয় না;—কেবল একটী মুখের কথা; তাহাও আমরা অনেক সময় বলিতে চাই না। কত সময় কত জনকে আমরা কঠিন কথা বলিয়া কষ্ট দি! হৃদয়ের মধ্যে যে স্নেহ ভালবাসা আছে, তাহা হৃদয়ের মধ্যে রাখিবার জন্য নহে—তাহা অন্যের জন্য। অন্যকে যত সেই স্নেহ—সেই ভালবাসা দিতে পারিবে, ততই নিজে সুখী হইবে, অন্যেও সুখী হইবে। অন্যের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্যই মানুষের হৃদয়ে স্নেহ—ভালবাসা রহিয়াছে। অন্যের দুঃখ কষ্ট দূর করা, অন্যকে স্নেহ বিতরণ করা অপেক্ষা সুখ আর নাই। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে যেমন ভাই বোনের স্নেহ নূতন হইয়া উঠে, রাখি-বন্ধনে যেমন ভাই বোনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তেমনি কেন রাখি বন্ধনের ন্যায় স্নেহ বন্ধন দিয়া তোমরা সকলকে ভাই বলিয়া গ্রহণ কর না? কত দুঃখী কত অনাথ অসহায় রহিয়াছে, তাহাদিগকে কেন তোমরা স্নেহ বিতরণ কর না? ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে বোনের স্নেহে ভাই বশীভূত হয়; রাখি-বন্ধনে শত্রুও বশীভূত হয়; কিন্তু স্নেহ-বন্ধনে সমস্ত পৃথিবী বশীভূত হয়। এই স্নেহ হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না; অন্যকে সুখী করিবার জন্য—অন্যের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য, অন্যের চক্ষের জল মুছাইবার জন্য, কি তোমরা এই স্নেহ বিতরণ করিবে না?

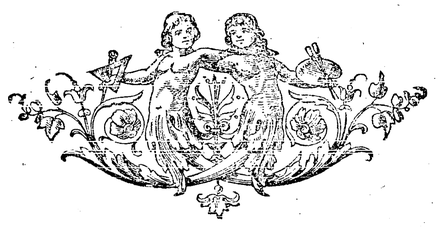

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব।

তোমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতে পড়িয়াছ যে, তিনি প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী করিতেন। তাহার পর কোন কারণ বশতঃ চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এ বহুদিনের কথা। এই সময়ে কি প্রকারে তিনি অজ্ঞাতসারে গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা বেশী লইয়া ছিলেন; এত বৎসর পর্য্যন্ত এ বিষয় তিনি কিছুই জানিতেন না। কয়েক দিন হইল "ইণ্ডিয়ান মিরর" নামক দৈনিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার ঐ সময়ের হিসাব পরীক্ষা করিতে করিতে দেখেন যে, গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা বেশী লইয়াছেন। যেই দেখিলেন অমনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট এই টাকা ফেরৎ দিবার জন্য চিঠি লিখিলেন। ডিরেক্টর সাহেব তাঁহার আপীসের খাতাপত্র, হিসাব পরীক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রের উত্তর দিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট কিছুই পাইবেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন; তাঁহার নিজের লিখিত জমা খরচে যখন দেনা রহিয়াছে তিনি তাহা অবশ্যই শোধ করিবেন। পুনরায় ডিরেক্টর সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন যে, যখন তাঁহার জমা খরচে অতিরিক্ত টাকা জমা আছে তখন এই টাকা না শোধ করিলে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। ডিরেক্টর সাহেব বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া তবে এই টাকা গ্রহণ করেন।

উপরে যে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিলাম তাহা আমাদের অনেকেরই নিকট এখন সেকেলে গল্প বলিয়া বোধ হয়। পরের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া দুই পয়সা লইবার ইচ্ছাই যখন দেশের লোকের মধ্যে প্রবল তখন এরূপ ঘটনা যে অত্যাশ্চর্য্য, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সত্যের প্রতি আদর, অর্থাৎ যাহা সত্য তাহা করিতেই হইবে, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, এই যাহার আছে তিনিই মহৎ। অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বড় লোক হওয়া অতি নীচ লোকের কর্ম্ম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক সদ্‌গুণের কথা তোমরা সখায় পড়িয়াছ, এই আর একটী গুণের কথা প্রকাশ করিলাম।

পরদেশ-পাখী।

ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে পক্ষী-জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও শান্ত স্বভাব। পক্ষীরা হিংস্রক নহে; যদিও মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইগলপক্ষী ছোট ছোট ছেলেদিগকে নিজের বাসস্থানে লইয়া যায়, কিন্তু বোধ হয় ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ন্যায় মানুষের প্রাণ বিনাশ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা ব্যতীত পক্ষীজাতির বিরুদ্ধে অন্য কোন গুরুতর অভিযোগ নাই। বরং অনেক সময়ে আমরা তাহাদের সুমিষ্ট স্বর শুনিয়া এবং সুন্দর আকৃতি দেখিয়া আনন্দ লাভ করি, এবং মনে মনে ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানারূপ সুন্দর সুন্দর পাখী আছে। যেখানে অসভ্য লোকের বাস, যে স্থানের লোকেরা সৌন্দর্য্য কি জানে না, সেখানেও জগদীশ্বর নানারূপ সুন্দর ও সুমিষ্ট-স্বরবিশিষ্ট পক্ষী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে

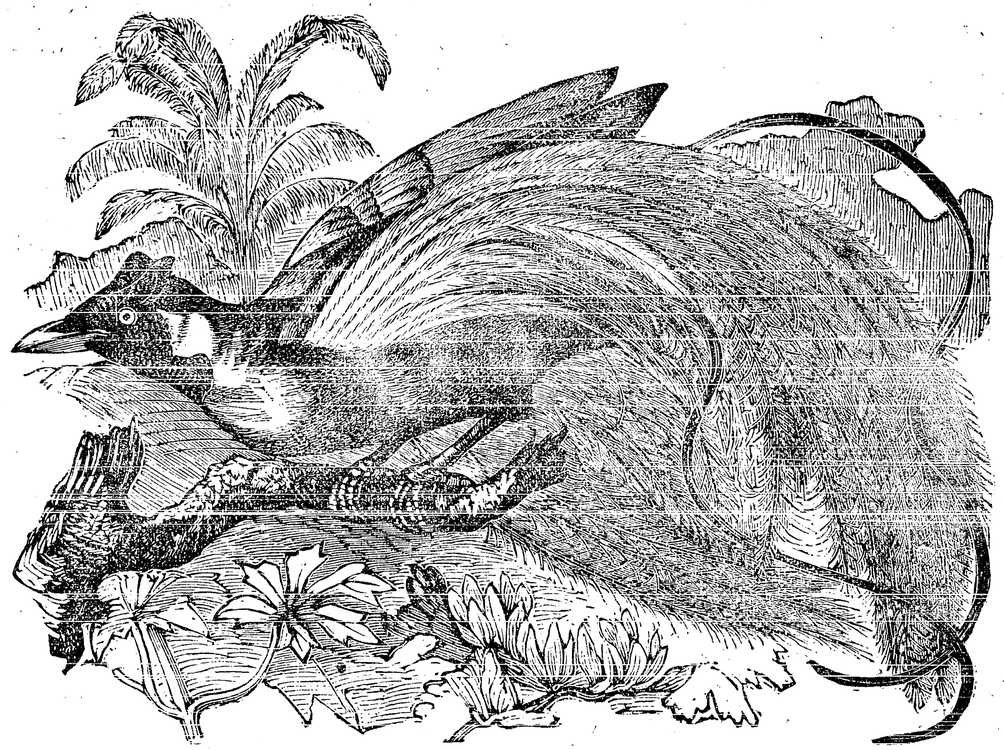

শিক্ষা করে নাই—সেখানেও তাঁহার সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। যতই ভ্রমণকারী পণ্ডিতেরা নানা স্থানে গমন করিতেছেন ততই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় জানা যাইতেছে। এখনও পৃথিবীতে কতস্থান ইহাঁদের অজ্ঞাত রহিয়াছে—কালে আরও কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইবে কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম যে অসভ্য দেশেও অতি সুন্দর সুন্দর পাখী আছে। নিউগিনি এবং মলক্কাস্ দ্বীপে ও তৎনিকটবর্ত্তী স্থানে এক প্রকার সুন্দর পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ময়ুর যেমন সুশোভিত ও সুন্দর ইহারা তদপেক্ষাও অধিক সুন্দর। ইহাদিগকে ইংরেজীতে Bird of Paradise বলে। আমরা ইহাকে বাঙ্গালায় "পরদেশ-পাখী" বলিব। * যখন ইউরোপীয় বণিকেরা সর্ব্বপ্রথমে লবঙ্গ ও জায়ফল প্রভৃতি সুস্বাদু এবং সুগন্ধি মশলার বাণিজ্যার্থে মলক্কাস্ দ্বীপে গমন করে তখন তাহারা ইহার শুষ্ক চর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হয় এবং ইহাকে "সূর্য্যলোক নিবাসী" এই আখ্যা প্রদান করে। তখন তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই পাখীর পালক ও পা নাই। ইহার পর একটী ওলন্দাজ পণ্ডিত লাটিন ভাষায় এসম্বন্ধে একটী

* সংস্কৃত ও বাঙ্গালা "পরদেশ" এবং ইংরাজী Paradise উভয় শব্দই একরূপ; উচ্চারণে যেমন সদৃশ, আদি অর্থেও সেইরূপ। অর্থ—স্বর্গ।

বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি ইহাদিগকে বর্ত্তমান নাম প্রদান করিয়াছেন। সেই হইতেই ইহারা "পরদেশ-পাখী" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত ৩৪ রকমের পরদেশ-পাখীর বিষয় জানা গিয়াছে; তন্মধ্যে কেবল এক প্রকারের চিত্র দেওয়া হইল। এই ৩৪ প্রকারের মধ্যে কাহারও শরীর প্রচুর ও মনোহর পালকে আবৃত; কাহারও বা ময়ূরের মত ২টী কাহারও বা ছয়টী চিত্রিত পালক এবং অন্য কাহারও বা তারের মত সূক্ষ্ম ও সুন্দর ১২টী পালকগুচ্ছ বাহির হইয়াছে।

এই বহুসংখ্যক বিভাগের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহাদের আকার ১৭।১৮ ইঞ্চি লম্বা। ইহাদের শরীর, পাখা এবং লেজ গাঢ় পিঙ্গল বর্ণে শোভিত। মাথার উপরিভাগ এবং গলদেশ পীত বর্ণের পালকে আবৃত। এই সকল পালক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, মসৃণ এবং মলমলের ন্যায় কোমল। নিম্ন ভাগের পালকগুলি খুব উজ্জ্বল ও সবুজ বর্ণ। ইহাদের শরীরের দুই পাশের পাখার নীচ হইতে দুইটী মনোহর পালক গুচ্ছ বহির্গত হয়। এই পালকগুচ্ছ লম্বায় প্রায় দুই ফিট হইয়া থাকে। ইহার রং সোণার ন্যায় উজ্জ্বল; পালকগুলি অতিশয় ঘন এবং কোমল। এইরূপ পালক গুচ্ছ কেবল বয়স্ক পুরুষ পাখীদিগের শরীরেই দৃষ্ট হয়। ছানাগুলির কিম্বা তাহাদের মাতার শরীরে এমন সুন্দর পালক নাই। এইখানে আমাদের সঙ্গে ইহাদের সম্পূর্ণ অমিল। মানুষের মধ্যে যুবক যুবতীরাই বেশ ভূষা করিতে অধিক অনুরক্ত এবং বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরাই অলঙ্কারে সজ্জিত হইতে আরও বেশী ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া চলেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেরূপ নহে। ইহা শুনিয়া অনেক অলঙ্কার প্রিয় পাঠিকারা লজ্জিত হইবেন সন্দেহ নাই।

আর আর পাখীদের ন্যায় ইহারাও পালক বদলাইয়া থাকে। তৃতীয়বার পরিবর্ত্তনের সময় এইরূপ সুন্দর পালকগুচ্ছ বহির্গত হয়। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে, কেবল সন্তানোৎপাদনের সময়েই এইরূপ সুন্দর পালক হইয়া থাকে; কিন্তু ওয়ালেস সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সে বিশ্বাস ভুল। কেবল মাত্র পরিবর্ত্তনের অল্প সময় ভিন্ন সমুদয় বৎসরই এই পালক গুচ্ছ শোভা পায়।

ইহারা খুব কর্ম্মক্ষম এবং পরিশ্রমী। এই শ্রেণীর পরদেশ-পাখী সর্ব্বদাই প্রায় ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহারা অনেকগুলি একত্রে বাস করে। ইহাদের স্বাভাবিক ডাক "ওয়াক্ ওয়াক্ ওয়াক্ অক্ অক্ অক্।" এই শব্দ শুনিয়া দ্বীপ বাসীরা ইহাদিগকে শীকার করিয়া থাকে। পুরুষ পাখী অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

পরদেশ পাখীর কিঞ্চিৎ পেটুকত্ব দোষ আছে; ফল এবং পোকাই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা ছোট ছোট ডুমুর খাইতে খুব ভাল বাসে।

অন্যান্য পাখী ও ইহাদের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষিত হয়। ইহাদের ডিম কখনও দেখা যায় নাই। ইহারা কিরূপে বাসা নির্ম্মাণ করে এবং কি ভাবেই বা সন্তান প্রসব করে ইহা এপর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই। অনেকের বিশ্বাস, ইহারা ডিম প্রসব করে না।

যদিও গ্রীষ্ম প্রধান দেশ ইহাদের জন্মস্থান, শীতপ্রধান দেশেও ইহারা বাস করিতে পারে। ওয়ালেস্ সাহেব যখন ইংলণ্ডে যান তখন দুইটী পাখী তাঁহার সঙ্গে ছিল। ইহাদের মধ্যে একটী এক বৎসর এবং আর একটী দুই বৎসর বাঁচিয়া ছিল। ওয়ালেস্ সাহেব বলেন যে, যদি ইহারা

প্রশস্ত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারে তবে শীত-প্রধান দেশেও ইহাদের দীর্ঘকাল বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে।

জোনাকীর বক্তৃতা।

১

সন্ধ্যাকালে সুমধুর স্বরে
পাখী এক, গাছের উপরে
বসিয়া করিছে গান, আনন্দেতে পূর্ণ প্রাণ;
ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন পাখী গিয়েছে ভুলিয়া
আছে সুধু গানেতে ডুবিয়া।

২

(কিন্তু হায় বিধির নিয়ম!
এভাবে কাটিবে কতক্ষণ?)
করিতে করিতে গান, করে পাখী অনুমান
'সুধু গানে তৃপ্ত নহে উদর তাহার
প্রয়োজন কিঞ্চিৎ আহার।'

৩

সর্ব্বনাশ! এই রাত্রিকালে
আহার এখন কোথা মেলে?
মনে ভাবে পাখী "হায়! ভগবান একি দায়,
কেন এ উদরজ্বালা করিলে সৃজন?
কোথা করি খাদ্য অন্বেষণ?"

৪

গান তার থেমে গেল হায়!
সকাতরে চারিদিকে চায়
অবশেষে থাকি থাকি, সবিস্ময়ে দেখে পাখী
কি যেন পাতার মাঝে করে ঝলমল
বুঝিল সে "জোনাকীর দল।"

৫

মনে ভাবে "ধন্য ভগবান!
হলো আজ ক্ষুধার নির্ব্বাণ।"
জোনাকীরা মনে মনে, বিষম প্রমাদ গণে;
সাহসে করিয়া ভর তবে একজন
পক্ষী প্রতি বলিল তখন—

৬

"সবে মোরা ঈশ্বর সন্তান
ছোট বড় সকলি সমান
তাঁহারি আদেশ ভরে, তুমি সুমধুর স্বরে,
গান করি তুষিতেছ সবাকার প্রাণ
আমরাও আলো করি দান।

৭

"তবে কেন বল অকারণে
আমাদের বধিবে পরাণে?
এ আধাঁর রাত্রি কালে, পরস্পরে যদি মিলে
তুমি সুখে গান কর, আমি অলো ধরি,
কি সুন্দর হইবে শর্ব্বরী!"

৮

পরামর্শে সায় হলো তার
অন্য কোথা মিলিল আহার।
এই ভাবে পরস্পরে, মিলে সবে কাজ করে,
কি সুখের হয় তবে পৃথিবী মণ্ডল!
থাকে না বিরোধ কোলাহল।

আলেয়া।

নেক দিনের কথা। মামার বাড়ীতে এক দিন সন্ধ্যার সময় দুই একটী ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে নদীর ধারে বসিয়া আছি; কুল্ কুল্ করিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে তাহাই শুনিতেছি; আকাশে একটী একটী করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিতেছে, আর একটী একটী ফুলের নাম লইতেছি; আর— তখন বয়স অল্প, মনে কোন চিন্তা ছিল না, দুঃখ ছিল না, শোক ছিল না,— প্রাণ খুলিয়া কত কি গল্প করিতেছি, আবশ্যক না হইলেও কথা বলিতেছি, বিনা কারণেও কত বার হো হো করিয়া খুব হাসিয়া উঠিতেছি; এমন সময় দেখিলাম, নদীর অপর পারে হঠাৎ একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তখনই আবার নিভিয়া গেল; আবার জ্বলিয়া উঠিল, আবার নিভিয়া গেল, এমনিতর ৩।৪ বার জ্বলিল, আবার নিভিল। যেখানে এই প্রকার আগুন জ্বলিতেছিল, সে স্থানটা একটু ভিজে স্যাঁৎ স্যাঁতে মাঠের মত; একটু পরে দেখিলাম সেই আগুনটা আবার জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই সমস্ত মাঠটা যেন দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। দেখিয়া ত আমার বড়ই ভয় হইল; তার আগের দিন দিদিমার কাছে যে ভূতের গল্প শুনিয়া ছিলাম, আমার ত সেই সকল মনে পড়িতে লাগিল। গল্প বন্ধ হইল, হাসি থামিয়া গেল; ভাবিলাম আজ যদি নিরাপদে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারি, তবে আর সন্ধ্যার সময় কোথাও যাইব না। সে কথা যাক্, আমাদের মধ্যে এক জন বলিল, "ও ভূত নয়, আমি জানি—ওটা আলেয়া।" আলেয়া শুনিয়া একটু সাহস হইল বটে, কিন্তু ভয় গেল না; কোনমতে মনকে প্রবোধ দিয়া সে দিন বাড়ী ফিরিলাম, বুকের মধ্যে দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল, পিছনের দিকে আর ফিরিয়া চাহিতে সাহস হইল না।

আলেয়া সম্বন্ধে কত অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আলেয়া যে প্রকার জিনিষ তাহাতে ইহা দেখিয়া ভয় পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আলেয়া কি পদার্থ, ইহা যাহারা না জানে তাহারা যে ইহাকে ভূত বলিয়া মনে করিবে, তাহা অসম্ভব নয়। ঘোর সন্ধ্যার সময় বা অন্ধকার রাত্রিতে, একাকী মাঠের মধ্যে যাইবার সময়, কেহ কোথায় নাই, হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠিল, আবার নিভিয়া গেল, আবার জ্বলিয়া উঠিল, এবং হয়ত চারিদিকে সেই আগুনটা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কাহার না ভয় হয়? কোন প্রাণহীন পদার্থের দ্বারা যে এপ্রকার কাণ্ড হইতেছে, তাহা মনেই হয় না; মনে হয় যেন কোন একটা জীবিত শক্তিরই এ কার্য্য। এই আলেয়া মাঠের মধ্যে, একাকী পাইয়া অন্ধকারে কত পথিককে ভয় দেখাইয়াছে, কত হতভাগার প্রাণনাশ করিয়াছে! অথচ ইহা একটা চেতনাহীন, জীবনহীন পদার্থ, কোন শক্তিই ইহার নাই।

এই আলেয়া কি? আলেয়া আর কিছুই নহে; এক প্রকার বাষ্প ও বাতাসের সংযোগে ইহা উৎপন্ন হয়। জীব জন্তুর শরীর এবং বৃক্ষ লতা প্রভৃতি পচিলে, তাহা হইতে এক প্রকার বাষ্প উঠিতে থাকে; এই বাষ্পের এমন আশ্চর্য্য গুণ যে, ইহাতে বাতাস লাগিলেই, তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। সচরাচর জলাভূমি এবং শ্মশানেই রাত্রিকালে আলেয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ শ্মশানেই জীব জন্তু পচিয়া বাষ্প উঠিয়া থাকে, এবং

জলাভূমিতেই বৃক্ষ লতা পচিয়া বাষ্প উঠিয়া থাকে। আর শ্মশানে এবং নির্জ্জন জলাভূমিতে আলেয়া দেখা যায় বলিয়াই, লোকে এত ভয় পায়। আলেয়া অতিশয় চঞ্চল, ইহা এক মুহূর্ত্তও এক স্থানে ঠিক থাকে না। মাটি হইতে এক কি দেড় হাত উর্দ্ধে থাকিয়া চারিদিকে চলিয়া বেড়ায়। কখনও ইহার শিখা উপরের দিকে উঠিতে থাকে, কখনও বা আবার মাটির সহিত মিশিয়া যায়; কখনও হঠাৎ নিভিয়া গিয়া, আবার তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। কখনও দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কখনও আবার প্রদীপের শিখার ন্যায় ক্ষীণ হইয়া জ্বলিতে থাকে। ইহা জলে নিভে না; বৃষ্টির সময়ও আলেয়া দেখা গিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি আলেয়ার নিকট উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা সেখান হইতে সরিয়া যায়; ইহাতে লোকে আরও ভয় পায়। ইহার কারণ এই যে, মানুষ যখন চলিতে থাকে, তখন সেই চলার জন্য সেখানকার বায়ু কম্পিত হয়, বায়ু কম্পিত হইলে, আলেয়াও সেই সঙ্গে কম্পিত হইয়া সরিয়া যায়। পূর্ব্বে আলেয়া কি পদার্থ তাহা জানিতাম না, তাই ভয় পাইতাম, কিন্তু এখন আলেয়া দেখিলে, তাহা লইয়া খেলা করিতে ইচ্ছা হয়। প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহাদিগের প্রকৃতি জানিনা বলিয়া আমরা ভয় পাই, বা কাছে যাইতে সাহস করি না। কিন্তু প্রকৃতি জানিতে পারিলে আমরা তাহাদিগকে লইয়া খেলা করিতে পারি। যাহা অতি ভয়ঙ্কর জিনিষ, যাহার স্পর্শে হয়ত মানুষ মরিয়া যায়, প্রকৃতি জানিলে এমন ভয়ঙ্কর জিনিষকেও আমরা খেলার জিনিষ করিতে পারি। আকাশের বিদ্যুৎ ধরিয়া মানুষ নিজের কাজে লাগাইতেছে। যত বড় হইবে, যতই জ্ঞান বাড়িবে, ততই দেখিতে পাইবে যে, মানুষ বুদ্ধির বলে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর পদার্থ গুলিকে বশীভূত করিয়া, কেমন করিয়া নিজের কাজে লাগাইতেছে,—ভয়ঙ্কর জিনিষ গুলিকে খেলার জিনিষ করিয়া তুলিয়াছে! বিজ্ঞানের সে সকল রহস্য, অবসর মতে তোমাদিগকেও উপহার দিতে বাসনা রহিল।

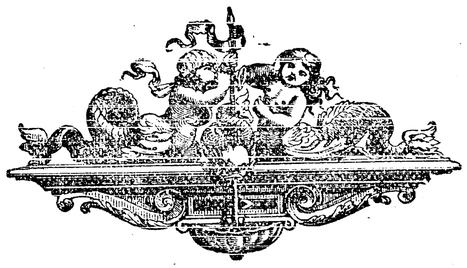

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। শূন্য—0।

নূতন।

১। ত্রিভুবনে খুজে যার দেখা কোথা নাই,
খুজিলে আপন মনে তখনি ত পাই।
হস্ত পদ নাই; কিন্তু নহে নিরাকার।
যা ভেবেছ তাহা নয়; করহ বিচার।

২। পাখা মোর নাই শূন্যেতে বেড়াই
ভূমণ্ডলে আমি পূজিত সদাই,
সূর্য্যের কৃপায় জনম আমার,
কিন্তু মম কাছে পরাজয় তার।
মম কৃপা বিনা অন্ন মেলা ভার
পার কি বলিতে কি নাম আমার?

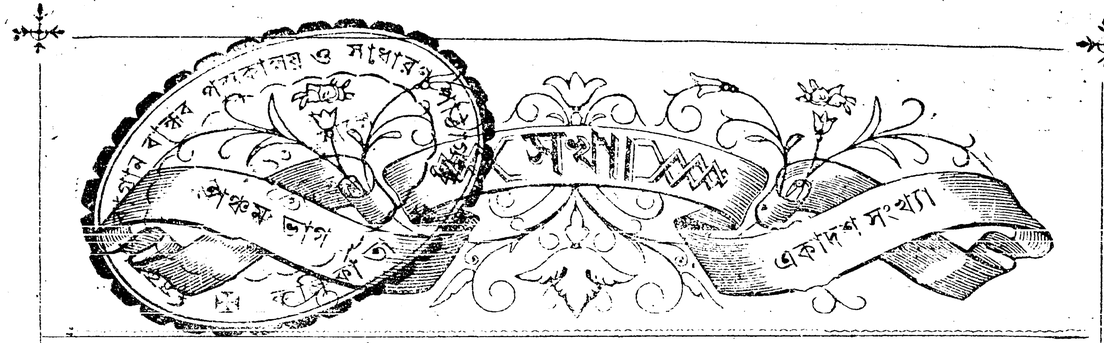

নভেম্বর, ১৮৮৭।

গ্রান্‌ভিল সার্প।

ঠিক একটী অতি সামান্য ঘটনায় কত সময় কত মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়, পর পৃষ্ঠার চিত্রটী তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই প্রকার সামান্য ঘটনা হয়ত প্রতিদিনই আমাদের চক্ষে পড়িতেছে; আমরা কিন্তু তাহা দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু এক এক জন এমন লোক আছেন, যাঁহাদিগের হৃদয় এই সকল এক একটী অতি সামান্য ঘটনায় অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠে;—এক একটী অতি সামান্য ঘটনায় তাঁহাদিগের জীবনে কত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, কত মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। জগতে যত বড় বড় কাজ, তাহা ইহাঁদিগের দ্বারাই হইয়াছে। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই আবার সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। অনেকের বিশ্বাস যাহার ধন সম্পত্তি নাই, সহায় সম্পদ নাই, উচ্চপদ নাই, তাহার দ্বারা কোন বড় কাজ হইতে পারে না। এই সংস্কার অনেকের উন্নতির পথের বিঘ্ন। আমরা দেখিয়াছি, জগতের অনেক মহৎ কাজের সূত্রপাত সামান্য অবস্থার লোকদিগের দ্বারাই হইয়াছে। আজ আমরা যাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিব, তাঁহার জীবন ইহারই একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহাত্মা গ্রান্‌ভিল সার্প সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, কি এক মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, আমরা আজ তাহাই দেখাইব।

গ্রান্‌ভিল সার্প ধনীর সন্তান ছিলেন না। তাঁহার পিতামহ এবং পিতা উভয়েই ধর্ম্ম যাজক ছিলেন। ইহাঁদিগের ধন সম্পত্তি ছিল না; কিন্তু চরিত্র, ধর্ম্মভাব, দয়া, পরোপকার প্রভৃতির জন্য ইহাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন। সার্প টাকা কড়ি না পাইলেও, পিতা পিতামহের এই সকল সদ্‌গুণের—এই সকল অমূল্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে উপযুক্তরূপ লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই; সুতরাং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে অতি সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। যে দাসত্ব প্রথা উন্মূলিত করিয়া, ক্লার্কসন্, উইলবারফোর্স, বাক্সটন্, ব্রুহাম প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, দরিদ্র সন্তান সার্পই তাঁহাদিগের পথ প্রদর্শক। গ্রান্‌ভিল সার্প সেই সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াই, এই মহৎ কার্য্যের প্রথম সূত্রপাত করেন।

সার্প পনের বৎসর বয়সের সময় একজন বস্ত্র ব্যবসায়ীর নিকট শিক্ষা নবিশ নিযুক্ত হন। তার পর একটা কাপড়ের কলে কিছুদিন কাজ করেন। কিন্তু সে কাজ ভাল না লাগায় অল্পদিন পরেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্টের কোন আফিসে

কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সামান্য কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সার্প কি প্রকারে এমন একটা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়ে অসাধারণ সহিষ্ণুতা ছিল। একদিন এক ব্যক্তির সহিত সার্পের তর্ক হয়, তাহাতে সেই ব্যক্তি বলেন, যে গ্রীক ভাষা না জানাতে তিনি বাইবেলের কোনও কোন অংশ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। সার্প আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; সেই মুহূর্ত্তে গ্রীক ভাষা শিখিবার জন্য মনস্থ করিলেন, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই গ্রীক এক প্রকার আয়ত্ব করিয়া লইলেন। একজন ইহুদীর সহিত তাঁহার এই প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক হওয়াতে, হুব্রুহ হিব্রু ভাষা তাহাতে শিখিতে হয়।

সার্পের জীবনী পড়িলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের উপর প্রেম, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত অধিক ছিল। এবং ইহা ছিল বলিয়াই তিনি অতি সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও এত বড় কাজের অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছিলেন। ১৭৬৫ সালে একটী ঘটনা হয়; দাসত্ব প্রথার ইতিহাসে সেইটী বিশেষ দিন। গ্রান্‌ভিল সার্পের ভ্রাতা উইলিয়ম সার্প অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন; তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিনা ব্যয়ে দরিদ্রদিগকে চিকিৎসা করিতেন। সার্প একদিন দেখিলেন যে, একজন লোক লাঠির

উপর ভর করিয়া কোনমতে সেই চিকিৎসালয়ের দিকে যাইতেছে। রোগে তাহার শরীর শীর্ণ হইয়াছে, চলিবার শক্তি নাই, দৃষ্টিশক্তিও এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। ইহার রোগজীর্ণ শরীর, ইহার মলিন মুখ এবং দুরবস্থা দেখিয়া সার্প হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন। এই হতভাগ্যের ক্লেশ ও যন্ত্রণা দেখিয়া সার্প আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে উইলিয়মের চিকিৎসালয়ে লইয়া গেলেন, এবং অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। সার্প বলিলেন যে, সে ব্যক্তির নাম জোনাথান ষ্ট্রঙ্গ; জোনাথান আফ্রিকা দেশবাসী। একজন উকীল তাহাকে ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া আসিয়াছে। কঠিন পরিশ্রম, অনাহার এবং তাহার প্রভুর অত্যাচারে, সে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন কার্য্য করিবার শক্তি ছিল, ততদিন প্রভুর বাড়ীতেই ছিল; এখন কর্ম্ম করিতে অক্ষম দেখিয়া তাহার প্রভু তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। জোনাথান পথের ভিখারী হইয়াছে; তাহার মাথা রাখিবার স্থানটী নাই। কিন্তু কঠিনহৃদয় মানুষ এই অসময়ে তাহাকে পথের ভিখারী করিলেও, ঈশ্বর তাহার উপায় করিলেন। সার্প তাঁহার ভ্রাতার চিকিৎসালয়ে তাহাকে আশ্রয় দিয়া, যত্নের সহিত তাহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। উভয় ভ্রাতার যত্নে জোনাথান ক্রমে রোগমুক্ত হইতে লাগিল; এবং অল্পকাল মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। সার্প কিছুদিন তাহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া পরে একজন ডাক্তারের বাড়ীতে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। জোনাথান স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া সুখে দিনপাত করিতে লাগিল। জোনাথান এই কার্য্যে প্রায় দুই বৎসর নিযুক্ত ছিল; কিন্তু তাহার সে সুখ অধিক দিন রহিল না। একদিন পূর্ব্ব প্রভু দেখিলেন যে, জোনাথান রোগমুক্ত হইয়াছে; এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। জোনাথান এখন কর্ম্মক্ষম হইয়াছে দেখিয়া, তিনি তাহাকে পুনর্ব্বার পাইবার জন্য উৎসুক হইলেন; এবং যে ডাক্তারের গৃহে জোনাথান নিযুক্ত ছিল, তাঁহার নিকট এই বলিয়া ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলেন যে, তিনি জোনাথানকে যদি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিবেন। জোনাথান তাঁহার ক্রীতদাস, সুতরাং তাঁহারই সম্পত্তি, তাহাতে আর কাহারও অধিকার নাই। জোনাথানের প্রভু তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। জোনাথান মহা সঙ্কটে পড়িল। স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া সে সুখে দিন কাটাইতেছিল; আবার সেই অত্যাচার সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্যে পড়িতে হইবে, এই চিন্তায় তাহার হৃদয় শুকাইয়া গেল। একদিন জোনাথানের পূর্ব্ব প্রভু পুলিশের সাহায্যে তাহাকে হস্তগত করিয়া, ইংলণ্ড হইতে অন্য কোন স্থানে পাঠাইয়া দিবার জন্য গোপনে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; জোনাথান চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া সে এক উপায় স্থির করিল; জোনাথান গ্রান্‌ভিল সার্পের দয়া বিস্মৃত হয় নাই।

গ্রান্‌ভিল সার্পের দয়ায়ই যে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল, এবং তাঁহার অনুগ্রহেই যে, সে স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া সুখে দিন কাটাইতেছিল, তাহা জীবনে সে কখনও ভুলে নাই। সে জানিত সার্প অতিশয় দয়ালু—পরোপকারী; অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি সততই ব্যস্ত। জোনাথান তাঁহাকে এই সমস্ত কথা

জানাইবার জন্য, এক পত্র লিখিল। সার্প পত্র পাইয়াই, অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারিল না; কারারক্ষক সমস্তই অস্বীকার করিল। সার্পের ইহাতে অত্যন্ত সন্দেহ হইল; তখন তিনি নিজেই কারাধ্যক্ষের নিকট গেলেন। কারাধ্যক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিতে বাধ্য হইলেন। সার্প দেখিলেন কারাগারের মধ্যে জোনাথান পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। জোনাথানের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সার্পের হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনুমতি ভিন্ন ঐ ব্যক্তিকে যেন কাহারও হাতে না দেওয়া হয়; এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ যাইয়া, যাহারা রাজাজ্ঞা ব্যতীত জোনাথানকে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদিগের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রীতিমত মোকদ্দমা চলিল, এবং অবশেষে জোনাথান মুক্তিলাভ করিল। সার্প উৎফুল্ল হৃদয়ে, দর্পের সহিত জোনাথানের হাত ধরিয়া বিচারালয় হইতে বাহির হইলেন, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতেও সাহস করিল না।

কিন্তু এ ব্যাপার এই খানেই শেষ হয় নাই। জোনাথানের প্রভু তাহাকে পাইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং এই জন্য রাজদ্বারে মোকদ্দমারও বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু গ্রান্‌ভিল সার্পও তাহাতে ভীত হইলেন না। যতই নূতন নূতন বিপদ উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই যেন তাঁহার উৎসাহ, তাঁহার তেজ বাড়িতে লাগিল। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদের জন্য তিনি যে সংকল্প করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে তাহা হইতে বিচলিত করিতে পারিল না।

ইংলণ্ডের সেই সময়ের অবস্থা একবার চিন্তা করিলে, সার্পের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। No slave can breathe in England;—ইংলণ্ডে ক্রীতদাস থাকিতে পারিবে না, যে মুহূর্ত্তে একজন ক্রীতদাস ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্বাধীন হইবে; এ সকল কেবল কথার কথা ছিল। বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং পদস্থ ব্যক্তিরাও এই ঘৃণিত দাস ব্যবসায় অনুমোদন করিতেন। যাঁহারা আইনজ্ঞ তাঁহারাও ইহার পোষকতা করিতেন। তখন রীতিমত দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত; পলাতক দাসদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিলে, তাহার জন্য পুরস্কার দানের কথা বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত; এক কথায় মানুষকে পশুর ন্যায় দেখা হইত—পশুর ন্যায় মানুষকে লইয়া ব্যবসা করা হইত। এই হতভাগ্য দাসদিগের প্রতি যে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইত, কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার ইহাদিগের প্রতি হইত, তাহা ভাবিলেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। দাস প্রভুগণ ইহাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করিতেন না; ইহাদিগেরও যে রক্ত মাংসের শরীর—ইহাদিগেরও যে দুঃখ কষ্ট বোধ করিবার শক্তি আছে, তাহা তাঁহারা মনে করিতেন না; যতদিন কার্য্য করিবার শক্তি থাকিত, ততদিন প্রভুর গৃহে ইহারা স্থান পাইত; যখন রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত, তখন প্রভু গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেন; হতভাগারা বিনা চিকিৎসায় অনাহারে পথে পথে ফিরিয়া, অবশেষে জীবন হারাইত। সমস্ত ইংলণ্ডের লোক তখন এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের পোষকতা করিত। দাসদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য, সার্পকে একাকী সমস্ত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল;—যাঁহাদিগের ধন সম্পদ আছে, বুদ্ধি বিদ্যা আছে, উচ্চপদ আছে, তাঁহারা কেহই এ

কার্য্যে প্রথমে সার্পের সহায় হন নাই। বরং তাঁহারা সার্পের বিপক্ষে ছিলেন; গ্রান্‌ভিল্ সামান্য কেরাণী হইয়াও, একাকী ইহাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন; ইহা কি সামান্য সাহসের কথা?

সার্প আত্মরক্ষার জন্য যে সমস্ত আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ লইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সার্পকে একার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিলেন। এক জন ক্রীত দাস ইংলণ্ডে আসিলেই যে স্বাধীন হইল, এ বিষয়ে তাঁহারা ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্প আর উপায় না দেখিয়া নিজেই আইন পড়িতে সংকল্প করিলেন। এবং ক্রমাগত দুই বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার জন্য সার্প দিনের মধ্যে বেশী সময় দিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাকে এই দুই বৎসরকাল আইন পড়িবার জন্য খুব অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। এই দুরূহ কার্য্যে তাঁহাকে উপদেশ বা সাহায্য করে, এমন এক জন লোকও ছিল না। দুই বৎসরের কঠিন পরিশ্রমের পর তাঁহার চেষ্টার ফল ফলিল। সার্প ইংলণ্ডের আইন তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন; কোথাও দাস ব্যবসায়ের পরিপোষক কথা পান নাই। বরং ইংলণ্ডে দাস প্রথা চলিতে পারে না, ইহারই প্রমাণ পাইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, যে কার্য্যের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল দেখিয়া তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "ঈশ্বর ধন্য হউন, আমি ইংলণ্ডের আইন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম দাস ব্যবসায়ের পারিপোষক কথা ইহার কোন স্থানেই নাই।" সার্প অনুসন্ধান করিয়া যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অল্পদিন পরেই তাহা পুস্তকাকারে হাতে লিখিয়া সেই সময়ের বড় বড় আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট পাঠাইলেন। ১৭৬৯ সালে তাহা মুদ্রিত হয়; যখন মুদ্রিত হয় নাই, সার্প হাতে লিখিয়াই বিতরণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় অর্থাভাবই তাহার কারণ। ইহাদ্বারা আশ্চর্য্য ফল ফলিল;—ইংলণ্ডের লোকের এত দিনের মত ইহাদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইল। জোনাথানের প্রভু আর মোকদ্দমা করিতে সাহস করিলেন না; এবং অবশেষে মোকদ্দমা উপস্থিত না করার দরুণ তিন গুণ খরচ দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। জোনাথান দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া চিরজীবনের জন্য স্বাধীনতা পাইল।

কিন্তু এপর্য্যন্তও বিচারালয় হইতে এই দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে একটী স্থির মীমাংসা হয় নাই। সার্প দেখিলেন বিচারালয় হইতে ইহার একটা স্থির মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। এমন সময়ে জেম্‌স সমারসেট নামক আর এক জন ক্রীত দাসকে লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। তখনকার ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি লর্ড মান্‌স্‌ফিল্ড গ্রনিভিল্ সার্পের মত ও পরামর্শ লইয়া এই মোকদ্দমায়ই দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন, সংকল্প করিলেন। ২৪ শে জানুয়ারী হইতে ২২ শে জুন পর্য্যন্ত, ছয় মাস কাল এই মোকদ্দমা চলিল। মোকদ্দমার বিশেষ বিবরণ এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক। অবশেষে ২২ শে জুন লর্ড মান্‌স্‌ফিল্ড এই মোকদ্দমার রায় দিলেন; এই মোকদ্দমা উপলক্ষে যে রায় দিলেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই প্রকাশ করিলেন যে, দাসত্ব প্রথা ইংলণ্ডে কখনই থাকিতে পারে না; এবং ইংলণ্ডের আইনের দ্বারা ইহা কখনই সমর্থন করা

যায় না। এই রায় প্রকাশিত হইলে সার্প লিখিতেছেন; "লর্ড মান্‌স্‌ফিল্ডের বিচারে এত দিন পরে আজ ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে ইংলণ্ডে দাস থাকিতে পারে না, যে মুহূর্ত্তে এক জন ক্রীত দাস ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্বাধীনতা লাভ করিবে।" জেম্‌স্ সমারসেট মুক্তি পাইল; সেই দিন হইতে দাসত্ব প্রথা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল; সার্পের ঐকান্তিক যত্ন এবং জীবন ব্যাপী চেষ্টার ফল ফলিল; এত দিনে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

সার্প এপর্য্যন্তও পূর্ব্বের সেই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার উপনিবেশ গুলির সহিত অন্যায় যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন দেখিয়া সার্প কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। গভর্ণমেণ্ট এপ্রকার অন্যায়—এপ্রকার অধর্ম্মের কার্য্যে লিপ্ত হইলেন দেখিয়া সে কার্য্যের সহিত আর কোন মতে সংস্রব রাখিতে পারিলেন না। এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি একবারে পথের ভিখারী হইলেন; কারণ দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তিনি এক বারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যায় অধর্ম্মের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা অনাহারে দিনপাত করা তিনি শ্রেয় মনে করিলেন।

ক্রমে গ্রান্‌ভিল সার্পের বয়স অধিক হইল; কিন্তু তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই। দয়া ও পরোপকার প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ে খুব অধিক ছিল, তিনি কি নিরস্ত থাকিতে পারেন? ইংলণ্ডে সেই সময় নাবিকের কার্য্য করিবার জন্য বলপূর্ব্বক লোকদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত; পার্লিয়ামেণ্টে যাহাতে ইহার বিরুদ্ধে নিয়ম হয়, সার্প তাহার জন্য ঐকান্তিক যত্ন করিতে লাগিলেন; এবং এসম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিলেন। ১৭৮৭ সালে নিগ্রো দাসত্ব উঠাইয়া দিবার জন্য এক সভা স্থাপন করিলেন। ব্রিটিশ এবং ফরেন বাইবেল সোসাইটীর সভার প্রথম সভাপতি হন। ১৮১৩ সালে পোপের অত্যাচার হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য এক সভা হয়, সার্প অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে যোগ দেন। কিন্তু সার্পের জীবনের প্রধান কার্য্য দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধন। ক্লার্কস্‌ন্, উইলবার ফোর্স, ক্রহাম প্রভৃতি তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিয়াছিলেন; তাঁহারই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাঁহারা এই ঘৃণিত দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের চেষ্টায় ১৮০৭ সালে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে দাস ব্যবসায় বে-আইনী বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডের যত দাস মুক্তি লাভ করিল। এ সকল সার্পেরই চেষ্টার ফল। ক্রমে সার্পের শেষদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল—তিনিও সংসার হইতে বিদায় লইলেন। ১৮১৩ সালে ১৬ই জুন বেলা চারিটার সময় তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, ধীরে ধীরে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, সেই নিদ্রাই তাঁহার চিরনিদ্রা হইল! রোগ যন্ত্রণা বা অন্য কোন শারীরিক ক্লেশ তাঁহাকে পাইতে হয় নাই। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি পরোপকার ব্রতে নিযুক্ত ছিলেন। গ্রান্‌ভিল সার্পের জীবনী আমরা শেষ করিলাম। সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও জগতে কত মহৎ কার্য্য করিতে পারা যায়, ইহাঁর জীবন তাহার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(প্রাপ্ত।)

বালক বালিকাদের হাসিমুখ!

তোমরা সকলেই আমাদের প্রিয় ভাই ভগিনী! তোমাদের মুখে সর্ব্বদা হাসি দেখিতে আমাদের বড়ই সাধ। তোমরা সুখে থাকিলেই তোমাদের হাসিমুখ আমরা দেখিতে পাইতে পারি এবং আমরাও সুখী হইতে পারি। বাড়ীর ছেলে মেয়েদের আনন্দ দেখিলে বাড়ীর সকলেরই আনন্দ হয়, সকলেরই কষ্ট দূরে যায়। তাই বলি প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! সুখে থাকিবার জন্য তোমাদের চেষ্টা করা উচিত। এইটুকু পড়িয়াই বুঝি কেহ মনে করিতেছ তবে সর্ব্বদাই বৃথা আমোদে কাটাইবে, খেলা করিবে, তবেই সুখী হইতে পারিবে। বাস্তবিকই কি তাহা হইলে সুখে থাকা যায়? একদিন সুধু আমোদে ও খেলায় কাটাইয়া দেখিও কেমন বোধ হয়। নিশ্চয়ই আমোদের সময় চলিয়া গেলে মনটা ভাল লাগিবে না, মনে হইবে সময়গুলি ভাল গেল না। কেহ হয়ত ভাবিতেছ "টাকা না হইলে সুখী হওয়া যায় না, আমাদের টাকা নাই আমরা কেমন করিয়া সুখী হইব?" তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি বাস্তবিকই কি তাই? তবে কত ধনীদের দেখিতে পাওয়া যায় যে, কত সময় গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, সর্ব্বদাই মনে দুশ্চিন্তা। অনেক সময় কৃষকদের দেখিয়া বলে "উহারাই সুখী"। তবে আর ধনে সুখ কোথায়? কিন্তু তোমরাই ভাবিয়া দেখত কোন্ দিনটা তোমাদের বেশ ভাল গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যেদিন স্কুলে বেশ পড়া দিতে পারিয়াছ যেদিন মাষ্টার মহাশয়ের প্রত্যেক প্রশ্নের ভাল উত্তর দিতে পারিয়াছ—যেদিন সমপাঠীদের সঙ্গে কিম্বা বাড়ীর কোন ছেলেপিলের সঙ্গে ঝগড়া কর নাই, সেই দিনটাই তুমি সুখে কাটাইয়াছ বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু যে দিন তোমার পড়া প্রস্তুত হয় নাই সে দিনকার কথা ভাবিয়া দেখত? সেদিন একেবারেই তোমার স্কুলে যাইতে ইচ্ছা হয় নাই—পিতা মাতার ভয়ে যাইতে হইলেও কত ভয়ে ভয়ে গিয়াছ—এবং স্কুলে যাইয়াও স্থির থাকিতে পার নাই—ভয়ে ভয়ে তখন তাড়াতাড়ি একবার পড়াটা দেখিবার চেষ্টা করিয়াছ—সময় অল্প এবং অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত দেখিয়াছ তাই পড়া কিছুই প্রস্তুত করিতে পার নাই—শিক্ষক মহাশয় আসিয়া মন্দ বলিয়াছেন, মনে কষ্টও পাইয়াছ। আবার দেখ যে দিন কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছ সে দিনটাও ভাল যায় নাই। যতক্ষণ রাগ ছিল ততক্ষণ কেবল প্রতিশোধ লইবার জন্যই ব্যস্ত ছিলে তাই মনটা একটুও স্থির ছিল না—আবার রাগ থামিয়া গেলে রাগ করিয়াছ বলিয়া মনে বড় কষ্ট পাইয়াছ। তবেই দেখিলে তোমাদের যাহা যাহা করা উচিত ও আবশ্যক তাহা যত অধিক যেদিন করিয়াছ সেইদিনই তুমি তত অধিক সুখী হইয়াছ। তাই বলি, প্রত্যহ স্কুলের পড়াটি ভাল করিয়া প্রস্তুত করিও, সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিও, বাড়ী আসিয়া মাকে বিরক্ত করিও না, কিন্তু ভাল জিনিষ পাইলে হিংসুক ছেলেটীর মত কেবল নিজে রাখিও না, অন্যান্য ভাই ভগিনীদের ভাগ করিয়া দিও, একটীও মিথ্যা কথা বলিও না, বৈকালবেলা একটু বেড়াইও কিম্বা খেলা করিও—তবেই দেখিবে মন এবং

শরীর কেমন ভাল থাকে। তাহা হইলেই দেখিবে সকলে তোমাদের কত ভাল বাসিবে। এইরূপে দিনটি কাটাইলে রাত্রিতে শুইতে যাইবার সময় আপনা আপনিই তোমার মন কেমন ভাল লাগিবে—মনে হইবে 'দিনটা কেমন ভাল গেল।' তবেই তোমাদের হাসিমুখ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইব—এবং সুন্দর সুন্দর সুগন্ধি ফুলগুলিকে যে দেখে সেই যেমন আদর করে তোমাদেরও আমরা তেমন করিব। ঈশ্বর করুণ সর্ব্বদা তোমাদের মুখে সরল হাসি ফুটিয়া থাকুক।

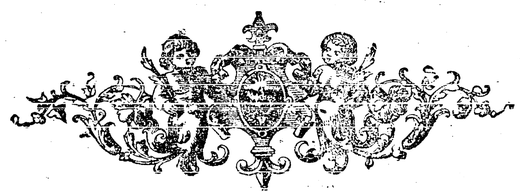

ঠগী।

ছেলেবেলা দিদিমার কাছে বর্গীর হাঙ্গামা এবং ঠগীদিগের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতাম। এই সকল গল্প—বিশেষতঃ ঠগীদিগের সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতাম, তাহাতে মনের মধ্যে কেমন একটা ভারি ভয় এবং বিস্ময়ের উদয় হইত। ঠগীদিগের বিষয় ভাল করিয়া জানিবার জন্য আমার একটা ভারি কৌতূহল ছিল। ঠগীদিগের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট এবং কর্ণেল সীম্যান প্রভৃতির গ্রন্থ পড়িলে কৌতূহল অনেকটা পরিতৃপ্ত হয়। আমার ন্যায় সখার পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যেও কাহারও কাহারও ঠগীদিগের বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল থাকিতে পারে তাই আমরা সংক্ষেপে ঠগীদিগের বিবরণ লিখিয়া সে কৌতূহল নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগ;—এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ঠগীদিগের ভীষণ অত্যাচার এবং প্রবল প্রতাপ ছিল। আজ ইংরাজ রাজত্বের প্রভাবে দস্যুভয় প্রভৃতি একপ্রকার নাই বলিলেই হয়, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের এ প্রকার অবস্থা ছিল না। দস্যুর অত্যাচারে, বর্গীর হাঙ্গামায় এবং ঠগীদিগের ষড়যন্ত্রে দেশের লোক সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। বর্গী ও ঠগীর নামে লোক কাঁপিয়া উঠিত। বর্গীর অত্যাচারে কত গ্রাম, জনপদ উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ঠগীর ষড়যন্ত্রে কত সহস্র সহস্র লোক জীবন হারাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্বে পথ ঘাট সকল এখনকার মত বিস্তৃত ও নিরাপদ ছিল না; বিদেশে যাতায়াত করিবার সুবিধা ছিল না, রেলের গাড়ীও ছিল না; অন্য কোন প্রকারের গাড়ী চলিতে পারে এমন পথও বেশী ছিল না। যে সকল পথ ছিল, তাহা প্রায়ই নিবিড় বন, দুর্গম পর্ব্বত বা জনশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে; সুতরাং সে সকল বন পথ যে কতদূর ভয় ও বিপদ জনক তাহা সহজেই বুঝা যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ বিদেশে যাইবার সময় বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিত। এখন রেলের গাড়ী হইয়াছে ছয় মাসের পথ এখন আমরা ছয় দিনে যাইতেছি, বিপদ ভয় আশঙ্কা কিছুই নাই। কিন্তু শুনিয়াছি সে কালে লোকে গয়া কাশী যাইতে হইলে বাড়ী হইতে চির বিদায় লইয়া বাহির হইত। গৃহে ফিরিবার আশা আর কেহ করিত না। দস্যুভয় বিশেষতঃ এই ঠগীদিগের ভয় তখন অত্যন্ত অধিক ছিল। নগর, গ্রাম, রাস্তা, ঘাট—এমন স্থান ছিল না, যেখানে ইহাদিগের সমাগম ছিল না। কর্ণেল সীম্যান বলেন

হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং কচ্ছ হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই ঠগীর প্রাদুর্ভাব ছিল; বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, রাজপুতনায় এবং বাঙ্গলা ও বেহারে ইহাদিগের প্রতাপ অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কেবল স্থলপথে, এবং বাঙ্গালায় স্থল ও জল উভয় স্থানেই ঠগীর ভয় ছিল। প্রতিদিন অনুমান চারি পাঁচ শত লোক ইহাদিগের হাতে জীবন হারাইত। দেশীয় রাজা বা মুসলমান সম্রাটগণ কেহই এই নৃশংস নরঘাতকদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। এমনও জানা যায় যে, কেহ কেহ ইহাদিগকে শাসন করা দূরে থাক, প্রশ্রয় দিতেন। আকবর দিল্লী ও আগ্রার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি ঠগী ধরিয়া প্রাণ দণ্ড করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ইহাদিগের অত্যাচার কিছুই কমে নাই। অবশেষে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সুশাসনে ঠগী সম্প্রদায় এক প্রকার নির্ম্মূল হইয়াছে।

ঠগী সম্প্রদায়ের একটী রীতিমত নিয়মবদ্ধ সমাজ ছিল; এই সমাজের কার্য্য প্রণালী নানাবিধ নিয়ম দ্বারা চালিত হইত। অনেকে অনুমান করেন ভারতে এই নরঘাতক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই; ভারতবর্ষের অপর পার্শ্বস্থ দেশ হইতে ইহারা ভারতে আসিয়াছে। নর হত্যা করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করাই এই সম্প্রদায়ের জীবনের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু লোকের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য ইহারা সাধারণ প্রজার ন্যায় জমীজমা লইয়া চাষ বাসও করিত; কিন্তু সে একটা উপলক্ষ মাত্র। ইহাতে তাহাদিগকে হঠাৎ কেহ কিছু বলিতে বা সন্দেহ করিতে পারিত না। আবার এই নৃশংস কার্য্য যে ইহারা কেবল উদরান্নের জন্য করিত তাহাও নহে; ইহাকে তাহারা ধর্ম্মকার্য্য এবং দেবীর আদেশ বলিয়া জানিত। যে কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সহিত যোগ থাকে, তাহা নির্ম্মূল করা বা দমন করা সহজ নয়, তাই ঠগীদিগের প্রতাপ এত বাড়িয়াছিল। ইহাদিগের উপাস্য দেবী করালবদনী কালী। এক এক দলে এক শতেরও অধিক, এবং কখনও কখনও চারি পাঁচ শত লোকও থাকিত; হিন্দু মুসলমান সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই ইহাতে থাকিত, এবং হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় ঠগই কালীর পূজা করিত; মুসলমান ঠগেরা অসঙ্কুচিত চিত্তে কালীর পূজা করিত এবং কালীকে ভক্তি করিত। ঠগী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা কালীর আদেশেই এই কার্য্য করিতেছে;—এবং এই ঘোর নৃশংস কার্য্যে দেবী তাহাদিগের সহায়। এক এক দলে এক শত হইতে তিন চারি শত পর্য্যন্ত লোক থাকিত। এই সকল দলের এক এক জন অধিপতি ছিল; দলের লোকেরা এই দলাধিপতির আজ্ঞানুসারে চলিত। সমস্ত দলের লোক একত্রে কখনও বাহির হইত না এবং প্রকাশ্যে কখনও দস্যুবৃত্তি বা লুণ্ঠন করিত না। কেহ কোন প্রকার সন্দেহ না করিতে পারে এই জন্য ইহারা ৬।৭ জন, কি ৪।৫ জন করিয়া এক একটী দল বাঁধিত, এবং স্বতন্ত্র ভাবে পথে চলিত। এক দলের সহিত যে আর এক দলের পরিচয় আছে, তাহা কেহ বুঝিতেও পারিত না। ইহারা এপ্রকার ভান করিত যে পরস্পর পরস্পরকে যেন কখনও দেখে নাই। এই প্রকারে ইহারা পথিকদিগের সঙ্গ লইত। প্রথমে শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক, একাকী দুর্গম জনশূন্য বনমধ্যে পথ চলিতেছে, এমন সময় দুই চারি জন সঙ্গী পাইলে তাহার কত আনন্দ, কত সাহস হয়! হতভাগ্য পথিকেরা সহায় মনে করিয়া ইহাদিগের আশ্রয় লইত এবং সঙ্গে চলিত;

কিন্তু অচিরেই এই নৃসংশদিগের হস্তে প্রাণ হারাইত।

বৎসরের মধ্যে সকল সময়েই ইহারা এ কার্য্যে লিপ্ত থাকিত না। বৎসরের মধ্যে একটা নির্দ্ধারিত সময়ে, শুভদিনে শুভক্ষণে আরাধ্যা দেবী কালীর পূজা দিয়া, দলপতির অধীনে গৃহ হইতে বহির্গত হয়। ধর্ম্মের নামে ইহারা কি ভয়ঙ্কর নৃশংস কার্য্যই করিত! বিদেশে বাহির হইবার পূর্ব্বে দৈবজ্ঞ ডাকিয়া, যাত্রার দিক এবং যাত্রার সময় স্থির করাইয়া লইয়া, রীতিমত চাউল পয়সা প্রভৃতি দক্ষিণা দিয়া দৈবজ্ঞকে বিদায় করিত। গণনা শেষ হইলে দলপতি ডানহাতে একটা জলপূর্ণ ঘটী এবং একখানি সাদা রুমালে, হলুদ, একটী তাম্র মুদ্রা, একটী রৌপ্য মুদ্রা এবং উৎসর্গ কুঠার বাঁধিয়া, বাম হাতে করিয়া বুকের উপর রাখিয়া, গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন সুবিধা জনক স্থানের উদ্দেশে চলিতে থাকে, দলের আর সকলেও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকে। উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, দৈবজ্ঞ কথিত দিকে মুখ ফিরাইয়া, এক মনে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া, দলপতি কালীর নিকটে মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে, এবং যে দিক এবং যে সময় তাহারা স্থির করিয়াছে, তাহা কালীর অনুমোদিত কি না, তাহা জানিবার জন্য প্রার্থনা করে। কালীর আদেশ যাহা বুঝিতে পারে, সেই অনুসারে ইহারা কার্য্য করিয়া থাকে। শুভচিহ্ন না দেখিলে ইহারা কখনও যাত্রা করে না। ছুতার, কুম্ভকার, তেলি, ফকির, খঞ্জ প্রভৃতি দেখিলে যাত্রা করে না। যাত্রাকালে ভিন্ন গ্রামের শব দেখিলে, আকাশ হইতে চিল্ শ্বেতবর্ণ বিষ্ঠা ত্যাগ করিলে, বা বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে শৃগাল গমন করিলে, অত্যন্ত শুভ ফল লাভ হয়। দলপতির হাতের জলপূর্ণ ঘটী পড়িয়া গেলে অত্যন্ত অমঙ্গল আশঙ্কা করে, ইহাতে সেই বৎসরই দলপতির মৃত্যু এবং সমস্ত দল ধরা পড়িবে এমন আশঙ্কা করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

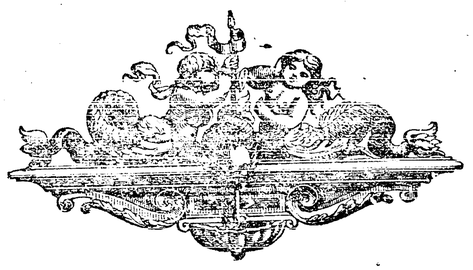

দুঃখিনীর দুঃখের কথা।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে—নগরের অনতিদূরে একটী বৃদ্ধা রমণী বাস করিতেন। একখানি ক্ষুদ্র কুটীর; তাহার সম্মুখস্থ ছোট বারাণ্ডায় বসিয়া প্রত্যহ সকালে বিকালে তাঁহাকে সুতা কাটিতে দেখা যাইত। সংসারে বৃদ্ধার কেহ ছিল না। আপনার ভরণ পোষণের ভার আপনাকেই বহন করিতে হইত। একটী প্রতিবেশী ভদ্রলোক দয়া করিয়া, এই ক্ষুদ্র কুটীরে তাঁহাকে বাস করিতে বলিয়াছিল; কিন্তু পরের উপর নির্ভর করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না; সামান্য কার্য্য হইতে যে যৎসামান্য আয় হইত তাহারই কিছু কুটীরের ভাড়া স্বরূপ দিতেন। ভদ্রলোকটী নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্তেও তাহা গ্রহণ না করিয়া পারিতেন না।

আর্থিক কষ্টই বৃদ্ধার একমাত্র কষ্ট নহে। তাঁহার একখানি পা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং অতি কষ্টে চলা ফেরা করিতে হইত। বাম হাত খানিও প্রায় সেইরূপ; কিন্তু সুতা কাটার ব্যাঘাত হইত না। এই দুঃখপূর্ণ জীবনের ইতিহাস অতিশয় কষ্টজনক। কিন্তু এত দুঃখেও বিধবা কখনও আপনার মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যান নাই; পরের দাসত্ব করা—পরের উপর নির্ভর করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। আর এক কথা—আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যাহারা সংসারে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে—স্বামী ও পুত্রশোকে অস্থির হয়—তাঁহারা দেবতার প্রতি অনর্থক দোষারোপ করে। কিন্তু ইহাঁর মুখ হইতে কখনও সে বিষয়ে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইষ্ট দেবতার পূজা করিতেন এবং শত দুঃখ কষ্ট হইলেও পরের গলগ্রহ হইতে ইচ্ছা করিতেন না।

আমরা অনেক সময়ে আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী মনে করি। মনে ভাবি এমন কষ্ট আর কাহারও নাই—এত দুঃখ যন্ত্রণা সংসারে আর কেহই ভোগ করে না। কিন্তু একথা কি ঠিক? যে আপনার ও আপনার পরিবারের সুখ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে না এবং পরের সুখ দুঃখের প্রতিও দৃষ্টি করিতে অবসর পায় সে কখনও একথা বলিতে পারে না। সংসারে কত শত দুঃখী ও হতভাগ্য আছে যাহারা আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী ও গরিবের অবস্থাকেও স্বর্গ সুখ বলিয়া মনে করে। কত লোক হয়তো এমন দুঃখ ও কষ্ট পাইতেছে যাহা আমরা কখন কল্পনাও করিতে পারি না।

এই বৃদ্ধা রমণীর জীবন তাহার এক দৃষ্টান্তস্থল। ইনি এক কৃষকের কন্যা। অল্প বয়য়েই কোন সৈনিকের সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হয়। এই সৈনিক আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করেন এবং ক্রমে আপনার চারি পুত্রকে সৈন্যদলে প্রবেশ করান। যখন স্বামী ও পুত্রগণ যুদ্ধে গমন করিত এই রমণীও তাহাদের সহিত যাইতেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আহত হইলে নিজ হাতে শুশ্রূষা করিতেন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্বামী ও পুত্রগণের সঙ্গে এক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। সে যুদ্ধে বিপক্ষেরা জয়লাভ করে। এই রমণী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে একটু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন; যখন একটী আহত সৈনিককে তাহার সঙ্গীরা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন তিনি আপনার স্বামী ও পুত্রগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা শুনিলেন তাহা অতিশয় কষ্টকর। তাহারা বলিল "আপনার কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত সকলেই পতিত হইয়াছে।" আর কেহ হইলে সেই খানে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িত কিন্তু ইনি তাহা করিলেন না। কেহ এখনও বাঁচিয়া আছে কি না—শুশ্রূষা দ্বারা এখনও কাহাকে বাঁচাইতে পারেন কি না দেখিতে চলিলেন।

এখন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ নাই। সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে। কেবল মৃত ও আহত দিগের দেহ সেখানে পড়িয়া আছে। লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া রমণী সেখানে আপনার পুত্র ও স্বামীর উদ্দেশ্যে চলিলেন। প্রথমেই দেখিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও আহত হইয়া পড়িয়াছে। এবং এখনও বাঁচিবার আশা আছে। তিনি পুত্রের নিকটে বসিয়া ক্ষতস্থান দেখিতেছেন এবং কি উপায়ে তাহাকে স্থানান্তরিত করিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়! এত দুঃখের মধ্যে এ সুখ টুকুও তাঁহার ভাগ্যে স্থায়ী হইল না। হঠাৎ দেখিলেন বিপক্ষের এক দল অশ্বারোহী বেগে সেই দিকে আসিতেছে। তখন তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে ইহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া আপনার শরীর দ্বারা আহত পুত্রকে আগুলিয়া রাখিলেন। অশ্বারোহীগণ দ্রুতপদে তাহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। এই আঘাতে তাঁহার একখানা হাত ও পা চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গেল এবং শরীরের অসংখ্য ক্ষত হইতে রক্তধারা পড়িতে লাগিল। মাতা, আহত সন্তান বুকে করিয়া, জ্ঞান-শূন্যা হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহার পরিচিত সৈনিকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং শিবিরে আনয়ন করে। তাহার পর ইনি হাসপাতালে থাকিয়া সুস্থ হন। নিয়ম আছে যে, সৈনিকদিগের বিধবা ও নিরাশ্রয় পরিবার গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পায়। কিন্তু ইহাঁর প্রতি গভর্ণমেণ্ট প্রসন্ন হইলেন না। ইনি বিরক্ত হইয়া আপনার বাসভূমিতে আসিলেন এবং পূর্ব্ব কথিত প্রকারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আছে কি না আর সে বিষয়ে খোঁজ হইল না।

যুদ্ধের পর বার বৎসর অতীত হইয়াছে। একদিন অপরাহ্ণে বিধবা বারাণ্ডায় বসিয়া সূতা কাটিতেছেন এমন সময়ে একটী খোড়া ভিক্ষুক অতিকষ্টে তাঁহার বারাণ্ডার নিকট আসিল। ভিক্ষুকটীর অতি শোচনীয় অবস্থা, অপরিষ্কার ও ছেড়া কাপড়; অনাহারে মুখ যেন কালিমাখা হইয়াছে। দেখিয়া বৃদ্ধার দয়া হইল। তাহাকে বারাণ্ডায় উঠিয়া বসিতে বলিয়া নিজের রাত্রির আহারের জন্য যাহা রাখিয়াছিলেন তাহা আনিয়া দিলেন। সৈনিক তাহা আহার করিল এবং বৃদ্ধার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে পাগলের ন্যায়ে "মা" বলিয়া বৃদ্ধার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং কান্দিতে লাগিল।

জীবনের শেষ অবস্থায় দুঃখিনী জননীর হতভাগ্য সন্তান ফিরিয়া আসিল। যাহা কোন দিন আশা করেন নাই বৃদ্ধা আজ সেই সুখ লাভ করিলেন এবং আকাশের দিকে হাত তুলিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সংগ্রহ।

সেদিন আমেরিকার এক স্থানে একটী আশ্চর্য্য উল্কা পতিত হইয়াছে। উল্কা পিণ্ডটী এখন ডাক্তার সেয়ারস্‌এর নিকট আছে। একদিন রাত্রি আটটার সময় ডাক্তার সেয়ারস্ একজন রোগীর বাড়ী হইতে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় এই উল্কাটী পতিত হয়। তিনি দেখিলেন, যে দীর্ঘপ্রস্থে চারি ইঞ্চি পরিমাণ একটী গর্ত্ত হইতে ভয়ঙ্কর ধূম উঠিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া, সাবল দিয়া সেই স্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাঁচ ফিট মাটির নীচে উল্কাটী দেখিতে পাইলেন। সচরাচর উল্কার আকার যে প্রকার থাকে, এটী সে প্রকার নয়। উল্কাটী সম্পূর্ণ গোলাকার, ইস্পাতের ন্যায় রং এবং মসৃণ। উল্কাটীর গায়ে, নানা প্রকার আকৃতি চিত্রিত আছে, এবং অনেক লেখাও আছে; কিন্তু কি ভাষায় লেখা তাহা জানা যায় নাই। কি ধাতুতে নির্ম্মিত তাহাও জানা যায় নাই—এক প্রকার নূতন ধাতু।

* * *

যে কাগজে সখা ছাপাইয়া প্রতিমাসে আমরা গ্রাহকদিগকে দিতেছি, বিজ্ঞানের উন্নতিতে এই কাগজে যে কত প্রকার জিনিষ তৈয়ার হইতেছে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সম্প্রতি কাগজের এক প্রকার বোতল তৈয়ার হইয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই তাহা এদেশে আসিবে। দরজা জানালায় লাগাইবার জন্য কাগজের সার্সি তৈয়ার হইয়াছে; এই সার্সি কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, অথচ কাচের মত এত সহজেই ভাঙ্গিবে না। বার্লিন নগরে একটী কাগজের ধর্ম্ম-মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা জানি কাগজে জল লাগিলেই, তাহা ছিঁড়িয়া যায়; কিন্তু বিজ্ঞান তাহারও পথ করিয়াছে; কাগজের ছোট জাহাজও প্রস্তুত হইয়াছে। আমেরিকায় কাগজের দ্বারা রেল গাড়ীর চাকা তৈয়ার করা হইয়াছে। এই বড় বড় কাজ ছাড়া, খুব সূক্ষ্ম কাজও হইয়াছে; ড্রেস্‌ডেন নগরে একজন ঘড়ীওয়ালা, কাগজের ঘড়ী (watch) প্রস্তুত করিয়াছে। আর বাকি কি? বুদ্ধিতে সব হয়।

* * *

প্রথমে একটা জিনিষ যে বাহির করে, তাহারই বাহাদুরী। খবরের কাগজ ত এখন দেশ ছাইয়াছে, তোমরা ঘরে বসিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খবর পাইতেছ; কিন্তু প্রথমে যাহার মাথায় এই খবরের কাগজ বাহির করিবার চিন্তা উঠিয়াছিল, সে ব্যক্তি সামান্য নয়। এই খবরের কাগজ প্রথমে একজন ফরাসী ডাক্তার বাহির করেন। তিনি দেখিলেন যে, যেখানে গিয়া তিনি কোন নূতন সংবাদ বা নূতন খবর বলেন, সেখানেই লোকে তাহা আগ্রহ করিয়া শুনে। ইহাতেই খবরের কাগজ বাহির করিবার চিন্তা তাঁহার মনে উঠে; এবং সেই হইতেই খবরের কাগজের প্রথম সৃষ্টি হয়।

* * *

ব্রহ্মদেশে অমরাপুর নগরে "বো" নামে একটী বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষটী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। খৃষ্টের জন্মের ২৮৮ বৎসর পূর্ব্বে এটী জন্মায়; সুতরাং এখন ইহার ২১৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছে। এই দুই হাজার বৎসরে, এই পৃথিবীতে কত কি ঘটনা, কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে!

* * *

শিক্ষা দিলে নীচ জন্তুদিগের দ্বারাও কত কাজ করাইয়া লওয়া যায়। কুকুরের দ্বারা গৃহস্থের কত কাজ হয়, তাহা আমরা প্রত্যহই দেখিয়া থাকি। একজন সাহেব মানুষের পরিবর্ত্তে বান্দরের দ্বারা পাখা টানাইতেন। যুদ্ধ প্রভৃতির সময় পায়রা দূতের কাজ করে, যেখানে হয়ত মানুষ পাঠাইবার সুবিধা নাই, এমন সকল স্থানে চিঠি পত্র লইয়া যায়। আবার এই পায়রাগুলির আশ্চর্য্য উড়িবার শক্তি আছে। আমেরিকায় ওহিও প্রদেশের ডেটন নগরে হইতে ফিলেডাল্‌ফিয়া পর্য্যন্ত, তিনটী পায়রা সম্প্রতি উড়িয়া গিয়াছিল, ডেটন হইতে ফিলেডাল্‌ফিয়া ৫০০ শত মাইল। আর একটা পায়রা ৩৪৩ মাইল, আট

ঘণ্টায় উড়িয়া গিয়াছিল,—ঘণ্টায় ৪২ মাইলেরও অধিক। নিউইয়র্কের কয়েকটী পায়রা ২৩৭ মিনিটে ২৪৫ মাইল গিয়াছিল, মিনিটে এক মাইলেরও বেশী। আমরা রেল গাড়ীতে চড়িয়া মনে করি খুব দ্রুত চলিতেছি; কিন্তু ইহার কাছে কোথায় রেলের গতি! যদি পায়রার মত পাখা থাকিত, আর উড়িতে পারিতাম, তবে কোথায় কোথায় উড়িয়া যাইতাম!

পলাতক পাখী।

(১)

প্রাণের পাখীটি মোর
স্নেহের পিঞ্জর ছাড়ি,
কোথায় গিয়েছে চলে
আর না আসিল ফিরি!

(২)

কত কাঁদি দিবা নিশি
কত ডাকি "আয় আয়"
কি জানি কোথায় গিয়ে
ভুলে সে রয়েছে হায়!

(৩)

সারাদিন আধ আধ
—"মা" "মা" বলে ডেকে ডেকে,
রেখে গেছে প্রাণে মোর
কতই মমতা মেখে।

(৪)

আগে যদি জানিতাম
পালাবে এমনি করে;
এত কি যতনে স্নেহে
পুষিতাম তবে তারে?

(১)

সেদিন সন্ধ্যার বেলা
পিঞ্জরে দেখিনু তায়—
ছুটে ছুটে চারি দিকে
যেন সে প'লাতে চায়।

(২)

কতই খাবার এনে
দিলেম আদর করে
খে'লো না "নলিনী" * কিছু
একধারে গেল স'রে।

(৩)

"নলিনী" "নলিনী" বলে
ডাকিলাম কত বার;
"মা" বলে তেমনি করে
সাড়া নাহি দিল আর!

* পাখীর আদরের নাম। এই নামে ডাকা হইত।

(৪)

জাগিনু নিশীথ কালে
পাখা শব্দ শুনি তার,
গিয়ে দেখি পাখী নাই
রয়েছে পিঞ্জর ছার!

(১)

বড়ই সাধের ছিলি
"নলিনী" পাখীটি মোর
কেমনে চলিয়ে গেলি?
কি কঠিন প্রাণ তোর!

(২)

রয়েছিস কোথা এবে
এসব মমতা ছেড়ে?
কে রেখেছে নলিনীরে!
এমন যতন করে?

(৩)

অথবা বনের পাখী
পুনরায় গিয়ে বনে
অনন্ত আকাশে উড়ি
গাইছ আপন মনে?

(৪)

এত স্নেহ ভালবাসা
পেয়েছিলি যার ঠাঁই
কিছু তার—নলিনীরে!—
কিছুই কি মনে নাই?

সাজি।

আমাদের পাড়ায় এক ঠান্‌দিদি ছিলেন। খোষামোদ রোগটা তাঁর বড় প্রবল ছিল। সত্য বলিয়া হউক, মিথ্যা বলিয়া হউক, যে প্রকারে হউক, অন্যকে খুসী করাই যেন তাঁর দৈনিক কাজ ছিল। আমাদর উপর তাঁর অনুগ্রহটা একটু বেশী ছিল,—আমাদিগকে তিনি একটু বেশী খোসামোদ করিতেন। তিনি দিন কত কোথায় গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, আমাদের বাড়ীতে একটী খোকা হইয়াছে, অমনি তাড়াতাড়ি করিয়া খোকা দেখিতে আসিলেন; তাড়াতাড়ি খোকার বিছানার কাছে যাইয়া,—না দেখিয়াই, বলিয়া উঠিলেন, "আহা যেন কার্ত্তিকটী।" খোকা কিন্তু সে বিছানায় ছিলওনা, আমাদের মিনি বেরাল খোকার স্থান অধিকার করিয়া শুইয়াছিল। ঠান্‌দিদির কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসির গোলে মিনি লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল; ঠানদিদি অপ্রস্তুত। অধিক খোসামোদ করিতে গেলেই এমনি হয়।

* * *

এখন খুব বড় বড় কলারওয়ালা জামার বড় ফ্যাসান উঠিয়াছে। আমাদের দোলগোবিন্দ বাবু সকলের উপর টেক্কা দিয়াছেন, তাঁর জামার কলার কাণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কোন ইংরেজ দোকানদার নাকি তাঁর কলারের পেছনদিকে দোকানের বিজ্ঞা

পন দিবার জন্য তাঁর কাছে পত্র লিখিয়াছিল। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া অপেক্ষা ইহাতে অধিক কাজ হইত।

* * *

বুল্ সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন—পেটের দায়ে। রেলওয়ে কোম্পানির বড় সাহেবের কাছে উমেদারী করিয়া মোটা মাহিনায় একটী বড় ষ্টেশনে ষ্টেশনমাষ্টারী পাইলেন। লেখা পড়া বিদ্যা বুদ্ধিতে বুল্ হস্তিমূর্খ। ষ্টেশনে লাল আলো দেখান হয় সকলেই জান। বুল্ সাহেব যাইয়াই শুনিলেন তেল নাই; তৎক্ষণাৎ হেড আফিসে টেলিগ্রাফ করিলেন যে, অবিলম্বে লাল তেল পাঠাইয়া দেয়।

* * *

আমাদের খোকা একজন তোতলাকে কথা বলিতে দেখিয়া তার বোন্‌কে বলিতেছিল, "দেখ দিদি আজ একটা লোক এসেছিল, সে এখনও কথা বল্‌তে শেখেনি অথচ কি বল্‌বার জন্য সে বেচারী কত চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো।" খোকা কখনও তোত্‌লা দেখেনি।

* * *

এক ব্যক্তি খুব টেরা ছিল; সে সময় দেখবার জন্য নিজের পকেট থেকে ঘড়ী বাহির করিতে যাইয়া, পাশের একজনের পকেট থেকে ঘড়ী তুলিয়াছিল। বেচারী বড় টেরা ছিল, অন্য কোন কু মৎলব বোধ হয় তার ছিল না। কিন্তু আদালতে তাহা শুনিল না, জরিমানা দিয়া শেষে সে খালাস পায়।

* * *

কোন এক স্কুলের শিক্ষক ছাত্রদিগকে গাধার বিষয় পড়াইতেছেন। ছেলেরা বড় অন্যমনস্ক; শিক্ষক বলিলেন "দেখ তোমরা যদি আমার দিকে মনোযোগের সহিত না তাকাও তবে গাধার বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞানই হইবে না।"

* * *

এক ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দেন যে,—যে ব্যক্তি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, তাহাকে আমি দশ সহস্র টাকা দিব। অবিলম্বে একজন লোক উপস্থিত হইয়া বলিল মহাশয়, আমি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, অতএব আপনার প্রতিশ্রুত দশ সহস্র টাকা আমাকে দান করুন। বিজ্ঞাপনদাতা বলিলেন—বাপু, তুমি যদি নিজের অবস্থায়ই সন্তুষ্ট হও তবে কেন এই দশ সহস্র টাকার জন্য আসিয়াছ!

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। "ম"।

২। (মেঘ)।

নূতন।

আপনার কিছু নাই পরের ভূষণে।
চিরদিন শোভা পাই জানে সর্ব্বজনে॥
তবুও সকলে মোরে সমাদর করে।
দেখিতে না পারি আমি শোভি যার তরে॥
পাষাণ হৃদয় মোর, তবু কবিগণ।
দেখিলে আমাকে হয় ভাবেতে মগন॥

ডিসেম্বর, ১৮৮৭।

ঠগী।

ঠগদিগের মধ্যে কয়েকটী পদবিভাগ ছিল। সর্ব্ব প্রধান পদ "সুবাদার।" এক একটী সুবাদারের অধীনে পাঁচ সাতটী দল থাকিত। যে সে লোকে সুবাদার হইতে পারিত না। সুবাদার হইতে হইলে ভদ্রলোকের মত দেখিতে হওয়া চাই, শরীরে বল থাকা চাই, ধীর বুদ্ধি, তর্ক করিবার শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এবং খুব বিচক্ষণতা থাকা চাই। পুলিশ কর্ম্মচারী প্রভৃতির সহিত আলাপ থাকা চাই। এক জন বিশিষ্ট ধনী এবং ভদ্র ব্যক্তি বলিয়া লোকে জানে, এমন লোকেই কেবল সুবাদার হইতে পারিত। সুবাদারের পর "জমাদার"; জমাদারেরও সুবাদারের মত অনেকগুলি গুণ থাকা চাই। জমাদারের পর "বক্‌শী।" যাহারা হত্যা কার্য্যে খুব পারদর্শী হইয়াছে তাহারাই কেবল বক্‌শী হইতে পারে। তার পর গুপ্তচর, গণক, গোরখননকারী, এবং সমাধি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নির্দ্দিষ্ট থাকিত। এই সকল লোক লইয়া এক একটী দল গঠিত হইত। এক এক কার্য্যের জন্য এক এক দল লোক নিযুক্ত থাকিত; ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঠগীদিগের কি প্রকার নিয়মবদ্ধ সমাজ ছিল। ঠগের সন্তানেরাই প্রায় ঠগ হইত; কিন্তু ঠগেরা গোষ্য পুত্র লইয়াও তাহাদিগকে এই নৃশংস ব্যবসা শিক্ষা দিত। দশ বার বৎসর বয়সেই বালকদিগকে এই নৃশংস কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিত। প্রথম তাহাদিগকে নরহত্যার কথা কিছুই জানিতে দেওয়া হইত না। এক জন বিজ্ঞ ঠগের নিকট প্রথমে এই সুকুমারমতি বালকদিগকে শিক্ষানবিশ রাখা হইত। প্রথমে খেলার দ্রব্য, ভাল ভাল খাবার দ্রব্য, এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি দিয়া, নানা প্রকারে তাহাকে ভুলাইয়া রাখা হইত। বালকের সেই সময় যাহা কিছু আবশ্যক, এই ব্যক্তির নিকটেই পাইত। চৌদ্দ পোনের বৎসর বয়সের সময় এই ভয়ানক কার্য্যের এক একটু তাহাকে দেখাইতে আরম্ভ করিত। ক্রমে অভ্যাসে এই সকল নৃশংস কার্য্যে বালকের কোমল হৃদয়ে আর ব্যথা লাগিত না; ক্রমে এই সকল কার্য্য তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইত; এবং ক্রমে নিজেই হত্যা করিবার জন্য তাহার উৎসাহ ও প্রবৃত্তি জন্মিত। তখন গুরুর অনুমতি লইয়া সে অন্যান্য ঠগদিগের সহায়তায় কোন পথিকের প্রাণ বধ করিয়া, গুরুকে প্রণামী দিত এবং একটী ভোজ দিত। গুরুও শিষ্যকে উপযুক্ত দেখিয়া ব্যবসা অবলম্বন করিতে অনুমতি দিতেন।

ঠগেরা কি প্রকারে হত্যাকার্য্য নির্ব্বাহ করিত

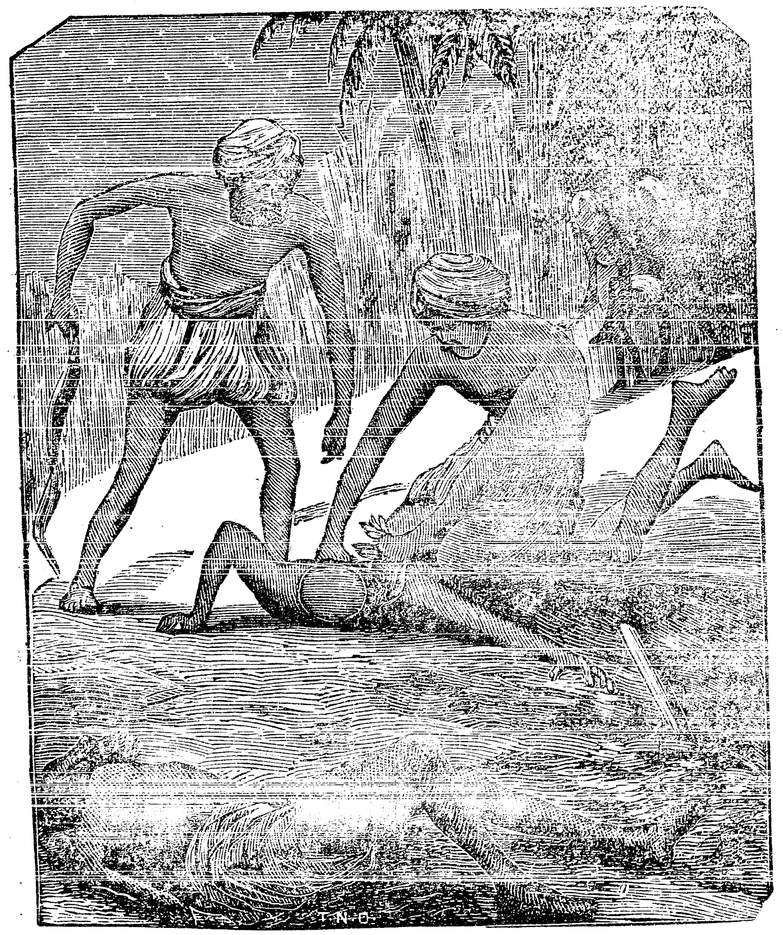

এক্ষণে তাহাই আমরা সংক্ষেপে বলিব। হত্যা-প্রণালী অতিশয় ভয়ানক, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। মানুষ হইয়া মানুষকে কি প্রকারে এ প্রকার নিষ্ঠুরকপে পশুর ন্যায় হত্যা করে, তাহা চিন্তা করাও কঠিন। প্রথমে কোন প্রকার অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা নিয়ম বহির্ভূত। প্রাণ না গেলে ইহারা অস্ত্র ব্যবহার করে না, বা পথিকের দ্রব্যাদি লয় না। এই হত্যা কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য, তাহারা রুমাল, ফাঁসযুক্ত দড়ি, ও চাদর ব্যবহার করিত। আমরা গতবারে উল্লেখ করিয়াছি যে, এক এক দলে প্রায় তিন চারি শত ঠগ থাকিত। যখন ইহারা বাহির হইত তখন ছোট ছোট দল করিয়া বাহির হইত। পথিক দেখিলেই ইহারা তাহাদিগের সঙ্গ লইত এবং আপনাদিগকেও পথিক বলিয়া পরিচয় দিত; পথ চলিতে চলিতে পথিকেরা কোথায় যাইবে, কোথা হইতে আসিতেছে, কথায় কথায় এই সমস্ত জানিয়া লইত। ইহারা একার্য্যে এমন চতুর ছিল যে, অনেক সময় পথিকদিগের টাকা কড়ির বিষয়ও ইহারা জানিয়া লইত। এমন ভাবে,

এমন চতুরতার সহিত ইহারা কথাবার্ত্তা বলিত, যে কেহ কোন সন্দেহই করিতে পারিত না। অবশেষে সুবিধা বুঝিয়া ইহারা হত্যার আয়োজন করিত। কোন বিপদজনক স্থানে ইহারা হত্যা করিত না। ইহাদিগের অনেকগুলি সাংকেতিক কথা আছে, অন্য লোক থাকিলে ইহারা সেই সকল সাংকেতিক কথা ব্যবহার করিত। হত্যারও সাংকেতিক কথা ছিল। এই সংকেত করিবামাত্র হতভাগ্য পথিকের পাশের একজন ঠগ তাহাকে একটু অন্যমনস্ক দেখিলেই, গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিত, এবং আর একজন সেই ফাঁসের একদিক ধরিয়া ক্রমশঃ টানিতে থাকিত। এইরূপে দুই দিক হইতে দুই জনে টানাতে, পথিকের মুখ মাটির দিকে ঝুকিয়া পড়িত এবং এই অবসরে আর একজন পিছন দিক হইতে আসিয়া সেই হতভাগ্যের দুই পা ধরিয়া টানিত, তাহাতে সেই হতভাগ্য পথিক তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া যাইত, এবং আর এক জন সেই সময় তাহার পিঠের উপর বসিয়া, ফাঁস জোরে টানিয়া ধরিয়া কার্য্য শেষ করিত। তখন মৃত পথিকের কাছে যাহা পাইত, সে সমস্ত সংগ্রহ করিত। হত্যা করিয়া ইহারা মৃতদেহ কখনই যেখানে সেখানে ফেলিয়া যাইত না। মৃতদেহ সমাধিস্ত করা দেবী ভবানীর আজ্ঞা এবং ইহারা জানিত যে এই প্রকারে মৃত দেহ যদি যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে তবে সহজে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা; এইজন্য মৃতদেহ গোর দিয়া রাখা ইহাদিগের একটী নিয়ম ছিল। এই গোর গোলাকার ও চতুষ্কোণ হইত। হত্যার পর মৃতদেহ কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইত। গোর দিবার স্থান প্রায় হত্যা করিবার পূর্ব্বেই স্থির থাকিত; এই স্থানে লইয়া গিয়া ইহারা মৃতদেহ সমাধি করিত। এই সময়ে ইহারা অস্ত্রের ব্যবহার করিত, এই অস্ত্র, একখানি মন্ত্রে উৎসর্গীকৃত কুঠার। ইহাদ্বারা মৃতদেহটীর হস্তপদ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেহটীর সহিত গোর দিত। গোরও এই অস্ত্রের দ্বারা খনন করিত। মৃতদেহ গোর দিয়া, তাহার উপর মাটি চাপা দিত, এবং লোকের কোন প্রকার সন্দেহ না হয় এইজন্য গোরের উপর ঘাস বসাইয়া দিত। এক একটী গোরে একটীর অধিকও দেহ সমাধি করিত। গোর দিবার পূর্ব্বে যদি সেই স্থানে অন্য কোন লোক উপস্থিত হইত, তাহা হইলে ইহারা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া লোককে প্রতারিত করিত। অনেক সময় মৃত দেহটী একখানি বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া গোর খনন করিতে আরম্ভ করিত, এবং কেহ কেহ খুব ক্রন্দন করিতে থাকিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাহাদিগের পরিবারের কাহারও মৃত্যু হইয়াছে। অনেক সময় মৃতদেহ একেবারে গোপন করিয়া বস্ত্রের কানাত করিয়া তাহার মধ্যে সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, কানাতের মধ্যে তাহাদিগের পরিবারেরা আছে। কোন কোন সময়ে ঠগদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি ব্যারামের ভান করিয়া মাটিতে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে আরম্ভ করিত; অন্য লোকে তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলে, তখন কার্য্য শেষ করিত। ঠগেরা যাহার সঙ্গ লইত তাহাকে সহজে ছাড়িত না। আবশ্যক হইলে পাঁচ সাতদিন পর্য্যন্ত সঙ্গ লইয়া চলিত। পরে সুবিধা বুঝিয়া হত্যা করিত। অনেক সরাই বা পান্থশালায়ও এই নৃশংস কার্য্য হইত। এই সকল সরাইয়ের অধিকারীদিগের সহিত ঠগদিগের পূর্ব্বের বন্দোবস্ত থাকিত। পথিকেরা এই সকল স্থানে রাত্রিতে আশ্রয় লইত। হতভগ্য পথিকেরা নিশ্চিন্ত

মনে যখন নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে, এমন সময় এই নিষ্ঠুর ঠগেরা ইহাদিগকে হত্যা করিয়া সেই সরাইয়ের মধ্যেই পুতিয়া, উপরের মাটী পিটিয়া সমান করিয়া রাখিত কেহ কোন সন্দেহ করিতে পারিত না। সন্ন্যাসী এবং ফকীরদিগের নিকট হইতেও ইহারা অনেক সাহায্য পাইত। এদেশে বনের মধ্যে এবং নির্জ্জন স্থানে অনেক মঠধারী সন্ন্যাসী বাস করিয়া থাকে। পথিকেরা নিশ্চিন্তমনে ইহাদিগের আশ্রয় লইয়া থাকে। কিন্তু এই সন্ন্যাসী ও ফকীরদিগের মধ্যে কতকগুলি অসৎ প্রকৃতির লোক আছে; তাহারা বাহিরে ধর্ম্মের ভান করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়া থাকে। ঠগেরা এই সকল অসৎ প্রকৃতির সন্ন্যাসী ও ফকীরদিগের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইত। ইহারা ছোট খাট বাগান প্রস্তুত করিয়া সুস্বাদু ফলের গাছে পূর্ণ করিয়া রাখিত। শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকেরা উপস্থিত হইলে ইহারা যত্নের সহিত তাহাদিগকে আশ্রয় দিত। হতভাগ্যেরা মিষ্ট কথায় এবং ইহাদিগের ব্যবহারে ভুলিয়া, কথায় বার্ত্তায় সমস্ত কথাই ইহাদিগের কাছে খুলিয়া বলিত। কিন্তু সেই সন্ন্যাসী ফকীর বেশধারী অসৎ লোকেরা অবসর বুঝিয়া সংকেত দ্বারা ঠগদিগকে আহ্বান করিত। ইহারা আসিয়া হতভাগ্যদিগের প্রাণবিনাশ করিত। অনেক সময় স্ত্রীলোকের সাহায্যে এই সকল ভয়ঙ্কর কার্য্য সমাধা করিত। একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক হয়ত পথের ধারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, এমন সময় একজন পথিক উপস্থিত হইলে, স্বভাবতই তাহার মনে একটু দয়া উপস্থিত হয়। সকলেই হয়ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে কেন কাঁদিতেছে। স্ত্রীলোকটী তখন একটা যায়গার নাম করিয়া বলে যে সে সেই স্থানে যাইবে, পথে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়াছে, স্ত্রীলোক একাকী কেমন করিয়া যাইব, এইজন্য কাঁদিতেছি। এপ্রকার অবস্থায় পথিকের মনে স্বভাবতই একটু দয়া উপস্থিত হয়, এবং না বুঝিয়া ঠগদিগের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া হয়ত তাহাকে রাখিয়া আসিতে যাইয়া এই নৃশংসদিগের হস্তে শেষে প্রাণ হারায়।

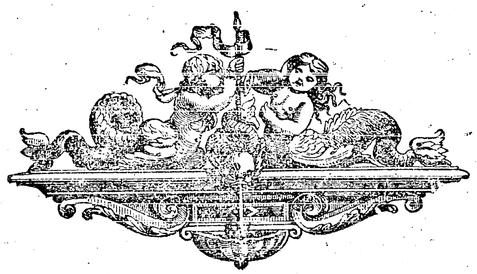

অসন্তুষ্ট কাঠবিড়াল।

তোমরা সকলেই মুঙ্গের কোথায় জান, মুঙ্গেরের অতি নিকটে মধুবন নামে একটী রমণীয় স্থান আছে, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থানটি আরও রমণীয় ছিল। তখন সেখানে শাল, তামাল, প্রভৃতি নানা জাতীয় বড় বড় গাছ এবং কত প্রকারের লতা গুল্ম দেখিতে পাওয়া যাইত; কত শত শত প্রকারের বনফুলে বনটি সর্ব্বদা আলো হইয়া রহিত, এবং নানা বর্ণের নানা প্রকার প্রজাপতি দিনের বেলায় ফুলের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত। ময়ুর, বন্যকুক্কুট, তিতির, বটের প্রভৃতি ভূচর পক্ষীগণ মনের সুখে বিচরণ করিত; কোকিল, পাপিয়া, শ্যামা, দইয়াল প্রভৃতি গায়ক পক্ষীরা

গাছের ডালে, লতার আড়ালে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া গান করিত। লেপার্ড (Leopard) হায়েনা (Hyæna) ভল্লুক, বনবিড়াল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা রাত্রে ইতস্ততঃ আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত এবং মাঝে মাঝে রাত্রের গভীরতা এবং নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া চীৎকার করিত; ঐ শব্দ থরকপুর পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল পল্লিতে ফিরিয়া আসিত, এবং তাহা শুনিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলে "ভয় কি বাছা কা'ল সকালে দুষ্ট বাঘটাকে মেরে এনে দিব" বলিয়া সাহসী পিতা মাতারা ছেলে, মেয়েদিগকে সান্ত্বনা করিত। মধুবনের নিকটেই একটী ক্ষুদ্র হ্রদ আছে, এই হ্রদে নানা দেশ হইতে নানা প্রকার জলচর পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া একত্রিত হইত, এবং শীত ও বসন্ত কাল এইখানে থাকিয়া আবার গ্রীষ্ম কালের প্রারম্ভেই তাহারা দেশ বিদেশে চলিয়া যাইত।

সেই মধুবন এখনও আছে কিন্তু তাহার আর সে শোভা নাই। এখনও অনেক গাছ আছে কিন্তু তত বড় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ আর নাই, লতা, গুল্ম আছে কিন্তু সে রমণীয়তা নাই; বনফুল আর প্রায় ফোটে না, ঝাঁকে ঝাঁকে আর প্রজাপতিগণ খেলিয়া বেড়ায় না; ময়ূরের নৃত্য আর সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, গায়ক পাখীরা আর ডা'লে বসিয়া মনের সুখে গান করে না। হিংস্র জন্তুরাও এখন আর পূর্ব্বের মত রাত্রে ঘুরিয়া বেড়ায় না। নিকটে সেই হ্রদ আছে, কিন্তু হাজার হাজার জলচর পক্ষীদের সেখানে জমা হইতে আর দেখা যায় না। সখার পাঠক পাঠিকা! তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার মধুবন এমন শ্রীভ্রষ্ট কেন হইল। দেশে সভ্যতা বিস্তার এবং মানুষের অর্থ পীপাসাই মধুবনের দুর্দ্দশার কারণ। প্রথমে যখন এই দেশ দিয়া রেলের পথ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় তখন ঐ বনের বড় বড় গাছগুলি কাটিয়া রাস্তার কাজে লাগান হয়; যেখানে কখনও মানুষ প্রবেশ করিত না, সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা মানুষের গোলমাল, গাছ কাটা আর গাছ পড়ার শব্দ,—গরিব পাখী বেচারীরা কেমন করিয়াইবা থাকে? গতিক মন্দ দেখিয়া তাহারা কে কোথায় পলায়ন করিল। বড় বড় গাছ পড়াতে এবং তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করাতে লতা গুল্ম ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন ফুলের চারাগুলি মারা যাইতে আরম্ভ হইল; ফুল না পাইয়া প্রজাপতিরাও আসা বন্ধ করিল। এদিকে রাস্তা প্রস্তুত হইলে রেলগাড়ী চলা আরম্ভ হইল, মধুবনের অতি নিকট দিয়াই রেলের রাস্তা, প্রথম ট্রেণখানা সন্ সন্, ঝন্ ঝন্ করিয়া আসিতে আরম্ভ হইল; গাছ কাটা এবং গাছ পড়ার গোলমাল সহ্য করিয়াও যে সকল জন্তু বনের এদিকে ওদিকে লুকাইয়া ছিল তাহারা এবার মহা বিপদে পড়িল; এদিকে ট্রেণ যত নিকটে আসিতে লাগিল ততই পোঁ পোঁ শব্দ হইতে লাগিল, সেই কর্ণভেদী পোঁ পোঁ শব্দে বন্য জন্তু সকল দিশাহারা হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। যাক্, আমরা কি কথা বলিতে গিয়া কি আনিয়া ফেলিয়াছি। এই মধুবনে একটী ক্ষুদ্র কাঠবিড়াল বাস করিত; এমন স্থানে সে যে পরম সুখে থাকিত তাহার সন্দেহ নাই। সে ইচ্ছামত এ গাছ ও গাছ করিয়া বেড়াইত। ক্ষুধা হইলে আহারের এবং তৃষ্ণা পাইলে জলের অভাব ছিল না। তার দুই একটী সৎবন্ধুও ছিল। এইরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে কিছুদিন কাটাইয়া কাঠ-

বিড়ালের মনে কেমন এক প্রধান অশান্তি জন্মিল; কাঠবিড়ালের যে গাছে বাসা ছিল সে গাছটি হ্রদের দিকে; সে বাসায় বসিয়া বসিয়া হ্রদের জলচর পক্ষীদিগকে দেখিত এবং মনে মনে ভাবিত ঐ পাখীরা কত সুখী, উহারা ইচ্ছামত কেমন এদেশ ওদেশ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে পারে, আর আমাকে এই বনের মধ্যেই সমস্ত সময় কাটাইতে হয়! না, এরূপ অবস্থায় থাকা আমার পক্ষে অসহ্য! অবশেষে কাঠবিড়াল মনে মনে স্থির করিল যে সেও ঐ পাখীদিগের মত বিদেশে যাইবে। সেই বনে একটী ইন্দুর ছিল সে কাঠবিড়ালের অত্যন্ত বন্ধু; কাঠবিড়াল গিয়া বন্ধুকে তাহার বিদেশ গমনের ইচ্ছা জানাইবামাত্র ইন্দুর বন্ধু অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কাঠবিড়াল বন্ধুর সাধু ইচ্ছার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল, বিদেশ যাত্রার সমস্ত ঠিক হইয়া গেল।

সে রাত্রি আর কাঠবিড়ালের নিদ্রা হইল না, পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে কাঠবিড়াল যাত্রা করিল। দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক আর সাংসারিক কোন বিষয়ের জ্ঞান না থাকাতেই হউক কাঠবিড়ালের বিদেশ যাত্রার কোন একটা উদ্দেশ্য ছিল না; পক্ষীরা উড়িয়া এদেশ ওদেশ যায় আমি কেন যাইব না, উদ্দেশ্যর মধ্যে এইমাত্র। ক্ষমতা থাকা না থাকার বিষয় যে সে একবারে ভাবেনি তাহাও নয়। সে ভাবিয়াছিল পাখীদের যেমন ডানা আছে উড়িয়া যাইতে পারে, তাহার তেমনই চঞ্চল পা আছে, সে দ্রুত চলিতে পারে; যাহা হউক সে অতি প্রফুল্লচিত্তে যাত্রা করিয়া কখন বা লাফাইতে লাফাইতে কখন বা চঞ্চল গতিতে চলিতে লাগিল এবং মাঠের পর মাঠ, বাগানের পর বাগান প্রভৃতি পার হইয়া এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের নিকটে উপস্থিত হইল। যখন সে এই ক্ষুদ্র পাহাড়টির নিকট উপস্থিত হইল তখন বেলা প্রায় দশটা। ইন্দুর বন্ধুর পরামর্শে সঙ্গে যাহা কিছু খাবার আনিয়াছিল এখানে বসিয়া আহার করিয়া কাঠবিড়াল আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সমতল ভূমিতে যত দ্রুত পদে উল্লাসের সহিত চলিয়া আসিয়াছিল এবার পাহাড়ে উঠিবার সময় তত দ্রুত উঠিতে পারিল না, কিন্তু তাই বলিয়া সে ছাড়িবার পাত্র নয়। সে ক্রমাগত উঠিতে লাগিল এবং কিছুকাল পরেই পাহাড়ের উপরে উঠিল। পাহাড়ের উপরে উঠিয়া পশ্চাৎদিকে তাকাইবামাত্র মধুবন দেখিতে পাইল, যে গাছে তাহার বাসা ছিল সে গাছটিও দেখিতে পাইল। আপনার বাসা, মধুবনের সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সমস্ত মনে হইয়া তাহার মন কেমন করিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা অতি ক্ষণকালের নিমিত্ত। কাঠবিড়াল আবার চলিতে আরম্ভ করিল। কত বন, কত জঙ্গল পার হইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু এবার আর তত দ্রুতপদে চলিতে পারিল না, পরে বেলা আন্দাজ সাড়ে চারিটার সময় অপেক্ষাকৃত একটী বৃহদাকার পাহাড়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এই পাহাড় পার হইতে পারিলেই কাঠবিড়াল বিদেশে পৌঁছে। সঙ্গে যাহা কিছু খাবার ছিল তাহা দশটার সময় আহার করিয়াছে আর কিছু সঙ্গে নাই, এখানে কিছু পাওয়াও যায় না যে খাইয়া সে ক্ষুধা নিবারণ করে; কাজে কাজেই ক্ষুধা লইয়াই সে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। কাঠবিড়াল ক্রমাগত উঠে কিন্তু পথ আর ফুরায় না, সে উঠিতে যথেষ্ট চেষ্টা করে কিন্তু পা আর উঠে না, অবশেষে অনেক কষ্টে খানিকটা উঠিয়া মনে করিল ঐ যে স্থান দেখা যাইতেছে ঐখানে

যাইতে পারিলেই তাহার কষ্ট শেষ হইবে কিন্তু অবশেষে সেখানে গিয়া দেখে যে তখনও অনেক উঠিবার আছে। উঠিবার আছে বটে কিন্তু চলিবার আর সাধ্য নাই, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ বিদেশ যাত্রার সংকল্প মন হইতে দূর হইল। কাঠবিড়াল দেশের উদ্দেশ্যে আবার ফিরিয়া চলিতে লাগিল কিন্তু এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, সে আর পথ দেখিতে পাইল না, এদিকে মহা ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, কাঠবিড়ালের মহা বিপদ উপস্থিত। একে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, পথ চলিয়া পায়ে ব্যথা হইয়াছে, তাহার উপর আবার ঝড়, বৃষ্টি,—সে কাঁপিতে কাঁপিতে একখানি পাথরের আড়ালে গিয়া আশ্রয় লইল এবং শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হওয়াতে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখে বৃষ্টি ছাড়িয়া গিয়াছে, রৌদ্র উঠিয়াছে, শীত আর নাই কিন্তু ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, সে শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া রৌদ্রে শরীর শুকাইতে লাগিল এবং কতক্ষণে মধুবনে যাইবে ভাবিতে লাগিল, এমন সময় একটা চিল আসিয়া ছোঁ মারিয়া তাহাকে লইয়া গেল। কাঠবিড়াল জ্ঞানশূন্য, মৃতপ্রায়! চিলের নখরে কাঠবিড়ালকে আবদ্ধ দেখিয়া একটা বাজ তাহা অপহরণ করিতে আসিল, চিলেও বাজে যুদ্ধ বাঁধায় চিলের নখর হইতে কাঠবিড়াল পড়িয়া গেল। কতক্ষণ পরে যে তাহার চৈতন্য হইয়াছিল তাহা কাঠবিড়াল জানিতে পারে নাই কিন্তু চৈতন্য হইলে সে দেখিতে পাইল যে, যে গাছে তাহার বাসা সেই গাছের এক ডালে সে পড়িয়া আছে।

শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত।

বঙ্গদেশের কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ কাহারও কার্য্যে শৃঙ্খলা নাই; পুরুষের এই দিকে তত দৃষ্টি না থাকিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের কার্য্যে শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত না থাকিলে, সংসার হতশ্রী হইয়া যায়। অনেক ধনী পরিবারের সংসার শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্তের অভাবে ছারখার হইতে দেখা যায়; আবার শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্তের গুণে অনেক দরিদ্র পরিবারও চিরকাল সুখে কাটাইতে পারে। বঙ্গীয় রমণীগণের এই দিকে মোটে দৃষ্টি নাই বলিলেও বড় অন্যায় হয় না। স্ত্রীলোক গৃহের লক্ষ্মী;—তাহাদের দোষে সংসার হতশ্রী হয়, আবার তাহাদের গুণেই গৃহ সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটা কথা চলিত আছে,

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, প্রজা কষ্ট পায়।
গৃহিনির দোষে ঘর নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

বঙ্গ মহিলাগণ যেন ইহা কখনও ভোলেন না।

অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, তাহারা শৃঙ্খলার লেশ মাত্রও জানেন না, অথচ তাহারাই গৃহের কর্ত্রী। ইহারা কোথায় কি জিনিষ রাখেন, কাহাকে কি দেন, এবং ঘরে কোন্ জিনিষটা আছে, কোন্‌টা নাই, তাহা মনে রাখিতে পারেন না! ইহারা ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে প্রস্তুত নহেন, কোন প্রকারে দিন গেলেই যথেষ্ট মনে করেন। লবণের হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া লবণগুলি মাটিতে পড়িয়া খারাপ হইয়া যাইতেছে, চাউল গুলি অযত্নে পড়িয়া যাইতেছে, বাক্সটি ভূমিতে থাকায় সর্দ্দি লাগিয়া জীর্ণ হইয়া

যাইতেছে, কাপড় গুলি ইঁদুরে কাটিয়া ছারখার করিতেছে, তবুও তাহাদের চৈতন্য হইতেছে না। যে ঘরে এরূপ গৃহিণী, সে ঘর রাজার সংসার হইলেও অচিরে হতশ্রী হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সমস্ত জিনিষ রাখা তাহাদের অভ্যাস নাই, কোন্ স্থানে কোন্ জিনিষ রাখিলে দেখিতে সুন্দর হয় তাহারা বুঝিতে পারেন না। এমন কি কোথায় কোন্ দ্রব্য রাখেন তাহাও প্রতি মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যান; সুতরাং প্রয়োজন হইলে, ২।৩ ঘণ্টা তল্লাস না করিলে কোন জিনিষ পাওয়া ভার হয়। তৈল খুঁজিতে নুন বাহির হয়, কাগজ খুঁজিতে কলম বাহির হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্য আর পাওয়া যায় না। অনেক গৃহে দেখিতে পাওয়া যায় যে একখানা বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে ৫।৭টা সিন্ধুক, ২।৩টা আলমারা, ৩।৪টা বাক্স ও দুই একটা দেরাজ না খুলিয়া, উপরের কাপড় নীচে ও নীচের কাপড় উপরে না আনিলে, তাহা পাওয়া যায় না। একখানা আয়না পাইতে হইলে পঞ্চাশবার এঘর ওঘর তল্লাস না করিলে চলে না। এমন কি, সময় সময় দোয়াত, কালী, কলম, দেশলাইরে বাক্স, পিরাণ, ছুরী, বাক্সের চাবি, চুলির দড়ি, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ বিশৃঙ্খলা ও অসাবধানতা যে অতীব অন্যায়, বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। আশাকরি পাঠিকাগণ শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্তের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।

ঘরের জিনিষগুলি উত্তমরূপ সাজাইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে দেখিতে সুন্দর হয়, এবং প্রয়োজন মত তল্লাস ব্যতীতই সব পাওয়া যায়। একটী সু-সজ্জিত গৃহ দেখিলে মনে মনে কর্ত্রীকে প্রসংশা করিতে ইচ্ছা হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে কোন জিনিষের জন্য তল্লাস করিয়া মরিতে হয় না। অনেকের এমন কু-অভ্যাস যে যাহা পান তাহাই আনিয়া এক স্থানে রাখিয়া দেন। এইরূপে পুস্তক, কাগজ, কলম, কালী ও সূতা, পানের মস্‌লা, চুলের দড়ী, ছুঁই, বস্ত্র ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য এক স্থানে এরূপ এলোমেলো করিয়া রাখিয়া দেন যে, একটা জিনিষের প্রয়োজন হইলে সমুদয় উলট পালট না করিলে তাহা পাওয়া যায় না। ইহাতে সময় সময় মহা ক্ষতি হয়; হয়ত চুলের দড়ী ধরিয়া টান দেওয়াতে কালীর দোয়াতটী উল্টাইয়া পড়িয়া বস্ত্র, পুস্তক, ইত্যাদি সাধের দ্রব্য সকল কালীময় হইয়া গেল; না হয়, পানের মস্‌লাগুলি ভুনিতে ছড়াইয়া পড়িল। এমন ও অনেক স্ত্রীলোক দেখা যায় যে তাহারা লেপ, তোষক, মসারী, বস্ত্র প্রভৃতি জিনিষগুলি এমন করিয়া এক স্থানে রাখিয়া দেন যে ধুতিখানা নামাইতে হইলে অগ্রে লেপ ইত্যাদি না নামাইলে চলে না; কেহ কেহ আবার খাট, তক্তপোষ ইত্যাদির নীচে বা অন্যত্র ঘটী বাটী বাসন প্রভৃতি এমনভাবে এলোমেলো করিয়া রাখেন যে উহার কোন একটা দ্রব্যের দরকার হইলে সমস্তগুলি স্থানান্তরিত না করিলে হয় না। ইহা যে নিতান্ত অসুবিধাজনক, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সুতরাং শৃঙ্খলা শিখিতে হইলেই প্রথমতঃ সমুদয় এক স্থানে রাখিবার অভ্যাসটী পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উত্তমরূপে সাজাইয়া রাখিতে অভ্যাস

করিতে হইবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষাদি এমন স্থানে রাখিবে, যেন প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায়।

গৃহের পারিপাট্য বিধানে ইংরেজ রমণীগণ বড়ই পটু; কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্য রাখিলে সুন্দর দেখায় অথচ কার্য্যের সুবিধা হয়, তাহা তাঁহারা বেশ বুঝেন। উহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, তাহারাও গৃহটীকে উত্তমরূপ সজ্জিত করিয়া রাখেন; উহাদের এক একটী গৃহ এক একটী ছোট খাট স্বর্গ, নিতান্ত গরীব একটী ইংরেজের বাড়ী যাও, দেখিবে ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গৃহ সামগ্রীগুলি সুন্দর, ঘসা মাজা ও যথাস্থানে স্থাপিত, শৃঙ্খলার অভাব কোথায় ও দেখিতে পাইবে না। কিন্তু বঙ্গীয় গৃহে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব! ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বাসস্থান সজ্জিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইলে মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না। অনেক লোক যে অধিকক্ষণ বাড়ীতে থাকেন না, ইহা তাহার একটী কারণ। দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গ মহিলাগণ তাহা বুঝেন না। আমরা বঙ্গ মহিলাদিগকে বিলাসিনী হইতে বলি না, কিম্বা বৃথা ব্যয় বাহুল্য করিয়া গৃহ সজ্জিত করিতে ও বলি না; আমরা বলি গৃহে যে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য আছে, তাহা এলোমেলো, অপরিস্কার করিয়া না রাখিয়া, সজ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন।

শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত ও শিক্ষা করিতে হইবে। কি কি প্রকারে সংসারের জিনিষাদির অপব্যয় না হয়, এবং কি করিলে পরিমিত ব্যয়ে সংসার নির্ব্বাহ করা যায়, এবং কি করিলে ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে, প্রত্যেক বুদ্ধিমতী মহিলার তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কোন কোন মহিলা এ বিষয়ে বড় উদাসীন। ঘরের দ্রব্যাদি সর্ব্বদা লোকসান যাইতেছে, দাস দাসীরা অনেক জিনিষ চুরি করিয়া নিজগৃহে নিয়া যাইতেছে, যে তিন চারি দিনের মধ্যে ফিরাইয়া দিবে বলিয়া একটা দ্রব্য চাহিয়া লইয়া গেল সে ৩।৪ মাসেও তাহা ফিরাইয়া দিতেছে না তবুও অনেক গৃহিনী দৃষ্টিপাত করেন না।

যে গৃহের গৃহিণীগণ ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে চান না, সে গৃহের মঙ্গল নাই। অনেক সম্পন্ন পরিবারে দেখিয়াছি যে বাড়ীতে একজন সম্ভ্রান্ত লোক আসিলে সময় সময় হুলস্থুল পড়িয়া যায়। গৃহে হয়ত জলযোগ বা আহারের উপযুক্ত কোন সামগ্রী নাই। বাবু পলান্ন রাঁধিতে হুকুম পাঠাইলেন; কিন্তু তদুপযুক্ত কোন দ্রব্যই গৃহিণী খুঁজিয়া পাইলেন না। গ্রাম্য বাজারেও হয়ত তাহা পাওয়া গেল না। তখন কিরূপ বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়, পাঠিকাগণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। কু-গৃহিণীর দোষে এমত হয়; কারণ কর্ত্রী যদি পূর্ব্বেই এই প্রকার আবশ্যকের বিষয় চিন্তা করিয়া, সকল জিনিস কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন তবে কার্য্যের সময় এত বৃথা দৌড়াদৌড়ি ও করিতে হয় না, কার্য্য ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। ফলতঃ মহিলাগণের গৃহকার্য্যে শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত না থাকাতে অনেক সময় কর্ত্তা বাবুদিগকে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হয়। যে গৃহিণীরা শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত জানেন, তাঁহারা নিতান্ত সামান্য দ্রব্যকেও অবহেলা করেন না। কারণ তাহারা জানেন যে সামান্য দ্রব্যও সময়ে অসামান্য উপকার সাধন করিতে পারে। "তৃণ হতে কার্য্য হয় রাখিলে যতনে" পাঠিকাগণ এই কথাটা মনে রাখিবেন। সুগৃহিণীগণের আর একটা লক্ষণ এই যে, ছয় মাস,

এক বৎসর, এমন কি দশ বৎসর পর যে কার্য্য করিতে হইবে, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা তাহার বন্দোবস্ত ও যোগাড় করিয়া রাখেন।

(প্রাপ্ত।)

(অধিক বয়স্ক পাঠিকাদের জন্য লিখিত।)

বর্ষ-শেষ।

(১)

নূতন বরষ সনে
কত আশা লয়ে প্রাণে
নূতন উৎসাহে বাঁধি হৃদয় আমার।
ভেবেছিনু সেই সব পূরাব এবার।

(২)

যদিও অনেক বার
আশাই হয়েছে সার
কল্পনায় রহিয়াছে প্রতিজ্ঞা কেবল ;
ভেবেছিনু মনে মনে
"এইবার প্রাণ পণে
সংকল্প নিশ্চয় মোর করিব সফল।
আর না তেমন ক'রে
অকারণে অনাদরে
করিব বৃথায় ব্যয় অমূল্য সময় ;
এ মোর প্রতিজ্ঞা স্থির সাধিব নিশ্চয়।"

(৩)

কিন্তু একি দেখি হায়!
সেই দশা পুনরায়
বরষ চলিয়া গেল তেমনি আবার
কত আশা করিলাম
ভাঙ্গিলাম গড়িলাম
কিছুই না পূর্ণ হলো বাসনা আমার
কল্পনা কল্পনা—ছি ছি!—কল্পনাই সার!

(৪)

মনে করি সেই কথা
প্রাণে পাই বড় ব্যথা
কেমনে কেটেছে এই বরষ আমার!
কাজে করি অবহেলা
করিয়াছি কত খেলা
বৃথা গল্পে লভিয়াছি কিবা সুখ ছার!
অকারণে কত জনে
যাতনা দিয়াছি প্রাণে ;
আপন কর্ত্তব্য ভুলে গেছি কতবার।
এইভাবে যেন দিন কাটেনাকো আর।

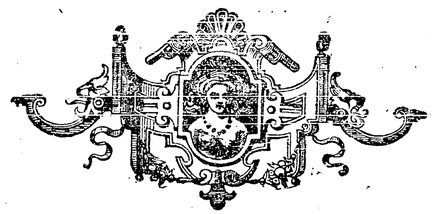

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। চন্দ্র।